আসুন, দ্বীনকে মানি

প্রথম খণ্ড

ছাইদুল হক মজুমদার

আসুন, দ্বীনকে মানি

ছাইদুল হক মজুমদার

মুদ্রণে ঃ বেষ্ট প্রিন্টার্স
৩৪, গ্রীণ রোড, নওয়াব ম্যানশন
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ ছাইদুল হক মজুমদার
নূরপুর, জি,এম,হাট, ফেনী।

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

১ম প্রকাশ
ডিসেম্বর-২০০১

পরিবেশনায় ঃ

আধুনিক প্রকাশনীর সকল বিক্রয় কেন্দ্র ফোন ঃ ৭১১৫১৯১ ৯৩৩৯৪৪২	প্রফেসর্'স বুক কর্ণার ১৯১, ওয়ারলেছ রেল গেইট, (দৈনিক সংগ্রামের সামনে) বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫
ইসলাম প্রচার সমিতি প্রকাশনা বিভাগ কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। ফোনঃ ৮৬২৫০৯৭	প্রীতি প্রকাশন ৪৩৫/এ, বড় মগবাজার ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৮৩২১৭৫৮ ৮৩১৯৫৪০
কুতুবখানা এমদাদিয়া ৩৪/২, নর্থ ব্রুক হল রোড ঢাকা-১১০০। ফোন ঃ ৭১১১৫০০	মাহমুদ পাবলিকেশন্স বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স ৩৮/৩, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোনঃ ৭১২৫৭০০

হাদিয়া ঃ অফসেট- ১৩০.০০ টাকা

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পথে ঃ
আসুন, দ্বীনকে মানি
২য় খন্ড ঃ জিহাদ ও কি'তাল
৩য় খন্ড ঃ বিভিন্ন প্রসঙ্গ

সহায়তায় ঃ
মোঃ মাহবুবুর রহমান (স্বপন)
এশিয়া ট্রান্সলেশন সার্ভিস
এবং
সিটি কম্পিউটার সার্ভিস
১০৪/সি, কাকরাইল রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৪৯১২১, ৯৩৪১৯৩০
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৩১৫২২
ই-মেইল ঃ city@citechco.net

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
মোঃ আনোয়ার হোসেন
সিটি কম্পিউটার সার্ভিস
১০৪/সি, কাকরাইল রোড
ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

মুনাজাত

আমার আম্মা-আব্বার অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা মাখা তত্ত্বাবধান ও স্নেহমাখা শাসনের ফলে দ্বীন-ইছলামের আমল-আখলাকের সাথে ইছলামি জেন্দিগি-বন্দেগি ও জীবন ব্যবস্থার প্রতি অনুপ্রাণিত ও উৎসাহি হয়েছি। হে গাফুরুর রহীম, আজ তাঁরা আপনার জিম্মায় রয়েছেন। তাঁদের মাগফেরাতের উসিলা স্বরূপ 'আসুন, দ্বীনকে মানি' গ্রন্থখানা আপনার শাহী দরবারে কবুল করার জন্য সবিনয় মুনাজাত করছি।

আব্বা-আম্মার স্নেহের
ছাইদুল হক মজুমদার

www.pathagar.com

অভিমত

প্রীতিভাজন ছাইদুল হক মজুমদার প্রণীত 'আসুন, দ্বীনকে মানি' শীর্ষক গ্রন্থখানির প্রথম খন্ডের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত অতি কষ্টে পাঠ করিলাম। নাতিবৃহৎ গ্রন্থখানিতে ঈমানের দৃঢ় চিত্ততা ও আমলের সংশোধনের অনুশীলনীর উদ্দেশ্যে বহু বিষয়ের অবতারণা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থে লেখক মোট নয়টি অধ্যায়ের একশত বিশটি শিরোনামে বক্তব্য বিষয় বিশদ করার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে সাতটি উপশিরোনামে 'তাআউয ও তাছমিয়া', দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি উপশিরোনামে, 'আল্লাহর ব্যাপকতা', তৃতীয় অধ্যায়ে নয়টি উপশিরোনামে 'রছুলুল্লাহ্‌র (সঃ) ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য', চতুর্থ অধ্যায়ে দশটি উপশিরোনামে 'রছুলুল্লাহর (সঃ) সংসার ও কর্মজীবন' পঞ্চম অধ্যায়ে পাঁচটি উপশিরোনামে 'আল কোরআনের শাশ্বত বৈশিষ্ট্য', ষষ্ঠ অধ্যায়ে ছয়টি উপশিরোনামে 'রছুলুল্লাহ (সঃ) এর মেরাজ ও সময়ের মূল্যায়ন', সপ্তম অধ্যায়ে ছয়টি উপশিরোনামে 'বিশ্বনবীর প্রয়োজন', অষ্টম অধ্যায়ে পনেরটি উপশিরোনামে 'পবিত্র কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোযেযা' এবং সর্বশেষ নবম অধ্যায়ে দীর্ঘ ঊনষাটটি উপশিরোনামে 'বিশ্বনবী ও খাতমে নবুয়ত' বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম সহকারে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র ব্যাপকতা, রাছুলুল্লাহর ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য, তাঁহার দৈহিক শক্তি ও ওযন, ওহীর ব্যবহার ও প্রয়োজন, রছুলুল্লাহর (সঃ) সংসার ও কর্ম জীবন, আল কোরআনের শাশ্বত বৈশিষ্ট্য, এর সংকলন ও সংরক্ষণ, রাছুলুল্লাহর মেরাজ ও সময়ের মূল্যায়ন, বিশ্বনবীর প্রয়োজন, বেদ, পুরাণে, জিন্দাআবেস্তা, তওরাত, ইঞ্জিলে নূরনবী (সঃ), আছমানী কেতাব, কোরআনের, মঞ্জেল, সিপারা, ছুরা, আয়াত ও হরফ ইত্যাদির সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ এবং খতমে নবুওতের ব্যাখ্যা ও কতিপয় অমুসলিম মনীষীর বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকার একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বহু শাস্ত্রে পণ্ডিত। তাঁহার গ্রন্থখানিতে আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রছুল, কোরআন ও

www.pathagar.com

তার নানা তথ্য, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (সঃ) এর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী এবং বহু সংশয়ের নিরসন-মূলক তত্ত্ব পরিবেশিত হইয়াছে। অনেকের সঙ্গে লেখকের মতের মিল নাও হইতে পারে। কিন্তু তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই গ্রন্থে লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রমের সাথে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও নিরলস অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর বিধৃত হইয়াছে এবং ইসলাম-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য প্রচুর চিন্তার খোরাক রহিয়াছে।

একটি কথা উল্লেখ না করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। গ্রন্থখানির স্থানে স্থানে অব্যাকরণ সিদ্ধ বাক্য বিন্যাস, অস্বস্তিকর বানান ও আরবী-ফারসী শব্দের পীড়াদায়ক প্রতিবর্ণায়ন প্রমাদ দৃষ্টে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। কিন্তু কষ্টকর হইলেও আয়াস ও অধ্যবসায় সহকারে একবার বিষয় বস্তুর মর্মে প্রবেশ করিতে পারিলে ক্লান্তির অপনোদন হইবে, বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—এই কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আর একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, **গ্রন্থখানি পাঠে সকল শ্রেণীর পাঠক, বিশেষতঃ আমাদের তরুণ-সমাজ উপকৃত হইবেন**। আজিকার এই অশান্ত দুনিয়ার শিথিল বিশ্বাসের নিরসনে এ গ্রন্থের বক্তব্য অনেকখানি সহায়ক হইবে। বই খানির জন্য লেখককে জানাই খোশ-আমদিদ।

অধ্যাপক কাজী দীন মুহম্মদ
এম.এ. পি-এইচ.ডি (লণ্ডন)
প্রো-ভিসি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
চেয়ারম্যান, কলেজ অব এডুকেশন এণ্ড ডিভলপমেন্ট-স্টাডিজ
রেকটর, ড. কাজী দীন মুহম্মদ আদর্শ শিক্ষা ভবন।

১লা রমজান, ১৪২২ হিজরি
৩রা অগ্রহায়ণ, ১৪০৮ বাংলা
১৭ নভেম্বর, ২০০১ ঈসায়ী
১২৯ কলাবাগান,
মীরপুর রোড, ঢাকা।

www.pathagar.com

(১ম খন্ড)

পূর্বাভাস

আউযু বিল্লা-হি মিনাশ্ শাইতানির্ রাজিম।
বিছমিল্লা-হির্ রহ্মা-নির্ রহীম।

আমার এই পঙ্গু ও বার্ধক্য অবস্থায় 'আসুন, দ্বীনকে মানি' গ্রন্থখানা লেখার তওফিক দেয়ার জন্য রহমানুর-রহীম আল্লাহ রাব্বুল আ-লামিনের দরবারে সবিনয় জানাই, অশেষ শোকরিয়া।

ত্রিভুবনের শ্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবং রবের সমস্ত রবুবিয়াতের রহমাতুল্লিল আলামিনের ব্যাপকতা বর্ণনার ভূমিকার শুরুতেই আমি সর্বান্তকরণে ও বিনম্রভাবে জানাই— আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আলামিন, আর্‌রাহমা-নির্‌রাহি-ম, মা-লিকি ইয়াওমিদ্দিন—সকল প্রকার-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য (যিনি) ত্রিভুবনের রব ঃ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও সংহার কর্তা; (যিনি) রহমান ও রহীম (এ খন্ডের প্রথম অধ্যায় তাছমিয়া দ্রঃ) (যিনি) মালিক— ইয়াওমিদ্-দিন -এর। এ 'মালিক'-এর মূল অর্থ-সর্বপ্রকার সমস্ত সৃষ্টির উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং সৃষ্টির সকল প্রকার অধিকার, আধিপত্য বিলুপ্তকারীকে বুঝায়। আর পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'ইয়াওম' অর্থ— দিন বা দিবার মেয়াদ, এক মুহূর্ত হতে পঞ্চাশ হাজার বছর বলে উল্লেখিত হয়েছে (আদতে কত হাজার বা লক্ষ বছর আলেমুল গায়েবই সম্যক ওয়াকিফ হাল)।

২৯ পারা, ৭০ ছুরা মাআরিজ, ৪ আয়াত।

তবে কেয়ামতের সেই সুমহান ন্যায়বিচার দিন, এবং যেদিন একমাত্র আল্লাহ তাআলার সর্বময় ক্ষমতা ও আধিপত্য বিদ্যমান থাকবে, তাকেই 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' বলা হয়েছে।

আল+হামদ্ = আলহামদু। একমাত্র বা নির্দিষ্ট করে কিছু বুঝাবার জন্য ইংরেজি 'দ্য'-এর মত আরবীতে 'আল' ব্যবহৃত হয়'। সুতরাং, সমস্ত 'হামদ' বা প্রশংসা, শোক্‌র, ছেফাত, ছানা, নাআত এবং সকল প্রকার গুণ বর্ণনা এবং ভক্তি, গৌরব, অহংকার, প্রার্থনা সবই ঐ সর্বশক্তিমান, সর্বক্ষম, সর্বদর্শী আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট, যিনি আলামিনের রব।

আল্লাহর আল্লাহত্বের ব্যাপকতার যেমন শেষ বিন্দু বলতে কিছু নাই, তেমন তাঁর রবুবিয়াতও ব্যাপকতার মধ্যেই ব্যাপক। অনেক তফছিরকারকের মতে 'আব' বা 'আব্বা' শব্দের মূল ধাতু হতে এই 'রব' শব্দের উৎপত্তি। 'রব' শব্দার্থও ব্যাপকতার মধ্যে ব্যাপক। সাধারণত, বিশ্বজগতের স্রষ্টার সৃষ্টির নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা সম্পাদন, সুপরিচালন, সুবিন্যাস করণ, প্রতিপালন, সংরক্ষণ, ব্যক্তি বা বস্তুর উন্নতি, অবনতি বা ধ্বংস ও পূর্ণতা সাধনের শক্তি-বৈশিষ্ট্য এই 'রব' শব্দের দ্যোতনা।

আলামিন 'আলমের' বহুবচন। ত্রিভুবনের এক এক করে প্রত্যেক শ্রেণী বা সমষ্টিকে 'আলম' বলা হয়। মানুষ, জিন, ফেরেস্তা, পৃথিবী, চাঁদ, সুরুজ, গ্রহ-নক্ষত্র, বেহেস্ত, দোজখ এবং দৃশ্য কি অদৃশ্য, ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, সবই আলমের

www.pathagar.com

অন্তর্গত। 'আলম' ছাড়া সৃষ্টি নাই এবং সৃষ্টি ছাড়া আলম নাই। ধ্বংস বা মরণশীল সৃষ্টি মাত্রই আলম। মানুষের চিন্তা ও কল্পনা দ্বারা যে ক্ষুদ্রতম বা বৃহত্তম আলমকে আঁচ করতে পারেনা, তা আল্লাহর ব্যাপকতার মধ্যে আল্লাহর নখ-দর্পনে রয়েছে।

সারা দুনিয়া মরুভূমি হলেও, তত্ত্ব ও তথ্যাভিজ্ঞ-বিজ্ঞ-দক্ষ কারিগর হলে, দুনিয়ার চার ভাগের তিন ভাগ সাগর তলে সঞ্চিত অফুরন্ত সম্পদ দ্বারা কেবল পাঁচশ কোটি মানুষ নয়, —কয়েক হাজার কোটি মানুষ হলেও, কয়েক হাজার কোটি বছরের পর্যাপ্ত পরিমাণ জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে —তাঁর কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে! তাঁর গুণ ও দান কূলহীন—অপার।

প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতিভেগে ৩২৬ বছর চল্লে এক আলোক বর্ষ হয় এবং দু'সংখ্যার পর ১৭টি শূন্য বসালে এক কিলোপারসেক হয়। আমি মনে করি, কয়েক হাজার কোটি আলোক বর্ষ চল্লেও তাঁর রাজ্যের সীমান্ত পাবে না।

(২৭ পারা ৫৫ ছুরা রাহমান ৩৩ আয়াত)

এবং কয়েক হাজার কোটি কিলো পারসেক হলেও আল্লাহর আলমের সংখ্যা নির্ণয় এবং তাঁর গুণ গেয়ে শেষ করা যাবেনা।

দুনিয়ার ৪ ভাগের ৩ ভাগ সাগরের সঙ্গে আরো কয়েক কোটি সাগর যোগ করে, কালি বানায়ে এবং দুনিয়ার গাছ-পালা, তরু-লতার সঙ্গে আরো কয়েক কোটি দুনিয়ার গাছ-পালা, তরুলতা যোগ করে, কলম বানায়ে, জিন-ইনছানের সাথে কুলমাখলুকাতের সমস্ত আলম সহ তাঁর গুণ লেখতে শুরু করলে ওসব কালি কলম, জিন-ইনছান এবং সমস্ত আলম (সৃষ্টি) শেষ হয়ে যাবে, তবুও মহান রাব্বুল আলামিনের গুণের মহা সাগরের এক কণা ক্ষুদ্র বালুর তুল্যও শেষ হবে না। (১৬ পারা, ১৮ ছুরা কাহাফ ১০৯ আয়াত)

এরূপই আল্লাহ তাআলার ব্যাপকতার ইশারা। তার পর;

আল্লাহ স্বয়ং যাঁর সম্মানে দরুদ পাঠান সেই মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ)- এর রহমত ও ব্যাপকতা, মান-সম্মান যে কত তা বর্ণনা করে শেষ করার ক্ষমতা কুলমাখলুকাতে কার নেই।

আল্লাহ হলেন, 'রাব্বিল আলামিন' এবং রছুলুল্লাহ (সঃ) হলেন, 'রহমাতুল্লিল আলামিন।' ১৭ পারা, ২১ ছুরা আম্বিয়া ১০৭ আয়াত।

আল্লাহর আল্লাহত্বের ব্যাপকতা আল্লাহ ছাড়া তাঁর সৃষ্টির কেউ জানে না এবং তিনি তাঁর গুপ্ত রহস্য কাউকে জানান না। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী, সর্বত্রবিরাজমান, সর্বক্ষম, জন্মদান এবং জন্মগ্রহণ হতে পবিত্র। কিন্তু রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর মধ্যে এসব গুণের বিন্দু-মাত্রও নাই। তিনি কুলমাখলুকাতের জন্য উত্তম আদর্শ। (২১ পারা, ৩৩ ছুরা আহযাব ২১ আয়াত)

এবং আল্লাহর সৃষ্ট সমস্ত আলামিনের রহমত হিসেবে তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তাই তিনি রহমতের মুর্ত প্রতীক—দয়ার সাগর, দয়ার প্রস্রবণ। তাই তাঁর দয়ায় ত্রিভুবণ মুগ্ধ-মোহিত। সমস্ত আলামিনের মালিক, যাঁকে ইচ্ছা রাজ্য দান বা গ্রহণ, যাঁকে ইচ্ছা সম্মান বা অপমান করা, রাতকে দিন বা দিনকে

www.pathagar.com

রাতে পরিনত করা, জীবিতকে মৃত বা মৃতকে জীবিত করা এবং যাঁকে ইচ্ছা অশেষ রিজিক দান করেন।

(৩ পারা, ৩ ছুরা ইমরান, ২৬ ও ২৭ আয়াতের সার সংক্ষেপ)।

এসব ক্ষমতা জীবিত কি মৃত কার (নবীদের মোযেযা বা ওলীদের কেরামতও আল্লাহর ইচ্ছাধীন) আছে বলে যারা বিশ্বাস করে, তারা হয় মোশরেক, না হয় কাফের, অথবা মোনাফেক যালিম। নবি-রছুল-ওলী সহ সমস্ত সৃষ্টিরই মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু আল্লাহর আল্লাহত্বের ব্যাপকতার শেষ নাই ও মৃত্যু নাই এবং মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহর রহমতেরও শেষ আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

আমি, এই জ্ঞানহীন নরাধম, আল্লাহ ও রছুলুল্লাহর ব্যাপকতা নিয়ে এই গ্রন্থের প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় যৎ-কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস নিয়েছি। কারণ, পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টি রহস্য এবং তাঁর কুদরতের ব্যাপকতা সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করে, আত্মিক পবিত্রতা রক্ষা করে, দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণের সার্বত্রিক উন্নতির জন্য সবিশেষ নির্দেশ সহ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং আল্লাহ আদমজাতকে সমস্ত সৃষ্টির উপর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব সহ ভূগর্ভে ও সমুদ্রে পবিত্র রেজেকের অফুরন্ত সম্পদ দান করেছেন।

১৭ পারা, ১৭ ছুরা বনিইছরাইল ৭০ আয়াতের সার সংক্ষেপ।

আমি পবিত্র কুরআন-হাদিছকে আশ্রয় করে, পবিত্র ছুরা ফাতিহা- অর্থাৎ ছুরাতুল হামদ, উম্মুল কুরআন, ছুরাতুস্ সালাত বা ছুরাতুছ্ ছাবউল মাছানি— বার বার পাঠনীয় ছুরার ছায়া অবলম্বন করেই আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে এ গ্রন্থের প্রথম খন্ড লেখে শেষ করার জন্য তওফিক দেয়ায় লাখ লাখ শোকরিয়া আদায় করছি।

এ গ্রন্থ রচনায় অনেক ক্ষেত্রে আমার ভাষা ও ভুল-ত্রুটি রয়েছে। আমার সদোদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে চেয়ে ক্ষমা করুন। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের যে কেউ আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপূরক হিসেবে ভুলত্রুটি সহ আরো উন্নত উপদেশদান করলে পরবর্তী সংস্করণে, ইনশাল্লাহ, সংযোজনের জন্য সচেষ্ট থাকব।

আমি সিটি কম্পিউটার সার্ভিস, ১০৪/সি, কাকরাইল রোড, ঢাকা-১০০০ - এর জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান (স্বপন) ভাই এবং কম্পিউটার কম্পোজার জনাব আনোয়ার হোসেন গত ১৯৯৮ইং হতে ২০০১ইং সন পর্যন্ত বহু অর্থ দন্ড, ধৈর্য সহকারে নিঃস্বার্থভাবে গ্রন্থখানা ট্রেসিং সহ কম্পোজ করে দেয়ার এবং আমার হিতৈষীদের জন্য আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া সহ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন; আর্ রাহমানির রাহিম, মালিকি ইয়াওদ্দিন। আমিন। অর্থঃ (১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য (যিনি) ত্রিভুবনের 'রব'। (২) (যিনি) রহমান ও রহীম। (৩) (যিনি) মহাবিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি। সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি।

দোআ' ছাই
ছাইদুল হক মজুমদার
গ্রন্থকার

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১ম খন্ড ঃ আল্লাহ ও রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর ব্যাপকতা

প্রথম অধ্যায় ঃ তা-আউয ও তাছমিয়া

পৃষ্ঠা

১। তা-আউযের উৎপত্তি ১১
২। শয়তানের বিভিন্নরূপ ১১
৩। তা-আউয পড়ার নিয়ম ১৩
৪। তা-আউয বা আউযু পড়ার অন্যান্য নিয়ম ১৪
৫। বিছমিল্লাহ্ পড়ার উৎপত্তি ১৫
৬। বিছমিল্লাহ্ বা তাছমিয়া পড়ার নিয়ম ১৬
৭। রহমান ও রহীম শব্দের তাৎপর্য ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আল্লাহর ব্যাপকতা

৮। আল্লাহ নামের বৈশিষ্ট্য ২০
৯। আল্লাহর ব্যাপকতা-১ ..... ২২
১০। আল্লাহর ব্যাপকতা-২ ২৪

তৃতীয় অধ্যায় ঃ রছুলুল্লাহ (সঃ) এর ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য

১১। রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর ব্যাপকতা ২৯
১২। মুহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর মর্যাদা ২৯
১৩। ওহী শব্দের অর্থ ও প্রসঙ্গ ৩২
১৪। ওহীর উৎস ৩৩
১৫। ওহী ৩৪
১৬। ওহীর ওজন ৩৭
১৭। বিশ্ব-নবীর দৈহিক শক্তি ৩৮
১৮। রছুলুল্লাহ (সঃ) এর ওজন ৪১
১৯। ওহীর ব্যবহার ও প্রয়োজন ৪২

চতুর্থ অধ্যায় ঃ রছুলুল্লাহর (সঃ) সংসার ও কর্মজীবন

২০। বিশ্বের নুরনবীকে প্রেরণের মাধ্যম ৪৫
২১। নুরনবীর দুধ পান ৪৬
২২। নুর নবীর আব্বা ও আম্মার এন্তেকাল ও প্রাসঙ্গিক কথা ৪৭
২৩। রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর ছিনাচাক ৪৮
২৪। রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর ৪ বার ছিনাচাক ৪৮
২৫। বিশ্বনবীর বিবিগণ ৫০

www.pathagar.com

২৬। বিশ্বনবীর ছেলে-মেয়ে ৫১
২৭। হাবশে হিজরাত ৫১
২৮। হিজরি সনের বিশেষ বিশেষ দিক ৫৩
২৯। প্রথম হিজরি হতে একাদশ হিজরি পর্যন্ত কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ৫৬

পঞ্চম অধ্যায় ঃ আল-কুরআনের শাশ্বত বৈশিষ্ট্য

৩০। কুরআন সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারনা ৬১
৩১। কুরআনের সঠিকত্ব ৬২
৩২। কুরআন ও বিজ্ঞান ৬৪
৩৩। কুরআন ঃ সংকলনঃ সংরক্ষণ ৬৭
৩৪। কুরআনের আসলত্ব কিভাবে তা লেখা হয় ৬৮

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ রছুলুল্লাহ (সঃ) এর মেরাজ ও সময়ের মূল্যায়ন

৩৫। দরুদ শরিফ ৭৬
৩৬। মেরাজের সময় ৭৬
৩৭। মেরাজের সফর সূচী ৮০
৩৮। রছুলুল্লাহ (সঃ) এর সময়ের মূল্যায়ন-১ ৮৭
৩৯। রছুলুল্লাহ (সঃ) এর সময়ের মূল্যায়ন-২ ৯৬
৪০। তাহাজ্জুদ নামাজের সময় ১০১

সপ্তম অধ্যায় ঃ বিশ্বনবীর প্রয়োজন

৪১। বিশ্বনবীর প্রয়োজন ১০৫
৪২। বেদ-পুরাণে প্রভৃতিতে নুরনবী ১০৬
৪৩। অথর্ববেদ উল্লেখিত হয়েছে ১০৭
৪৪। পার্শী ধর্ম শাস্ত্রে ১০৯
৪৫। তওরাতে ১১০
৪৬। বাইবেলে ১১১

অষ্টম অধ্যায় ঃ পবিত্র কুআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোযেযা মোযেযা-১

৪৭। আছমানি কেতাবঃ ১০৪ খানা ১১৫
৪৮। পবিত্র কুরআনে ৩০ পারা (ছেফারা) ১১৫
৪৯। পবিত্র কুরআনে ৭ মোঞ্জেল ১১৫
৫০। পবিত্র কুরআনের ছুরার সংখ্যা ১১৬
৫১। পবিত্র কুরআনে তেলাওয়াত ছাজিদা ১১৬
৫২। বিষয় ভিত্তিক ৬৬৬৬ আয়াত ১১৭
৫৩। পবিত্র কুরআনে শব্দ সংখ্যা ১১৭
৫৪। পবিত্র কুরআনে হরফ বা বর্ণ ১১৭

www.pathagar.com

৫৫। পবিত্র কুরআনের কোন্ হরফ বা বর্ণ কয়টি ১১৮
৫৬। পবিত্র কুরআনের যের, যবর, পেশ প্রভৃতি ১১৯
৫৭। পবিত্র কুরআনের রুকু সংখ্যা ১১৯
৫৮। পবিত্র কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোযেযা-২ ..... ১২০
৫৯। পবিত্র কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক যোযেযা-৩ ..... ১২৭
৬০। পবিত্র কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোযেযা-৪ ..... ১৩০
৬১। পবিত্র কুরআনের সংখ্যা তাত্ত্বিক মোযেযা-৫ ..... ১৩৯

নবম অধ্যায় ঃ নিশ্বনাবী ও খাত্‌মে নবুয়াত

৬২। ভূমিকা ১৪৭
৬৩। অনুবাদকের নিবেদন ১৪৭
৬৪। নরাশংস শব্দের অর্থ ১৫০
৬৫। নরাশংসের ব্যাপকতা ১৫০
৬৬। নরাশংসের কাল নির্ণয় ১৫১
৬৭। নরাশংসের স্থান নির্ধারণ ১৫২
৬৮। নরাশংসের গুণাবলী ও মহত্ব (১ হতে ৩ পর্যন্ত) ১৫২
৬৯। নরাশংসের প্রয়াগযোগ ১৫৫
৭০। নরাশংসের স্বরূপ (১ হতে ৬ পর্যন্ত) ১৫৫
৭১। নামগত সিদ্ধতা ১৫৭
৭২। কালগত সিদ্ধতা ১৫৭
৭৩। স্থানগত সামঞ্জস্যতা ১৫৮
৭৪। গুণগত সামঞ্জস্যতা ১৫৮
৭৫। নরাশংসের পরোক্ষ জ্ঞান ১৫৮
৭৬। পত্নীগত সামঞ্জস্যতা ১৬০
৭৭। অন্যান্য বিষয়ের সামঞ্জস্যতা ১৬১
৭৮। খোলাফায়ে রাশিদা ১৬২
৭৯। একশত নিষ্ক ১৬৩
৮০। মহাপুরুষ মুছা (অঃ) এর পঞ্চম পুস্তকে ভবিষ্যদ্বানী ১৬৩
৮১। অসামঞ্জস্যতা (১ হতে ১১ পর্যন্ত) ১৬৪
৮২। শূলবিদ্ধ নয় (গ্রন্থকার) ১৬৪
৮৩। সামঞ্জস্যতা (১ হতে ১২ পর্যন্ত) ১৬৮
৮৪। মুছা (আঃ) -এর ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে হওয়া ১৭০
৮৫। অন্তিম ঋষি কে? ১৭০
৮৬। উপসংহার ১৭১
৮৭। উপক্রমনিকা ১৭৪
৮৮। অবতার শব্দের অর্থ ১৭৫

www.pathagar.com

৮৯। অন্তিম অবতারের বৈশিষ্ট্য (১ হতে ১৪ পর্যন্ত) ১৭৬
৯০। স্থান নিরূপন (১ হতে ৩ পর্যন্ত) ১৭৮
৯১। অন্তিম অবতারের সিদ্ধি (১ হতে ১৪ পর্যন্ত) ১৮০
৯২। অষ্টগুণে গুণান্বিত (ক হতে জ পর্যন্ত) ১৮৪
৯৩। ঐশ্বরিক বাণী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া ১৮৭
৯৪। বেদ ও কুরআনের শিক্ষা (১ হতে ৯ পর্যন্ত) ১৮৭
৯৫। উপসংহার ১৮৯
৯৬। ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ কি ১৯২
৯৭। একেশ্বরবাদ ১৯২
৯৮। সার্বভৌম ধর্ম এবং উপসংহার (১ হতে ৯ পর্যন্ত) ১৯৩
৯৯। অথর্ব বেদে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ১৯৪
১০০। সামবেদে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ১৯৬
১০১। যজুর্বেদে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ১৯৮
১০২। সাম্যাজ্যধারী ও বিশ্বমানবকে দীপ্তিদানকারী ২০১
১০৩। ঋগ্বেদে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ২০২
১০৪। ঈলিত স্তুত প্রশংসিত ২০৩
১০৫। নরাশংস সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা ২০৪
১০৬। বিভিন্ন যুদ্ধ (জিহাদ) অভিযান ২০৪
১০৭। মক্কা বিজয় ২০৬
১০৮। দশ সহস্র অনুচরসহ মামহ ২০৭
১০৯। মহাভারতের ভবিষ্যদ্বানী ২১১
১১০। মহাভারতের কল্কীর পরিচয় ২১৩
১১১। ভারতের মন্দিরে কল্কী অবতারের ছবি ২১৬
১১২। মূর্তি পূজা লোপকারী কল্কী ২১৭
১১৩। মাংস ভোজী কল্কী ২১৮
১১৪। সার রাধা কৃষ্ণ ২১৯
১১৫। ড্রেপার ২১৯
১১৬। বেট্রেন্ড রাসেল ২১৯
১১৭। এম,এন রায় ২১৯
১১৮। শ্রীমতী এনি বসন্ত ২২০
১১৯। উপসংহার..... ২২০
১২০। দরুদ ২২৩

www.pathagar.com

আসুন, দ্বীনকে মানি।

১ম খন্ড ঃ আল্লাহ ও রছুলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যাপকতাঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ তা-আউয ও তাছমিয়া

তা-আউযের উৎপত্তি

আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির্ রাজিম— আমি আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান হতে (আত্মরক্ষার জন্য) আশ্রয় চাই।

তা-আউয আমরা যেভাবে পড়ি, পবিত্র কুরআন মজিদে তা এক যায়গায় লেখা নাই। ত্রিশ পারার শেষে ১১৩ নম্বর ছুরা ফালাক এবং ১১৪ নম্বর ছুরা নাছের প্রথমে 'আউযু' এবং ১৪ পারা ১৬ ছুরা নহল ৯৮ নম্বর আয়াতে রয়েছে, 'বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম।' 'আউযুর' সঙ্গে 'বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' যোগ করে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' হয়েছে। যেকোন পাপ কার্য হতে আত্মরক্ষা ও মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে এ-আশ্রয় বাক্য আমরা পড়ে থাকি। ছুরা নহলের আয়াতটির অর্থ— তারপর যখন তুমি কুরআন পড়, তখন বিতাড়িত শয়তান হতে (আত্মরক্ষার জন্য) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

শয়তানের বিভিন্ন রূপ

শয়তান প্রধানত দু'প্রকার ঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য। মাটির মানুষরূপী দৃশ্য শয়তান মানুষের সমাজে বাস করে। এরাই মানুষের সমূহ পাপ কাজের পৃষ্ঠপোষক। এরা আগুনের সৃষ্ট অদৃশ্য জিন জাতীয় শয়তান অপেক্ষা শত সহস্রগুণ বেশী ক্ষতিকর। এরা শয়তানি শুরু করে, শয়তানের অনুসারী হয়ে, তারা তাদের সহচরদের মধ্যে শয়তানির শক্তি, প্রভাব, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা দ্বারা মানুষের দেহ, মন-মানসিকতা, প্রবৃত্তি, শোণিত ও আত্মার উপর আশ্রয় করে এবং অধর্ম, অনাচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও অন্যান্য ছোট ছোট পাপ কাজ করায়; অতঃপর মিথ্যা ধোঁকা, নেশা, আমানতে খেয়াত প্রভৃতি বড় বড় পাপ কাজে প্ররোচনা দিয়ে, তার সহচরদের ইহকাল ও পরকালের সর্বনাশ ডেকে আনে।

www.pathagar.com

আজাজিল এবং তার শহচরদেরকে শয়তান বলে। কিন্তু মানুষ ও জিনকুলের মধ্যে শয়তানের বহু অনুচর ও অনুগামী রয়েছে। হাদিসে শয়তানের সংখ্যা ও বংশ বিস্তারের প্রমাণ আছে। যারা সত্য দ্বীন-ইছলাম অস্বীকার ও ত্যাগ করে, মিথ্যাধর্ম ও বাঁকা পথের অনুসরণ-অনুকরণ করে এবং তাদের অনুগামী সহচর সহ যারা বেহায়াপনা, লিভটুগেদার, নির্লজ্জতা, লাম্পট্যপনা ও সমূহ অনাচার-অশ্লীল-অসামাজিক পাপ কাজ করে এবং পাপাচার প্রচার করে, তারা সবাই হয় শয়তান, না হয় মোনাফেক শয়তানের দলভুক্ত।(৩য় খন্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায় জিন দ্রঃ) এবং ৮ পারা, ৬ ছুরা আলআম, ১১২ ও ১১৩ আয়াত দ্রষ্টব্য।

এই মাটির মানুষরূপী শয়তানকে ভাল-মন্দ প্রায় সবাই চেনে। তার সঙ্গে উঠা-বসা, লেন-দেন সবাই করে। অনেক ক্ষেত্রে সে-ই বাড়ির ও সমাজের সর্দার হয়। একটু চিন্তা করলে দেখা যায়, দশের দেশের সর্বোচ্ছ শাসন হতে শুরু করে, সর্বনিম্ন আসন পর্যন্ত তাদের দখলে। আজকাল তাদের দাপট, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সব চাইতে প্রবল। তাই মোমেন মুছালমান মাত্রই এসব দুরাচার-পাপাচারী মানুষরূপী শয়তানের হাত হতে আত্মরক্ষা ও পাপ হতে মুক্তির জন্য এ আশ্রয় বাক্য পড়ে, আল্লাহ গফুরুর রহীমের কাছে আশ্রয় ও সাহায্য চাওয়া একান্ত কর্তব্য।

আমাদের সমাজে যে কোন অন্যায় কাজ করলেই বলা হয়, (আগুনের তৈরী অদৃশ্য) শয়তানের প্ররোচনায় বা ধোঁকায় পড়ে করা হয়েছে; কিন্তু মহাবিচার দিনে এই অদৃশ্য শয়তানকে দোষী করা হলেও, তা প্রমাণ বা সনাক্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, আগুনের সৃষ্টি অদৃশ্য শয়তানকে সেই বিচার দিনের কঠিন ও অসহায় অবস্থায় কেউ চোখে দেখেছে; কিংবা হাতে ধরেছে বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না। শয়তান কোন অবস্থাতেই তার শয়তানির কথা স্বীকার করবেই না, বরং সে বাদী হয়ে বলবে, 'আমাকে কি তুমি চোখে দেখেছ?' তখন পাপী বান্দা শয়তান দেখেছে বলে প্রমাণ করা দুষ্কর হবে। সুতরাং সাবধান! সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস; অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

আল্লাহ বলেন, "যারা ইমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক— তিনি তাদেরকে আঁধার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান;

www.pathagar.com

এবং যারা বে-ইমান—শয়তান (তাগুত) তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে আঁধারের দিকে লয়ে যায়। ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী—তারা তার মধ্যে সর্বদা থাকবে।"

৩ পারা, ২ ছুরা বাকারাহ্, ২৫৭ আয়াত।

এদিকে মানুষরূপী শয়তান প্রত্যক্ষভাবে মানুষের সঙ্গে জড়িত থাকে। তাকে চোখে দেখা যায়, তার কথা কানে শুনা যায়, মুখে কথা হয়, হাতে ধরা হয়, ত্বক স্পর্শ করা হয়। সেই বিচার দিবসে শয়তান বন্ধু, তার শয়তানি অস্বীকার করলেও চোখের ক্যামেরায় সাক্ষী দেবে; কানের ক্যাসেট স্বীকার করবে; মুখের জিহ্বা স্বীকার করবে; হাত-পায়ে স্বীকার করবে। অতএব, মানুষরূপী শয়তান হতে সাবধান! মহা হাশরে মানুষরূপী শয়তান ও তার অনুসারীরা ধরা পড়বেই। কিন্তু একে অপরকে অস্বীকার করবে।

আল্লাহ বলেন, "আজ (হাশরের দিন) আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দেব এবং তাদের হাতগুলো আমার সামনে কথা বলবে এবং তারা যা আয় করেছিল সে বিষয় তাদের পাগুলো সাক্ষ্য দেবে।

২৩ পারা, ৩৬ ছুরা ইয়াছিন, ৬৫ আয়াত।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, "আমি যে সমস্ত নিদর্শন ও উপদেশ নাযিল করেছি তা মানুষের জন্য খোলাখুলি ভাবে কুরআনে প্রকাশ করা সত্তেও যারা ঐ সকল গোপন করে, তাদের উপর আল্লাহ লানত দেন এবং লানত কারীরাও তাদেরকে লানত দিয়ে থাকে এবং প্রত্যেক লানতকারীও লানত দেবে। কিন্তু যারা তওবা করে সৎপথ অবলম্বন করে এবং আল্লাহর আদেশ সমূহ বুঝায়ে প্রকাশ করে দেয়, আমি তাদের ক্ষমা করি এবং আমি ক্ষমাকারী দয়ালু। নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের থাকা অবস্থায় মরেছে, তাদের উপরে আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের লানত।

২ পারা, ২ ছুরা বাকারার, ১৫৯, ১৬০ ও ১৬১ আয়াত।

যারা পবিত্র কুরআনের আয়াত গোপন করে তারাই প্রকাশ্য শয়তানরূপী মানুষ।

তা-আউয পড়ার নিয়ম

কোন কোন তফছিরকারক 'আউযু বিল্লাহিছ্ ছামিউল আলিমি মিনাশ শাইতানির রাজিম' বাক্য যোগে তা-আউয পড়ার পক্ষে মত

www.pathagar.com

দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে পবিত্র কুরআন মজিদের ৯ পারা, ৭ ছুরা আরাফ, ২০০ আয়াতের উল্লেখ করেন। এ আয়াতের অর্থ— এবং যদি বাধাদানকারী শয়তান তোমাকে বাধা দেয়, তবে তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও; নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। অন্য পক্ষে, ইমাম আহমদের মতে, উক্ত উভয় প্রকার বাক্য যোগেই আশ্রয় বাক্য পড়তে হবে। অর্থাৎ "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ইন্নাহু হুয়াছ ছামিউল আলিম—" আমি আল্লাহর কাছে লানত প্রাপ্ত শয়তান হতে মুক্তির জন্য আশ্রয় চাই, নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

পবিত্র কুরআন মজিদের বহু স্থানে, বহু প্রসঙ্গে শয়তানকে প্রকাশ্য শত্রু অর্থাৎ 'আদু-উম-মুবিন' শব্দদ্বয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং এরাই লানত প্রাপ্ত।

তা-আউয বা আউযু পড়ার অন্যান্য নিয়ম

আউযুবিল্লাহ্ পড়ার ব্যাপারে কিছু মতভেদ আছে। তার মধ্যে অধিকাংশ ইমাম ও আলেমের মতে নামায ও কুরআন পড়ার সময়ে আযুবিল্লাহ্ পড়া ছুন্নাত। আবার কেউ কেউ বলেছে, "কুরআন পড়ার জন্য আউযু পড়া ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজিদে বলেন, "যখন কুরআন পড়বে, তখন শয়তানের প্রবঞ্চনা, প্ররোচনা ও প্রলোভন হতে আল্লাহ তাআলার কাছে মুক্তি চাও, অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ পড়।

১৪ পারা, ১৬ ছুরা নহল, ৯৮ আয়াত

১। যাবিরের ছেলে নাফেয় বলেছেন, "আমাদের রছুলুল্লাহ আউযু-বিল্লাহ্ এভাবে পড়তেন ঃ আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজিম।"

২। সোহায়েল ইবনি- মাস্উদ রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইবনি মাস্-উদ বলেছেন, একবার আমি হযরতের সামনে আউযুবিল্লাহ্ এভাবে পড়েছিলাম ঃ "আউযু বিল্লাহিছ-ছামিউল আলিমি মিনাশ্ শাইতানির রাজিম।"

তখন আমাকে হযরত (ছঃ) বলেছেন, হে ইবনি-মাস্উদ! তুমি আউযুবিল্লাহ্ এভাবে পড় ঃ "আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতা-নির রাজিম।"

www.pathagar.com

কারণ আমি এভাবে জিব্‌রাইল (আঃ) হতে পেয়েছি, জিব্‌রাইল (আঃ) মিকাইল (আঃ) হতে পেয়েছেন, মিকাইল (আঃ) লউহ্-মাহ্‌ফুযের মধ্যে দেখেছেন।

তবে সাতজন কারি সাহেব সাত রকমে আউযু (তা-আব্বুয) বিল্লাহ্ পড়েছেন। যথা ঃ-

১। ইমাম নাফেয় সাহেব পড়েছেন, "আউযু বিল্লাহি মিনাশ্-শাইতা-নির-রাজিম।"

২। ইমাম ইবনি-কাছির সাহেব পড়েছেন, "আউযু বিল্লাহিল আযিমি মিনাশ শাইতানির-রাজিম।"

৩। ইমাম আবু-আমর সাহেব পড়েছেন, "আউযু বিল্লাহিছ্ ছামিউল আলিমি মিনাশ্ শাইতানির্ রাজিম।"

৪। ইমাম-ইবনি-আমর সাহেব পড়েছেন, "আউযু বিল্লাহিল আযিমিছ ছামিউল আলিমি মিনাশ্ শাইতানির রাজিম।"

৫। ইমাম আছেম সাহেব পড়েছেন, "আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির্ রাজিম ইন্নাল্লাহা হুয়াছ্ ছামি উল আলিম।"

৬। ইমাম হামযা সাহেব পড়েছেন, "আছতাইযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির্ রাজিমি ইন্নাল্লাহা হুয়াছ্ ছামিউল আলিম।"

৭। ইমাম কাছায়ি সাহেব পড়েছেন, "নাছ তাইযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতা নির্ রাজিমি ইন্নাল্লাহা হুয়াছ্ ছামিউল আলিম।"

যার যে নিয়মে পড়তে ভাল লাগে সে, সে নিয়মে পড়তে পারে। সকল নিয়মই দুরস্ত আছে। (মুফিদুল কারি, উছিনাতুল কারি ও কারিউল কুরআন দ্রঃ)।

বিছমিল্লাহ পড়ার উৎপত্তি

তাছমিয়া— বিছমিল্লাহকে তাছমিয়াও বলে। পবিত্র কুরআন মজিদে রাণী বিলকিছের কাছে হযরত ছোলাইমান (আঃ)-এর লেখা পত্রে 'তাছমিয়া'র উল্লেখ আছে। সে তাছমিয়ায় বলা হয়েছে— নিশ্চয় উহা ছোলাইমানের তরফ হতে এসেছে এবং নিশ্চয় উহা পরম করুনাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু হয়েছে।

১৯ পারা, ২৭ ছুরা নমল, ৩০ আয়াত।

www.pathagar.com

বিছমিল্লাহ বা 'তাছমিয়া' পড়ার নিয়ম

পবিত্র কুরআনের একটি বিশিষ্ট আয়াত। এই তাছমিয়া বা আল্লাহর নাম যুক্ত কল্যাণ বাক্য সারা দুনিয়ার মুছালমান তাঁদের যে কোন সৎ ও কল্যাণজনক কাজের শুরুতে পড়ে থাকেন।

বিছ্‌মিল্লাহ পড়ার ব্যাপারেও কিছু মতভেদ দেখা যায়। কালুনের রেওয়ায়েত মতে প্রত্যেক ছুরা পড়ার শুরুতে বিছ্‌মিল্লাহ পড়া ছুন্নাত। কিন্তু ইমাম আছেম, ইমাম ইবনি-কাছির ও ইমাম ইব্‌নি কাছায়ির মতে দুই ছুরার মধ্যস্থলে বিছ্‌মিল্লাহ পড়া 'ওয়াযিব'। কারণ হযরত রছুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুই ছুরার মধ্যস্থলে (ছুরা তওবা বা বারায়াত ছাড়া) বিছমিল্লাহ পড়েনা, সে যেন কুরআন হতে ১১৩টি আয়াত ছেড়ে দেয়। সে মতে ইমাম শাফেয়ি (রাঃ) সাহেব ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযের ফর্‌যের মধ্যে বিছমিল্লাহ বড় করে পড়তেন এবং বলেছেন 'মিছ্‌মিল্লাহ' প্রত্যেক ছুরার অংশ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) সাহেব বলেন, "বিছ্‌মিল্লাহ প্রত্যেক ছুরার শুরুতে পড়া ছুন্নাত।"

ছুরা বারায়াত বা ৯ম ছুরা তওবার (১০ পারা) শুরুতে বিছ্‌মিল্লাহ নাযেল হয়নি। কারণ, বিছ্‌মিল্লাহ রহমতের সময়ে নাযিল হত। আল্লাহ তায়ালা বিধর্মী কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এ-ছুরাটি নাযেল করেছেন। তাই এ ছুরার শুরুতে বিছ্‌মিল্লাহ নাযেল হয়নি। এর পেছনে আরো কারণ রয়েছে (১ম খন্ড, ৫ম অধ্যায়, পবিত্র কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মুযেযা-২ দ্রঃ)

তবে ছুরা তওবার শুরুতে বিছ্‌মিল্লাহর বদলে পড়তে হয়, "আ-উযু বিল্লাহি মিনান্নারি ওয়া মিন শার্‌রিল কুফ্‌ ফারি ওয়া মিন গাদাবিল জাব্বারি- আল্‌ ইজ্জাতু লিল্লাহি ওয়া লি রাছুলিহি ওয়া লিল্‌ মু'মিনিনা।"

রহমান ও রহীম শব্দের তাৎপর্য

পবিত্র কুরআনের এই তাছমিয়ার মধ্যে আল্লাহর গুণবাচক নাম, 'রহ্‌মান ও রহীম' শব্দ দু'টির উৎপত্তি একই ধাতু হতে হলেও, উভয় শব্দের ব্যঞ্জনার মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন তফছিরকারক বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কার কার মতে 'রহমান'— সর্বপ্রদাতার নাম

www.pathagar.com

দ্বারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ, জলচর, স্থলচর, আকাশচর নির্বিশেষে সর্বজীবে— যথা প্রয়োজন— বৈষয়িক ব্যাপার সকলের সমান কল্যাণ জ্ঞাপক।

'রহীম'— পরম করুণাময় নাম দ্বারা খাছ করে ইমানদারদের ইহ ও পরকালের যাবতীয় করুণা ও দয়ার ভাব প্রকাশ করে।

আল্লাহ নামের 'রহমানী' শক্তি দ্বারা চতুর্ভূত অর্থাৎ আগুন-পানি-মাটি, বায়ুর ভোগ বিলাসের অধিকার জল- স্থল ও আকাশে বিচরণকারী সকলের সমান জ্ঞাপক।

যত প্রতাব প্রতিপত্তি, শক্তিধর, বুদ্ধিমান বা চতুর হউক না কেন, চতুর্ভূত ভোগ-বিলাসের বেলায় উনিশ-বিশের হারে সবাই সমান। 'কেউ খাবে না, আর কেউ পাবে না' —একথা চতুর্ভূতের বাজারে খাটে না। আবার এই 'রহ্মান ও রহীম' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ 'রহমান' শব্দ দ্বারা খাছ করে ইমানদারদের দুনিয়া-আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ এবং 'রহীম' শব্দ দ্বারা আমভাবে সকলের সমান অধিকার বুঝায়েছেন। যাহউক, সকল তফছির কারকদের মূলদ্যোতনা এক।

চতুর্ভূতের স্রষ্টা আল্লাহকে বিশ্বাস করুক, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রকৃতি বাদী হউক, জীব নির্বিশেষে সবাই চতুর্ভূতের কাছে আনুগত্যতা না করে কার গত্যন্তর নাই। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়; বুঝে কিংবা না বুঝে, হউক ইমানদার, আর বেইমানদার সবাই চতুর্ভূতের কাছে অক্ষম ও অনুগত হতে বাধ্য।

চতুর্ভূতের কাছে আনুগত্যতা ও আত্মসমর্পণ যদি আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ মোতাবেক হয় তবে সে ইমানদার মোমেন; আর তার জন্য রয়েছে ইহ ও পরকালে আল্লাহর 'রহমানী ও রহীমী' উভয় নামের অপার করুণা ও দয়া। আর যদি কেউ চতুর্ভূতের কাছে কেবল ভোগ-বিলাস ও দুনিয়ার লোভে আনুগত্যতা করে তবে সে প্রকৃতিবাদী বস্তুবিলাসী। ভোগ বিলাসের বাজারে একজন মোমেনের কাছে বৈষয়িক দৃষ্টি কোণ থেকে জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ এবং পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ নির্বিশেষে সবাই সমান। যেমন বৈষয়িক ব্যাপারে বিশ্ব স্রষ্টা মাবুদের কাছে সবাই সমান। এ নিয়তেই মুছালমানেরা তাঁদের যে কোন সৎ ও

www.pathagar.com

ভাল কাজের শুরুতে এ-তাছমিয়া পড়ে থাকে। অন্যথায় তার ইমানে দৈন্যতার প্রভাব প্রকট বুঝতে হবে।

আগুন বা পানি, কিংবা মাটি বা বায়ু একা ভোগ-বিলাস করার অধিকার আল্লাহ কাউকে দেন নাই। যদি তা হত তবে স্রষ্টার সৃষ্টি বহু আগেই সব বিলীন হয়ে যেত।

আল্লাহ তাঁর রহমান ও রহীম গুণবাচক নামদ্বয় পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে বহু প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং এই নামদ্বয় পবিত্র কুরআন নাযেল প্রসঙ্গেও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'ইহা (কুরআন) করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ হতে নাযেল হয়েছে।' সুতরাং বুঝা যায় যে, রহমান ও রহীম আল্লাহর গুণবাচক নামদ্বয়ের গুরুত্ব কত মহৎ, কত ব্যাপক। যেহেতু কুরআন বিশ্বজনীন।

২৪ পারা, ৪১ ছুরা হা-মিম, ২ আয়াত।

এদিকে মুছালমান শব্দের অর্থও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যতা বুঝায়। তাই, রহমান-রহীম -এর সঙ্গে ইসলাম তথা মুছালমান শব্দের মধ্যে কত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাব রয়েছে তা চিন্তা করে দেখার গুরুত্ব বহন করে। বৈষয়িক ব্যাপারে, একজন তাছমিয়ায় বিশ্বাসী মুছালমানের কাছে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাই সমান। তাছাড়া মুছালমানেরা পবিত্র কুরআনের ২১ পারা, ৩১ ছুরা লোকমানের ১৫ নম্বর আয়াতকেও সদাসর্বদা স্মরণে রাখে। এ আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তারা তোমার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আমার সঙ্গে শরিক করবার জন্য বাধ্য করে তবে তুমি তাদের কথা মেনে নিওনা; অবশ্য দুনিয়ার বৈষয়িক ব্যাপারে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার রক্ষা কর এবং ঐলোকের পথ অনুসরণ কর, যে আমার দিকে অনুগতভাবে ফিরে আসে। অবশেষে যখন তোমরা আমার দিকে ফিরে আসবে তখন আমি তোমাদিগকে অবশ্যই জানায়ে দেব যা তোমরা করতে'।

এ আয়াতে সু-স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমার অজ্ঞতা বশতঃ তোমার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব কিংবা মা-বাপেও যদি কোন বিষয় আল্লাহর সঙ্গে শরিক বা পাপ কাজ করতে বলে বা বাধ্য করে তবে তুমি তা সরাসরি অস্বীকার করবে, কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে মুশরিক,

www.pathagar.com

কাফের, স্বজাতি-বিজাতি যেই হউকনা কেন প্রয়োজনমত সমতা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। সুতরাং আল্লাহর গুণবাচক রহমান ও রহীম নামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই পবিত্র আয়াতেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যার হাতে হয়াত-মউত সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের আস্তিক-নাস্তিক, পাপী-তাপী, ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, পঙ্গু-আতুর, কীট-পতঙ্গ, নির্বিশেষে সকলের প্রয়োজনীয় আহার-বিহার যোগাচ্ছেন। সেহেতু তাঁর বান্দা মোমেন মুছালমানদের সকল সৎ ও মঙ্গলজনক কাজের শুরুতে তাছমিয়া বা বিছমিল্লাহ'র শিক্ষা ও আবেদনও তাই। কিন্তু তাছমিয়া পড়ার এই শিক্ষা, দর্শন ও আবেদনের বিপরীত আচার-আচরণ যাদের, তারা এর তাৎপর্য ও মর্মকথা বুঝেনা অথবা বুঝতে চেষ্টা না করে ভুল করছে।

কেউ কি সূর্যের আলো ও বায়ু নিজের ইচ্ছামত অধীন করে রাখতে পারেন? কুপমণ্ডকমুর্খ ছাড়া তাছমিয়া পাঠকারী মুছালমান সীমাতিক্রম করে, মাটি আর পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি ও প্রাণ নেয়া-দেয়ার জন্য উম্মত্ত মাতাল হতে পারে না।

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের অন্তর্গত দৃশ্য-অদৃশ্য ক্ষুদ্রতম হতে বৃহত্তম জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে স্থাবর-অস্থাবর জঙ্গম সকলের জন্য রয়েছে চতুর্ভূতের রাজ্যে উনিশ-বিশের হারে সমান অধিকার। আর এই যে, কেউ মারে, আর কেউ মরে— এর মধ্যে রয়েছে, সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষার ও ভাল-মন্দ, সদসত, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার পরীক্ষাগার।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আল্লাহর ব্যাপকতা

আল্লাহ নামের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ শব্দটি জাতি নাম। এ নামটি আরবীতে লেখতে আলিফ+লাম+লাম+হা— এ চারটি হরফ বা বর্ণ লাগে। আল্লাহ নামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এই আল্লাহ শব্দের ডান দিক হতে বা বাম দিক হতে একটি একটি করে বর্ণগুলো ফেলে দিলে 'আল্লাহ' নামের অনর্থ ঘটেনা। যেমন— ডান দিক হতে প্রথম বর্ণ 'আলিফ' ফেলে দিলে থাকে 'লিল্লাহে' মানি— (সমস্ত কিছু) তাঁর জন্য; একটি 'লাম' ফেলে দিলে থাকে 'লাহু' অর্থ তাঁর জন্য; দ্বিতীয় 'লাম' ফেলে দিলে থাকে 'হু' মানি— তিনি। আবার বাম দিক থেকে 'হা' ফেলে দিলে থাকে 'আল্লা' মানি— আল্লা; একটি 'লাম' ফেলে দিলে থাকে 'আল' মানি— নির্দিষ্ট এক; দ্বিতীয় 'লাম' ফেলে দিলে থাকে 'আলিফ' মানি— আনা, আহাদ, আজালী, আবাদী, আউয়ালু-আখেরু। অর্থাৎ ঃ 'আমি, অদ্বিতীয়, অসীম, অনন্ত, আদি-অন্ত। আল্লাহ শব্দের এ বিশ্লেষণ দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ এমন একটি বিশেষ শব্দ— যার ডান কিংবা বাম দিক হতে একটি একটি করে বর্ণ ফেলে দিলেও আল্লাহ নামের অদ্বৈত অর্থের বিকার ঘটেনা।

'রব' শব্দের বহু অর্থ রয়েছে। যথাঃ- অধিপতি, কল্যাণ-প্রদাতা, সুপরিচালক, সুবিন্যস্তকারী, পরিপূর্ণকারী প্রভৃতি। তাছাড়া নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা-সম্পাদন, সুপরিচালন, প্রতিপালন, সংরক্ষণ এবং এরূপ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আরো বহু অর্থ এই 'রব' শব্দে রয়েছে। 'রবুবিয়াত' বা রব আল্লাহ তাআলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মন্ডিত গুণ। কোন মূল বস্তু হতে পরিমার্জিত করে ব্যক্তি বা সৃষ্টি বিশেষের উন্নতিসাধন এবং পূর্ণতা বিধানের শক্তিশালীও এ 'রব' শব্দের দ্যোতনা। 'রব' শব্দের আরো বহু অর্থ— বহু নিগূঢ় ব্যঞ্জনা রয়েছে। রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা ও সংহার কর্তাও আল্লাহর গুণ নামক শব্দ রবের মধ্যে রয়েছে।

এসব গুণ কিন্তু রহমাতুল্লিল আলামিন মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহর (সঃ) মধ্যে দেয়া হয় নাই। তিনি রহমাতুল্লিল আলামিন। অর্থাৎ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অন্তর্গত আল্লাহর ব্যাপকতা যতদূর পর্যন্ত

www.pathagar.com

(আল্লাহ কর্তৃক স্বীকৃত) ব্যাপ্ত ততটুকুর রহমত। রহমত অর্থ ঃ মায়া, মমতা, স্নেহ, অনুগ্রহ ও দয়া প্রভৃতির অপার সাগর। তিনি খাইরুল বাশার, অর্থাৎ সৃষ্টি কুলের সেরা এবং তিনি 'সাইয়্যেদুল আমবিয়া', অর্থাৎ নবীকুলের (সর্বশেষ) মহা-সরদার এবং 'আলামিন' শব্দটি 'আলম' শব্দের বহুবচন। 'আলম' শব্দটি 'ইলম' ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ জানা বা জ্ঞাত হওয়া। বিশ্বসৃষ্টি বা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অন্তর্গত প্রত্যেকটি, প্রত্যেক শ্রেণী সম্প্রদায় অথবা সমস্ত সৃষ্টির সমষ্টিকে 'আলম' নামে অভিহিত করা হয়। এক এক করে বলতে গেলে বলতে হয়— জিন, এনছান, পৃথিবী, চাঁদ-সুরুজ, নক্ষত্রমালা, উল্কা মন্ডলী, আকাশ-পাতাল, জল-স্থল, আগুন, পানি, মাটি, বায়ু সবই 'আলম' নামে পরিচিত। আলমের সংখ্যা রাব্বুল আলামিন ছাড়া কেউ জানে না। তবে সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য আলম রয়েছে। আলম যত সংখ্যকই থাকুক না কেন আল্লাহর রবুবিয়াতের অন্তর্গত যত আলম আছে তা সবের রহমত স্বরূপ নবী মুহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ)। সৃষ্টি বা আলম ছাড়া সৃষ্টি নাই। এই আলম সমূহের সংখ্যা কত সে সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। কেউ বলে চৌদ্দ হাজার, কেউ বা আঠার হাজার, আবার কেউ বলে আশি হাজার। আসলে আলম সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য। আমিও একটি আলম। আমার মধ্যে সংখ্যার মধ্যে (আল্লাহর জ্ঞাত সংখ্যাই সঠিক) কত অসংখ্য আলম রয়েছে তার হিসেব আমার নিজের কাছেই নাই।

আমি যখন বলি, আমি। এই আমির মধ্যে কত অসংখ্য কোটি প্রাণী বা সৃষ্টি বা আলম মিলে আমির আমিত্ব রক্ষা করা হচ্ছে, তার হিসেব সংখ্যা তত্ত্ব দিয়ে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এক বিন্দু বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয়। সেই এক বিন্দুর মধ্যে কত কোটি জীবানু রয়েছে, তার হিসেব-নিকাশ কি কেউ করে দেখেছে। ঐ একটি জীবানুর দৈর্ঘ নাকী এক মিলি মিটারের ১/১০,০০০ ভাগ। তাই যদি হয় তাহলে আমার মধ্যে কত লক্ষ কোটি জীবানুর সমাহার আমিত্বের মধ্যে থেকে আমার আমিকে রক্ষা করছে— সেই মহা রবের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা—তার হিসেব কে দেবে? আর এসবেরই রহমত—মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ) এবং আল্লাহ নামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতাও এরূপ।

www.pathagar.com

আল্লাহর ব্যাপকতা - ১

সর্বপ্রদাতা পরম করুনাময় আল্লাহর নামে।

আল্লাহ। আল্লাহর ব্যাপকতা নির্ণয় করা প্রকৃত পক্ষেই অপ্রকৃত ব্যাপার। অংকশাস্ত্রের অংক, পরিসংখ্যান বিদ্যা, দাঁড়ি-পাল্লার ওজন অথবা মাপের ফিতা বা জমি জরিফের আমিনদের চেইন দিয়ে আল্লাহর রাজ্যের ব্যাপকতা সীমায়িত করার সীমা নাই।

বিজ্ঞানীরা বলেন, আলোর গতি নাকি প্রতি শেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল (১,৮৬,০০০)। তাঁরা আরো বলেন, পৃথিবী সৃষ্টির দিন তারিখ নিশ্চিত নয়। কেউ বলেন কোটি কোটি বছর; আবার কেউ কেউ বলেন কোটি কোটি বছর অপেক্ষাও বহুগুণ বেশী। এই কোটি কোটি বেশী বা কম তা যে কত কোটি তাও অনুমান ভিত্তিক, সঠিক তত্ত্ব নয়।

উর্ধ গগনে কত কোটি তারা-নক্ষত্র আছে তার সঠিক সংখ্যা তত্ত্ব আজ উনিশ শ' নিরানব্বই সনের শেষ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেন নাই। আর নিখিল বিশ্বব্যাপী কত কোটি গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে তারও নিশ্চিত সংখ্যা কার হাতে নাই।

আকাশে জ্যোতিষ্কের মধ্যে অসংখ্য আলোক বিন্দু মিট মিট করছে। এরা মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের সাধারণ নাম দেয়া হয়েছে 'জ্যোতিষ্ক'। জ্যোতিষ্কগুলো আবার নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। নক্ষত্র সহ অন্যান্য জ্যোতিষ্কগুলো স্ব স্ব কক্ষ পথে যে কোন একটি বিশেষ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে এক নির্দিষ্ট সময়ে ঐ নক্ষত্রকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক প্রদক্ষিণ করছে ওদেরকে নিয়েই সৌরজগত। এই সূর্যের আকর্ষণে যেসব গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু প্রভৃতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের মধ্যে রয়েছে ঃ বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, গ্রহানুপুঞ্জ, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, ধুমকেতু, প্লুটু প্রভৃতি।

কোটি কোটি নক্ষত্রের প্রতিটির নিজস্ব আলো ও তাপ আছে। এদের আলো মিট মিট করে। এরা দূরে বলে, দেখতে স্থির। এদের পরস্পরের মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্বের কোন ব্যতিক্রম নাই। সেজন্য

www.pathagar.com

এদেরকে স্থির তারাও বলে। আমাদের ঐ সূর্যও এরূপ একটি নক্ষত্র। আর নীহারিকার সংখ্যা কত। কে জানে।

সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা তের লক্ষ গুণ বড়। এই সূর্যের ব্যাস পৃথিবী অপেক্ষা একশ' দশ গুণ (১১০)। সূর্য পৃথিবী হতে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে সূর্য হতে পৃথিবীতে সূর্যের আলো আসতে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল অতিক্রম করতে হয় এবং তার আলো পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে আট/নয় মিনিট। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র নাকি প্রক্সিমা সেন্টুরাই। প্রায় পঁচিশ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। এর আলো পৃথিবীতে আসতে সোয়া চার বছর সময় লাগে। আর ধ্রুব তারা হতে পৃথিবীতে তার আলো আসতে ৪৭ বছর সময় লাগে।

মহাশূন্যে এমন বহু নক্ষত্র রয়েছে যার আলো পৃথিবীতে আসতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে। আবার মহাশূন্যে সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য কোটি নক্ষত্র ভেসে বেড়াচ্ছে। যারা কোটি কোটি বছর আগে সৃষ্ট বটে, কিন্তু তাদের আলো আজো পৃথিবীতে এসে পৌঁছে নাই। এবার ভেবে দেখুন নক্ষত্ররাজী পৃথিবী হতে কত দূরে। আল্লাহর সৃষ্ট নিখিল বিশ্বটাই বা কত বড় এবং তার সীমা কোথায়? আর আল্লাহর ব্যাপকতাই বা কত দূর।

চিন্তাশীল জ্ঞানীজন বলছেন, খালি চোখে ছয় হাজার নক্ষত্র দেখা যায়। দূরবীনের সাহায্যে প্রায় পঞ্চাশ কোটি নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব কথাও অল্প জ্ঞানী মানুষের কথা ও তত্ত্ব-তথ্য ভিত্তিক। এসব মানুষের দেয়া তথ্য হতে কি আল্লাহর ব্যাপকতার সীমা নিশ্চিত হওয়া যায়?— না। তাঁর ব্যাপকতা তিনিই জানেন। পেটের কীট পেটের বাইরে কি আছে, তা কি করে বলবে? তাই তাঁর সৃষ্ট ক্ষুদ্র জীব মানুষের পক্ষে তাঁর ব্যাপকতা ও তাঁর সাম্রাজ্যের ব্যাপকতার কথা ভাবতেই অবাক-অজ্ঞান হতে হয়। তাই আল্লাহই সর্বজ্ঞ। তার আসন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ব্যাপী।

এবার আসুন, আল্লাহর সৃষ্টি সীমার মধ্যে অসীম, সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য কোটি নক্ষত্রের কথা চিন্তা না করে, এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দৃশ্যমান সূর্যের সঙ্গে এ পৃথিবীর প্রাণীদের তুলনা করে দেখি। সূর্য হতে পৃথিবী তের লক্ষ গুণ ছোট। মানুষ কত ক্ষুদ্র! এ-ই ছোট পৃথিবী নামক গ্রহের

www.pathagar.com

একটি মানুষ যদি ছয় ফিট হয় (আনুমানিক) তবে ঐ তের লক্ষ গুণ বড় সূর্য্যের দেশের যে কোন প্রাণী তের লক্ষ গুণ বড় নয় কি? ১৩,০০,০০০ X ৬' = ৭৮,০০,০০০ ফিট লম্বা, সূর্যের মানুষটি নয় কি?

উল্লেখ্য, গ্রহ-তারা-নক্ষত্রতেও স্ব স্ব নক্ষত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রাণী আছে। পৃথিবী নিজেও একটা মস্তবড় প্রাণী। তার অন্তর্গত দৃশ্য-অদৃশ্য, বড়-ছোট সবই প্রাণী। মনে রাখবেন, প্রাণী ছাড়া সৃষ্টি নাই— সৃষ্টি ছাড়া প্রাণী নাই। —সৃষ্টি ছাড়া কিছু নাই। কেউ কেউ বলে এ গ্রহে বা ঐগ্রহে, এ নক্ষত্রে বা ঐ নক্ষত্রে প্রাণী নাই। এটা হতে পারেনা, চাদে শোঁ শাঁ, ভোঁ ভাঁ, কিছু শুনা যায় না অথবা কিছু দেখা যায় না বলেই কি চাঁদে কোন প্রাণী নাই। চাঁদে গিয়ে পৃথিবীর মানুষের চোখ দিয়ে কিছু না দেখা গেলে, কিংবা মানুষের কান দিয়ে কিছু শুনা না গেলেই যে, চাঁদে কোন প্রাণী নাই বলে সিদ্ধান্ত নেয়া অমূলক। পৃথিবীর চক্ষুষ্মান প্রাণীদের দেখার মধ্যেও তারতম্য রয়েছে। কোন প্রাণী রাতে দেখেনা, আবার কোন প্রাণী দিনে দেখে না। এ দুনিয়ার প্রাণীদের চোখ-কান দিয়ে অন্য গ্রহ নক্ষত্রের প্রাণীকে দেখা বা ধ্বনি শুনা নাও যেতে পারে। সুতরাং নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি গ্রহ, নক্ষতেও নিশ্চিতই প্রাণী আছে ও উদ্ভিদ আছে। তবে এ দুনিয়ার প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের মত নয়। সুতরাং, —দৃশ্য-অদৃশ সর্বব্যাপী যাঁর আসন - শাসন তিনিই আল্লাহ—সীমার মধ্যে অসীম তাঁর ব্যাপকতা।

আল্লাহর ব্যাপকতা - ২

এযাবৎ উপরে আল্লাহর ব্যাপকতা প্রসঙ্গে তাঁর সৃষ্ট জীন মানুষের তুলনামূলক ক্ষুদ্রতা এবং তাঁর সৃষ্টির বিরাটত্ব ও বিশালত্বের কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছি। তবে মানুষ সৃষ্টি মূলেই দুর্বল।

২১ পারা, ৩০ ছুরা রুম, ৫৪ আয়াত; ১৪ পারা ১৬ নহল ১০— ১৮ আয়াত এবং ৫ পারা ৪ ছুরা নেছা ২৮ আয়াত।

তাই বলে, চুপ করে বসে হাত-পা গুটায়ে চোখ-মুখ বন্ধ করে, জিহ্বা উল্টায়ে তাগুতের হাতে দুনিয়া ছেড়ে দেবার জন্য নয়। পবিত্র কুরআনে মানুষকে চেষ্টা, চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা বার বার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষকে অল্প জ্ঞান দেয়ার কথা বলেছেন সত্য।

www.pathagar.com

তাই বলে জ্ঞানহীন বা জ্ঞান শূন্য নয়। আল্লাহ অসীম। তাঁর দেয়াটাও অসীম। তবে তাঁর জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞান অতি নগণ্য। আল্লাহর দেয়া এই নগণ্য জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক ও দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সৃষ্টির রহস্যলীলার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে সৃষ্ট-জীবের খেদমতে, খেদমতের জন্য প্রয়োগ করার নামই ত এবাদত। ইছলামের প্রাথমিক যুগের বড় বড় আবেদগণ এরূপ এবাদতে মশগুল ছিলেন বলেই তখন কার জল, স্থল, আকাশ মুসলমানের অত ভক্ত ছিল। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় মুছালমানেরা চরম উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। আজকের উন্নত বিশ্বের দাবীদারদের স্বীকার না করে উপায় নাই যে, মুছালমানেরাই তাঁদের জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিল। এই গ্রন্থের ২য় খণ্ড, "বিজ্ঞান ও কারিগরি দ্রষ্টব্য।"

এটাই পরিতাপের বিষয়, যে মুছালমানেরা আজকের বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার প্রয়োগিক বীজ বপন করে ছিল; আজ বিজ্ঞানের মালিক-মোক্তার বলে দাবী করছে যারা, তাদের খাছ গোলাম সেই মুছালমানেরা। জল—স্থলে, আকাশে রাস্তার যায়গা দেবার মালিক মুছালমান, রাস্তায় যা চলে তার কিছুই তাদের হাতে নাই। বন্দর বাজারের যায়গা দেবার মালিক মুছালমান, বন্দরে-বাজারে কিছু বেছার মালিক তারা নয়। ভূতল ও ভূধরের অবস্থান অনুযায়ী মুছালমানদের হাতে যে, কেবল স্ট্রাটেজিক (সামরিক উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত এবং বেশ উপযোগী) অবস্থানগুলোও তাদের হাতে রয়েছে তা নয়, তাদের হাতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমান কাঁচা মাল, আর খলিজ ও দৈহিক সম্পদ যা দিয়ে, যদি তারা ছাচ্ছা মুছালমান হয় এবং বিজাতির হাতের পুতুল না হয়, তবে এক্ষুণি তারা দুনিয়াটা কব্‌জা করতে পারে। আল্লাহর কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে?

আল্লাহ বলেন, 'এবং নিশ্চয় আমি আদম বংশকে সম্মানিত করেছি....।'

১৫ পারা, ১৭ ছুরা বনি-ইছরাইল, ৭০ আয়াতাংশ।

আল্লাহ আরো বলেন, 'এবং আমি নিজে নভোমন্ডল এবং ভূমন্ডলের অন্তর্গত যা আছে তা সমস্তই তোমাদের (জিন-এনছান ও আকাশের মাখলুকের) জন্য আয়ত্তাধীন করে দিয়েছি, নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

২৫ পারা, ৪৫ ছুরা জাসিয়া, ১৩ আয়াত।

www.pathagar.com

উল্লেখিত দু'টি আয়াতের প্রথম আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, আদম বংশকে সম্মানিত করার কথা; এবং দ্বিতীয় আয়াতে ঘোষণা করেছেন, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অন্তর্গত যা আছে তা সমস্তই মানুষের আয়ত্তাধীন করে দিয়ে বলেছেন, এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

তা হলে নভোমন্ডল ভূমন্ডলের অন্তর্গত যা আছে, তা সম্মানিত চিন্তাশীল অথবা চিন্তাশীল সম্মানিত সম্প্রদায়ের জন্য। এখন দেখা যাক, এই চিন্তাশীল সম্মানিতরা নাভোমন্ডল ভূমন্ডলের অন্তর্গত যে, অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে, তার সঙ্গে তারা কতটুকু পরিচিত এবং তাহতে কতটুকু আহরণ করে নিজেদের আবরু-মর্যাদা-সম্মান এই ধরাধামে রক্ষা করে চলছেন? আমার ত মনে হয়, যে অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখবে তাও তাদের হাতে নাই। আল্লাহর দেয়া চোখ, তাও নাকি চোখ না বুজে অনেকের এবাদতই হয় না। অথচ চক্ষুবিশারদেরা বলেন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) মধ্যে চোখের দুনিয়া ৮০ (আশি) শতাংশ। আর বাকী চার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে উনিশ বিশের হারে ২০ (বিশ) শতাংশ।

আমরা সূর্যের আওতাধীন যা আছে তাকে সৌর জগত বলি। এটা মহাকাশের একটা ক্ষুদ্রতমাংশ মাত্র। একে মহাকাশের ব্যাপকতার সাথে তুলনা করলে মানুষের আবিষ্কৃত মহাশক্তিধর দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও মানুষের চোখে ধরা পড়ে কিনা—পূরা সন্দেহ। মহাশূন্যে সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য সূর্যের বিশাল বিশাল নক্ষত্র ও নক্ষত্রমন্ডল বিরাজ করছে। এদের আদি-অন্ত কোথায়, তা আজো কারো কাছে জানা নাই। তুলনামূলক কিছু কিছু, পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তারো পরিধির তুলনা নাই।

আকাশ বিশারদ বলেন— 'আমরা খালি চোখে প্রায় ৬,০০০ (ছয় হাজার) নক্ষত্র দেখি এবং দূরবীনের সাহায্যে প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘূর্ণায়মান। আকাশ মন্ডলীও সমহারে ঘূর্ণায়মান। এমতাবস্থায়, সংখ্যা তত্ত্বের দিক থেকে ৬,০০০ হাজার আর ৫০ কোটি নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বলা দায়। এটাই নিশ্চিত। ১৯৫৭ সালে লেখা ভূগোলেও লেখক নিশ্চিত নয় বলে, উভয় সংখ্যার আগে 'প্রায়' শব্দ ব্যবহার করে দায় সারিয়েছেন।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রক্সিমাসেন্টুরাই নাকি পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র। এর দূরত্ব প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি মাইল। প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতিতে এর আলো পৃথিবীতে আসতে সোয়া চার বছর লাগে এবং ধ্রুবতারা হতে তার আলো পৃথিবীতে আসতে নাকি ৪৭ বছর লাগে। এমন বহু নক্ষত্র রয়েছে সৃষ্টির আদি হতে শুরু করে ঐ গতিতে আজো পৃথিবীতে তাদের আলো এসে পৌঁছায় নাই। এসব ত ১৯৫৭ সালের অর্থাৎ আজ হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত ৪৩ বছর আগের কথা।

আধুনিক কালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের এই সূর্যের বয়স প্রায় ৪৫ (পাঁচচল্লিশ) হাজার কোটি বছর এবং এর বয়স ১০০ (একশ) হাজার কোটি বছর ধরলে আরো ৫৫ হাজার কোটি বছর আছে। এসময় কিন্তু বিতর্কিত। সূর্যও ধ্বংস হবে। পবিত্র কুরআনের কথা।

পৃথিবীর কক্ষ পথের পরিধি এবং সূর্যের কক্ষ পথের পরিধি সমান নয়। যে নক্ষত্রের আলো আজো পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় নাই তার কক্ষ পথ ও পরিধি সূর্য ও পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ বেশি? সুতরাং অনুরূপভাবে তথায় সময়েরও তারতম্য রয়েছে।

আমি এসব উপমা দিচ্ছি, এজন্য যে, রাজা এসব ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের জমিদারী সম্মানী মানুষকে দিয়েছেন। এই জমিদারীর অন্তর্গত কোথায় কি আছে তা ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চালায়ে না দেখলে আয়ত্তাধীন করে রাখবটা কি?

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, বিশ্বজগত ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে।

২৭ পারা, ৫১ ছুরা যারিয়াত ৪৮ আয়াত।

এ আয়াতের ব্যঞ্জনা অনুযায়ী কয়েক বছর আগের তথ্য, আর কয়েক বছর পরের তথ্যের সঠিকত্ব ঠিক থাকবে না। যদি বিশ্বের পরিমান আজ ৫০ লক্ষ কোটি বর্গ মাইল হয় তবে কাল সে পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। কারণ পবিত্র কুরআন বা স্রষ্টার ভাষায় বিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। আর বিশ্ব বলতে যা বুঝি, তাও একটা দুটা নয় - সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য। আর দূরত্ব!

www.pathagar.com

এ দূরত্ব প্রসঙ্গে, শোপলি নামক একজন বিজ্ঞানী ১৯১৭ সালে সূর্য থেকে জ্যোতির্মন্ডলের কেন্দ্রের দূরত্ব ১০ কিলোপার্সেক অর্থাৎ ঃ ২ সংখ্যার পরে ১৭টি শূন্য বসালে যা হয় তাই। নিজ কেন্দ্রের দিকে একবার ঘুরতে জ্যোতির্মন্ডল ও সূর্যের প্রায় ২৫ কোটি বছর সময় লেগে যায়। মহাকাশে এরূপ সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য সূর্য বা নক্ষত্র রয়েছে এবং সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য জ্যোতির্মন্ডলও রয়েছে। কাজেই শোপলি মহাশয় দূরত্বের যে সংখ্যা তথ্য আমাদেরকে জানালেন, তাতে অন্য কিছু বিতর্কিত হলেও, অন্তত আল্লাহর ব্যাপকতার ইঙ্গিত রয়েছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সম্মানিত মানুষকে যে জমিদারী দান করেছেন, তার সীমা কত দূরে তা কি করে এ মানুষ সীমায়িত করবে? যে সব নক্ষত্র সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য কোটি বছর আগে সৃষ্টি হবার পর হতে আজ পর্যন্ত আলো ১,৮৬,০০০ মাইল গতি বেগে চলেও পৃথিবীতে এসে পৌছায় নাই, সে সব নক্ষত্র কত দূরে, কত আলোক বর্ষ দূরে প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতি বেগে ৩২৬ (তিনশ ছাব্বিশ) বছর ছল্লে, এক আলোক বর্ষ ধরে। এই দূরত্ব কি কাগজ কালি-কলম দিয়ে হিসেব করার যোগ্য। যাঁর সৃষ্টির সীমার মধ্যে অসীম, তাঁর ব্যাপকতাও অসীম বিধায় তাঁর দানকৃত ও জমিদারীর সীমা সংখ্যাও অসীম।

আমার জ্ঞান অল্প হলেও (১৫ পারা, ১৭ ছুরা বনিইছরাইল, ৮৫ আয়াত....) মানুষ উড়জাহাজে উড়ে, আমি হাত পায়ে যন্ত্র চালিত বৈদ্যুতিক সেল ফিট করে, গ্রহ হতে গ্রহে বসত স্থাপন করব, ফায়ার প্রুফ লাগায়ে নক্ষত্র হতে নক্ষত্রে গমন, ওয়াটার প্রুফ ফিট করে সাগর হতে মহাসাগরে সঞ্চিত ধন সঞ্চয় করে; পাহাড় পর্বতের কাঁচামাল, উৎপাদন ও আহরণ করে, পাহাড়-পর্বত সমতল ভেদ করে, খনিজ সম্পদ উত্তলন করে, জগতবাসীকে ধনে মানে ধনী করেই হব, খাঁটি জমিদার এবং শোকরিয়া আদায় করব, তাঁর। ইত্যাকারই পবিত্র কালামুল্লায় জ্ঞাপিত মানুষের প্রতি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে তার উপর সম্মান ও আয়ত্তাধীন করার আহ্বানের আভাস দিয়ে গেলাম। তবে আমার প্রাপ্ত জ্ঞান ও অধিকার সসীম বটে; কিন্তু তিনি তাঁর ব্যাপকতার মধ্যে ব্যাপক।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায় ঃ রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য।

রছুলুল্লাহর ব্যাপকতা

পবিত্র কুরআনে রছুলের পরিচয় এভাবে দেয়া হয়েছে— আমি (আল্লাহ) তোমাকে (মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহকে) সমস্ত সৃষ্টি জগতের (নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অন্তর্গত দৃশ্যাদৃশ্য সকল প্রকার জীবের জন্য) রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।

পারা ১৭, ছুরা ২১ আম্বিয়া ১০৭ আয়াত।

আরবীতে উক্ত আয়াতে নবীকে বলা হচ্ছে, "রহমাতুল্লিল আলামিন" অর্থাৎ আলামিনের রহমত। আর আল্লাহ নিজে দাবী করছেন, 'রাব্বুল আলামিন।' এখানে প্রথমে 'রব' ও 'আলামিন' সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা দরকার। আল্লাহর ব্যাপকতা (এ গ্রন্থের ১ম খন্ড, ২য় অধ্যায় আল্লাহর ব্যাপকতা দ্রঃ) আর 'রব'-এর ব্যাপকতার মধ্যে তিন বাহু সমান দুটি ত্রিভূজের মত সর্বসম, — যদি সমতল হয়।

মোহাম্মদ (সঃ) -এর মর্যাদা

যা হউক, আলমের সংখ্যা যাই থাকনা কেন সমস্ত আলমের একমাত্র নবী-রছুল মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ)। আমরা জানি আল্লাহ তাআলা অন্য কোন মহাশক্তির সন্তুষ্টির জন্য নামাজ, রোজা, হজ্জ, জকাত, কলেমা পড়েন না; অথচ তাঁর পেয়ারা নবী মোহাম্মদ (সঃ) এর শানে বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সহ তাঁর ফেরেস্তাকুল নবীর উপর দরুদ পাঠিয়ে থাকেন। হে ইমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি মঙ্গলময় মঙ্গল কামনা পাঠাও এবং শান্তিপ্রদ ছালাম শান্তি জানাও।"

২২ পারা ৩৩ ছুরা আহযাব ৫৬ আয়াত।

আল্লাহর দরবারে বিশ্ব নবীর মান-সম্মান-মর্যাদা কত উর্ধ্বে তা উক্ত আয়াত করিমার অর্থের প্রতি একটু লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায়। যাঁর শানে স্বয়ং আল্লাহ ও ফেরেস্তা সমূহ দরুদ পাঠান, তাঁর মান-মর্যাদার তুলনা বিশ্ব মখলুকাতে কোন সৃষ্টির সঙ্গেই তুলনীয় নয়। এ আয়াতে রছুলুল্লাহ (সঃ)-এর অলৌকিক, অতুলনীয় গৌরব ও

www.pathagar.com

মহিমার বিষয় সুপ্রকাশিত হয়েছে। তিনি এরূপ মহাসম্মানী মহানবী যে, স্বয়ং আল্লাহ ও ফেরেস্তাকুল তার উপর দরুদ পাঠান। এরূপই তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য সর্বব্যাপী। সুতরাং রছুলুল্লাহর ব্যাপকতা সমান স্রষ্টার সৃষ্টির ব্যাপকতার প্রায় সমান।

তিনি কোন পুরুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির বাপ নন, তিনি সর্বশেষ নবী মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন লোকের বাপ নন বরং তিনি আল্লাহর প্রেরিত রছুল এবং নবীগণের শেষ (মহা) নবী এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।" ২২ পারা, ৩৩ ছুরা আহজাব, ৪০ আয়াত। তাঁর একটি মাত্র স্বতন্ত্র্য পরিচয়, আর তা হলো তিনি শেষ মহানবী—কোন সৃষ্টির সঙ্গে কোন বিষয়েই তুলনীয় নয়— তিনি কুল মখলুকাতের মহানবী।

সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বক্ষম, সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে রহমাতুল্লিল আলামিন উপাধিতে ভূষিত করে, মহানবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আরবী 'রহমত' শব্দের দ্বারা স্নেহ, মায়া-মমতা, আদর, অনুগ্রহ, দয়া প্রভৃতি বুঝায়। মূলত তিনি এসব গুণের আধার। তাই তিনি সৃষ্টিকুলে দয়ার সাগর। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত সত্য দ্বীন সম্বন্ধে কার কাছে নতি স্বীকার করেন নাই। তাই দ্বীনের দুশমনেরা তাঁর দাঁত ভেঙ্গেছে। রক্ত ঝরিয়েছে, দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে, এক ঘরে হয়ে অপমানিত হয়েছেন, মানসিক ও দৈহিক কষ্ট ভোগ করেছেন; কিন্তু এই কষ্ট-ক্লান্তি-হয়রানির পরও দয়ার সাগর কোন দিন কাউকে বদ দোয়া বা মনে বা তনে কষ্ট দেন নাই— তিনি যে কুল মখলুকাতের দিন দুনিয়া-আখেরাতের রহমত। তাঁর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, পারিবারিক বৈষয়িক কিংবা ঘোরতর জেহাদের ময়দানে এবং সর্বশেষ মক্কা বিজয়ের দিন ক্ষমার ঘোষণা দ্বারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইতিহাস সুদ্ধ প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কথা-বার্তায়, লেন-দেন, আচার-আচরণে, পবিত্র-কুরআন হাদিসের প্রতি বর্ণে-শব্দে চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে— তাঁর রহমতের দান। তাই তাঁর ব্যাপকতা আল্লাহর সীমার মধ্যে সসীম।

এই রহমতেরাধার মহানবী মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহর অন্য একটি স্বতন্ত্র্য উপাধি— আলামিন। আলমের বহুবচন আলামিন। কিছু আগেও বলেছি। এ গ্রন্থের আল্লাহর ব্যাপকতা পড়লে আমার মনে হয়

www.pathagar.com

আলমের ব্যাপকতার কিছুটা অনুমান করা যাবে। আলমের ব্যাপকতা কত, সংখ্যা কত তা আলমের মালিকই সর্বজ্ঞ। তবে আলমের ব্যাপকতা যাই থাকনা কেন রহমাতুল্লিল আলামিনের ব্যাপকতাও তাঁর ইচ্ছাধীন।

রহমাতুল্লিল আলামিনকে সাধারণত 'রছুলুল্লাহ' বলেও সম্বোধন করা হয়। এনামটিই বেশী বেশী প্রচলিত। পবিত্র বাক্য বা কলেমা তইয়্যেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও এই রছুলুল্লাহ। আরবী 'রাছুলুন' এর অর্থ সংবাদ, বহন, পয়গাম্বরী, কাসেদ প্রভৃতি এবং রিছালাতুন অর্থ পত্র, বাণী, বার্তা, পয়গাম, সংবাদ প্রভৃতি। অন্য কথায় আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বের তিনি ভারপ্রাপ্ত। আহমাদ যিনি সর্বাধিক প্রশংসাকারী, মোহাম্মদ (সঃ) সর্বাধিক প্রশংশিত রছুল কার? —আল্লাহর বান্দার।

যিনি রবের রবুরিয়াত সংক্রান্ত সুষ্ঠু শান্তি ও দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণকর ও অকল্যাণকর আইন কানুনের সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শনের দায়িত্ব প্রাপ্ত তিনিই রছুল। তাঁর রেছালাতও আল্লাহর ব্যাপকতার মধ্যে সসীম-ব্যাপক। আল্লাহর ব্যাপকতার তুলনা নাই। রেছালাতের ব্যাপকতা কিন্তু আল্লাহতাআলার ইচ্ছা ও অনিচ্ছার মধ্যে সীমায়িত।

স্রষ্টা সৃষ্টি করে বৃথা ছেড়ে দেন নাই। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রকাশার্থে সৃষ্টির আদি হতে যুগে যুগে নবী রছুল পাঠিয়েছেন। সর্ব সৃষ্টির সর্ব শেষ সর্বপ্রকার কল্যাণকর সর্বগুণান্বিত সর্বজনীন আদর্শ হিসেবে বিশ্বনবী আল্লাহ রছুলকে পাঠিয়েছেন। তিনি সর্বজনীন উত্তম আদর্শ। তিনি আপন-পর, স্থান-কাল, পাত্র, বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে বিশ্বব্যাপী সর্ব সৃষ্টির একমাত্র আদর্শ। একথাগুলো আল্লাহ তাআলা অতি সংক্ষেপে বলেন, "নিশ্চই তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রছুলই উত্তম আদর্শ— যে আল্লাহর এবং পরকালের আশা করে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে থাকে।"

২১ পারা ৩৩ ছুরা আহজাব ২১ আয়াত।

আল্লাহ রছুলকে বিশ্বজনীন উত্তম আদর্শ দান করেছেন, তার ব্যাপকতাও তিনি নির্দিষ্ট বলে দিয়েছেন, 'এবং আমি (আল্লাহ) তোমাকে (মোহম্মদুর রছুলুল্লাহকে) আমার সৃষ্ট— সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য- অর্থাৎ ঃ আলম সমূহের রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।'

১৭ পারা, ২১ ছুরা আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি মানুষের মত ষষ্ঠ বেনা বা অন্যান্য দৃশ্য-অদৃশ্য নভোমন্ডলে কিংবা ভূমন্ডলের প্রাণীদের কার কাছে দরুদ পাঠান না, কিন্তু তার পেয়ারা হাবিব মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহর প্রতি তিনি এবং ফেরেস্তারা দরুদ-শান্তি ছালাম পাঠান। রছুলুল্লাহকে (সঃ) দেয়া এই একটি মাত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে চিন্তা করলেই বুঝা যায় আল্লাহর প্রেরিত রছুলের শান সর্বসৃষ্টির উর্ধে এবং আল্লাহর কিছুটা নীচে বটে।

পক্ষান্তরে তিনি কোন লোকের বাপ নন— তিনি আল্লাহর রছুল। এ প্রসঙ্গে ২২ পারায় ৩৩ ছুরা আহজাবের ৪০ আয়াতে আল্লাহ দ্বের্থহীন ভাষায় বলছেন, 'মোহাম্মদ (সঃ) কার বাপ নন'। একথাটা তাঁর পালক ছেলে জায়েদকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। পালা পাখির জ্বালা যে কত, যে পাখি পালে সেই অনুভব করতে পারে। আমার কথা হলো মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহর (সঃ) চাইতে বেশী আল্লাহ তক্ত, তাঁর চাইতে বড় ওলী দুনিয়াতে কেউ ছিল বা আছে বলে, যে বিশ্বাস করে তাকে কে, কি বলে আমি জানি না। আমি মনে করি, এধরনের আকিদা-বিশ্বাস যাদের তারা মুমিন কিনা সন্দেহ।

প্রসংগত, যেখানে বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ) কে বা খোশখবর প্রাপ্ত সাহাবা কেরামকে মহব্বত বা ভালবেসে বাবা, মামা ডাকা শরিয়তে কঠোর নিষেধ রয়েছে, সেখানে পথভ্রষ্ট জটাধারী, লেংটা, খবিছ এবং কোন কোন আলেম নামধারী যালেম-ভ্রান্ত পীর, ফকিরকে মহব্বত ও ভালবাসার ছুতা ধরে বাবা, মামা ডাকা কত বড় অন্যায়, তা ভাবতেই অবাক লাগে।

ওহী শব্দের অর্থ ও প্রসঙ্গ

'ওহী' শব্দের অর্থ পবিত্র কুরআনে নাযিলকৃত আয়াতাবলীর ভাবার্থ অনুসারে গ্রহণ করা হয়। সাধারণত ওহী অর্থঃ —ইশারা, গোপন, খবর, বার্তা, পত্রালাপ, কার অন্তরে গোপনে কোন কিছু সৃষ্টি করে দেয়া, কার কাছে পাঠানো পয়গাম, সংবাদ পাঠানো বা ইশারা ও আদেশ করাও হতে পারে।

এ ওহী সর্বপ্রথম বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর মুখ হতে নিঃসৃত হয়ে জিবরাইল আমিন (আঃ) এর মারফত আল-আমিন বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সঃ) এর কাছে নাযিল হয় এবং ওহী যোগে 'ইক্‌রা'— পড় আদেশ

www.pathagar.com

প্রথমে আল্লাহ যিনি 'রব' প্রতিপালক তিনি উচ্চারণ (ধ্বনি) করেছেন; তারপর তিনি তাঁর সংবাদ বাহক জিবরাইল আমিন (আঃ) -কে শিখায়ে বলেছেন, তাঁর প্রিয় হাবিব বিশ্বনবী হযরত (১) মোহাম্মদ (সঃ)-কে তাঁর প্রতিপালকের নাম সহ 'ইক্‌রা' পড়তে—ঐ প্রতিপালক যিনি সব সৃষ্টি করেছেন (২) [যিনি] সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ঘন-রক্ত যোগে। (৩) তুমি পড়, এবং তোমার প্রতিপালক বড়ই দানশীল। (৪) যিনি কলম দ্বারা লিখতে শিখায়েছেন। (৫) তিনি অন্যভাবেও মানুষকে শিখায়েছেন, যা সে জানত না।

৩০ পারা, ৯৬ ছুরা আলাক, ১-৫ আয়াত।

এসব আয়াত হতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, প্রথমে আল্লাহ যিনি 'রব' তিনি পড়া-লেখার বিষয় তাঁর মহাবিজ্ঞানময় জ্ঞান ভাণ্ডার হতে তাঁর জিবরাইল আমিনকে (আঃ) পড়া-লেখার নিয়ম কানুন সহ শিখায়ে বলেছেন— কিভাবে তাঁর হাবিব বিশ্বনবীকে বলতে হবে। তারপর জিবরাইল আমিন (আঃ) বিশ্বনবীকে ঠিক সেভাবে পড়তে শিখান। এবং আল্লাহর পেয়ারা হাবিব বিশ্বনবী তাঁর প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত জিবরাইল আমিন (আঃ) হতে যেভাবে পড়তে শিখেছেন, ঠিক সেভাবে বিশ্বনবী বিশ্ব জগদ্বাসীকে আল্লাহর কালাম শিখায়েছেন। এই কালামুল্লাহর বিষয় আল্লাহর ফেরেস্তা জিবরাইল আমিন (আঃ) সাক্ষী হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, একালাম স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহর। বিশ্বনবী করিম (সঃ) তৃতীয় পক্ষ হয়ে বিশ্বজগদ্বাসীর কাছে সুসংবাদ ও ভয়প্রদর্শক হিসেবে এ 'ওহী' হুবহু আবৃতি করেছেন।

ওহীর উৎস

সুতরাং, ওহীর উৎস স্বয়ং আল্লাহ, জিবরাইল আমিন (আঃ) তার বাহক ও সাক্ষী এবং আল-আমিন বিশ্বনবী তার ব্যবহারিক জীবনে আমল করেছেন এবং তিনি প্রতিপালন প্রচার-প্রতিষ্ঠা-প্রতিরক্ষা করেছেন। আল্লাহ ২৭ পারা, ৫৩ ছুরা নজম, ৩ - ৮ আয়াতে বলেন, (৩) আর তিনি (মোহাম্মদ সঃ) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না। (৪) এটা (কুরআন) আল্লাহর হুকুমমত তাঁর (মোহাম্মদ সঃ) কাছে 'ওহী' যোগে পাঠান হয়। তাই আল্লাহর এ পবিত্র কালাম কোটি কোটি মোমেনের হৃদয়ে ধৃত, ঘরে ঘরে পঠিত এবং ত্রিভুবনে কোটি কোটি আল-কুরআন মজিদের লিখিত রূপ বর্তমান আছে। আল্লাহ এ ওহীর বক্তা, জিবরাইল আমিন (আঃ) সাক্ষী ও শ্রোতা এবং বিশ্বনবী

www.pathagar.com

তার প্রতিপালন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠাতা। কারণ সাক্ষী ছাড়া কোন বিষয় বা ব্যাপারের সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই সম্ভব নয়। তাই জিবরাইল আমিন (আঃ) এ ওহীর সাক্ষী। আর আল্লাহ বলেন, 'বরং তা অবশ্যই গৌরবময় কুরআন। তা লৌহ মাহফুজের (সুরক্ষিত ফলকের) মধ্যে লিখিত আছে।'

৩০ পারা, ৮৫ ছুরা বুরুজ, ২১, ২২ আয়াত।

সারা বিশ্ব জুড়ে যে কুরআন পড়া হয়, তা এ সুরক্ষিত ফলকে লিখিত কুরআনের ফটোকপি। এ পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করে ২৮ পারা, ৫৯ ছুরা হাশরের ২১ আয়াতে বলেন, 'যদি আমি এ কুরআনকে পর্বতের উপর নাযিল করতাম, তবে তুমি (হে মোহাম্মদ) নিশ্চয় তাকে আমি আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ন-বিগলিতভাবে অবনত দেখতে পেতে, এবং এ সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করছি তারা যেন চিন্তা করে ও কুরআনের মর্যাদা বুঝতে পারে।'

ওহী

ওহী শব্দের অর্থ— পবিত্র কুরআনে নাযিলকৃত আয়াতাবলীর ভাবার্থানুসারে গ্রহণ করা হয়। সাধারণত ওহী অর্থ— ইশারা, গোপন, খবর, বার্তা, বাণী, পত্রালাপ, কার অন্তরে গোপনে কোন কিছু সৃষ্টি করে দেয়া, কার কাছে পয়গাম পাঠানো, ইশারা বা আদেশ করাও হতে পারে।

ওহী সর্বপ্রথম বিশ্বস্রষ্টা রাব্বুল আলামিনের মুখ হতে বের হয়ে জিবরাইল আমিনের (আঃ) মারফত আল-আমিন রহমাতুল্লিল আলামিন মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহর (সঃ) কাছে নাযিল হয়।

ওহী যোগে প্রথম আদেশ ইকরা পড়। প্রথমে আল্লাহ যিনি রব ও প্রতিপালক তিনি উচ্চারণ (ধ্বনি) করেছেন; তার পর তিনি তাঁর বার্তা বাহক জিবরাইল আমিনকে (আঃ) শিখায়ে বলেছেন, তাঁর প্রিয় হাবিব বিশ্বনবী মোহাম্মদকে (সঃ) তাঁর প্রতিপালকের নাম সহ পড়তে (ইকরা)ঃ

১। ঐ প্রতি পালক যিনি সৃষ্টি করেছেন

২। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ঘন জমাট রক্ত যোগে

www.pathagar.com

৩। তুমি পড় এবং তোমার প্রতি পালক বড়ই দানশীল

৪। যিনি কলম দ্বারা লেখতে শিখায়েছেন

৫। তিনি অন্যভাবেও শিখায়েছেন যা সে জানতো না।

৩০ পারা ৯৬ ছুরা আলাক ১-৫ আয়াত।

এসব আয়াত হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। প্রথমে আল্লাহ যিনি রব, তিনি লেখা পড়ার নিয়ম কানুন সহ জিবরাইল আমিনকে (আঃ) শিখায়ে বলেছেন, কিভাবে তাঁর হাবিব বিশ্বনবীকে পড়তে হবে। জিবরাইল আমিন (আঃ) ঠিক সে ভাবে নবীকে পড়তে শিখান। এবং আল্লাহর পেয়ারা হাবিব বিশ্বনবী তাঁর প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত জিবরাইল আমিন (আঃ) যে ভাবে পড়তে শিখায়েছেন, ঠিক সে ভাবে বিশ্বনবী বিশ্ববাসীকে আল্লাহর কালাম শিখায়েছেন।

এই কালামুল্লাহর আল্লাহ নিজে বক্তা ও সাক্ষী জিবরাইল আমিন(আঃ) বার্তা বাহক ও সাক্ষী হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, একালাম বা ওহী স্বয়ং আল্লাহর, বিশ্বনবী করিম (সঃ) তৃতীয় সাক্ষী হয়ে বিশ্ববাসীর কাছে সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শক হিসেবে এ ওহী হুবহু আবৃতি করেছেন, মুখস্ত করেছেন, লেখায়েছেন, মুখস্থ করায়েছেন— ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন ও করায়েছেন।

সুতরাং ওহীর উৎস স্বয়ং আল্লাহ, জিবরাইল আমিন (আঃ) ওহী বাহক ও সাক্ষী এবং আল-আমিন বিশ্বনবী ব্যবহারিক জীবনে আমল করেছেন এবং করায়েছেন এবং তিনি প্রতিপালন, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষা করেছেন ও করায়েছেন।

৩। আর তিনি ইচ্ছা মত কোন কথা বলেন না। ৪। এ (কুরআন) আল্লাহর হুকুম মত তাঁর (মোহাম্মদ (সঃ) কাছে ওহী যোগে পাঠান হয়।

২৭ পারা ৫৩ নজম ৩ ও ৪ আয়াত।

আল্লাহর পবিত্র কালাম বা ওহী আল্লাহর সৃষ্ট ত্রিভুবনে কোটি কোটি মোমেনের হৃদয়ে ধৃত, ঘরে ঘরে জনে জনে পঠিত এবং আল কুরআন মজিদের কোটি কোটি লিখিত কপি ত্রিভুবনের সর্বত্র রয়েছে। সাক্ষী ছাড়া সঠিকত্ব বাছাই অসম্ভব। তাই পবিত্র কুরআন বা ওহীর প্রথম সাক্ষী জিবরাইল আমিন (আঃ) এবং দ্বিতীয় স্বাক্ষী আল আমিন মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ) এবং আল্লাহ বলেন, 'বরং তা

www.pathagar.com

অবশ্যই গৌরবময় কুরআন।' যা লউহ মাহফুজের সুরক্ষিত ফলকের মধ্যে লিখিত আছে।

৩০ পারা ৮৫ বুরুজ ২১ ও ২২ আয়াত।

(১ম খন্ড, ৫ম অধ্যায় পবিত্র কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোযেযা দ্রঃ)।

সারা বিশ্ব জুড়ে, যে পবিত্র কুরআন পঠিত হয়, তা এসুরক্ষিত ফলকে লিখিতভাবে রক্ষিত কুরআনের ফটোকপি।

আল্লাহর প্রয়োজনীয় রক্ষা কার্য, ত্রান কার্য ও সংহার কার্যের ব্যাপকতা যতদুর ওহীর ব্যাপকতাও ততটুকু। এই ওহীর গুরুত্ব-ভারিত্ব প্রসঙ্গে পর্বতের সঙ্গে তুলনা করে আল্লাহ বলেন, "যদি আমি এ কুরআনকে (ওহীর সমাহার কুরআন ও হাদিস) পর্বতের ওপর নাযিল করতাম তবে তুমি (মোহাম্মদ সাঃ) নিশ্চয় তাঁকে আমি আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ন বিগলিতভাবে অবনত দেখতে পেতে এবং এসকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করছি। যেন তারা চিন্তা করে এবং কুরআনের মর্যাদা বুঝতে পারে।"

২৮ পারা ৫৯ হাশর ২১ আয়াত।

পবিত্র কুরআন মজিদ যেমন ওহী রূপে বর্তমান তেমনি রছুলুল্লাহর (সঃ) -আদেশ নিষেধ, পছন্দ-অপছন্দ মোযেযা, আমল প্রভৃতিও ওহীর অন্তর্গত হাদিস। ওহীর ও হাদিসের বহু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও হাদিসকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। যা নামাজে তেলাওয়াতের বিধান রয়েছে, তাকে 'ওহীয়ে মাতলু' বা কুরআন বলে ।

২। যা নামাজে পড়া যায় না, তাকে রছুলুল্লাহর হাদিস। এসব হাদিসকে "গায়রে মাতলু" বলে। হাদিসও ওহীর অন্তর্গত। ওহী প্রাপ্ত কুরআন জিন ইনছানের পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান। এতে রয়েছে, শিক্ষানীতি, সমাজ বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি (খেলাফতী), সরকার ও পররাষ্ট্রনীতি, উত্তরাধিকার আইন, ইতিহাস, দর্শন, দ্বীনি বিধান, আধ্যাত্মিক নীতি, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমর ও সামরিক নীতি, অস্ত্র ব্যবহার ও নির্মাণ বিধি, ব্যক্তি ও পারিবিরিক নীতি, পর্বত ও সাগরজয়, আকাশ পাতাল জয়, খনিজ ও উদ্ভিদ পশু-পাখি আগুন-পানি- মাটি বায়ু নিয়ন্ত্রণ করে ভোগ করার

www.pathagar.com

নীতি, দুনিয়া-আখিরাতের সকল সমস্যার শান্তিজনক সুষ্ঠু ও বাস্তব সমাধান। প্রচলিত বিজ্ঞানের সকল শাখা এবং আগত বিজ্ঞানের উৎসও এ কুরআনে বিধৃত রয়েছে। পবিত্র কুরআনে এসবের সমর্থন রয়েছে। চিন্তাশীলদের জন্য কুরআনে সহজ সরল ভাষায় বিশ্লেষিত ও বিবৃত হয়েছে।

এই ওহীর মাধ্যমে আমরা নবী-রছুল, কুরআন-হাদিস, দ্বীন-ইছলাম, আল্লাহ, ফেরেস্তা, কিতাব, মৃত্যুর পর জিন্দা হওয়া প্রভৃতি ইছলামের মৌলিক আহকামগুলো বুঝে, দ্বীন-ইছলাম কবুল ও বিশ্বাস করে ইমান এনে, মোমেন মুছালমান হয়ে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। বিশ্ব নবী মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাছুল, খাতামুন্নাবিয়্যিন— শেষ নাবীর পরিচয় এ ওহী দ্বারা পেয়েছি। ওহী ছাড়া এসব কল্পনাও করা যেত না। ওহী দ্বীন ইছলামের ভিত্তি ও উৎস। ওহী ছাড়া দ্বীন-ইছলাম অর্থহীন।

ওহীর ওজন

বিশ্ব নবীর কাছে যখন ওহী আসত তখন তিনি উটের উপর থাকলে ওহীর গুরুভার সইতে না পেরে উট বসে পড়ত। সাধারণ মানুষ ত এটা চিন্তাও করতে পারে না। সাহাবা কেরামদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী সাহাবা ছিলেন হযরত আলি করমুল্লাহ ওয়াজহু। তাঁর বীরত্ব বদর, খন্দক, অহুদ, খয়বর ইত্যাদি জেহাদে যা দেখায়েছেন তার তুলনা বিরল। খয়বরের জেহাদে একখানা কপাট অত ভারি ছিল যে, ৭০ জনেও নড়াতে পারে নাই। বীর হযরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু একা উঠায়ে নিয়ে তার হাতের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। (আম্বিয়া ১৮ পৃঃ এবং জরকানি ২২৯ পৃঃ)।

একবার এই শক্তিশালী হযরত আলীর (রাঃ) হাঁটুর ওপর রছুলুল্লাহ শুয়ে আছেন, এমন সময় রছুলের উপর ওহী নাযিল হল, তখন হযরত আলি ওহীর ভারে অস্থির হয়ে বলে উঠলেন, যদি পাহাড়ও আমার উপর উঠায়ে দেয়া হত তবু অত ভার মনে হত না। তাহলে যিনি হাজার হাজার ওহীর ভার সহ্য করতেন তাঁর শক্তির পরিমাণ কত? এবং ওহীর ওজন যে কত তা মাপার কিছু নাই।

www.pathagar.com

বিশ্বনবীর দৈহিক শক্তি ও ওজন

হাদিসের কোন কোন রেওয়ায়েতে মোহাম্মদুর রসুলুল্লুর (সঃ) শক্তি ৩০ জন যুবকের মত ছিল, আবার কোন রেওয়ায়েতে ৪০ জন যুবকের মত ছিল। বাহরুল আছরার কেতাবের ৬৫ পৃষ্ঠায় আছে ৪০ জন নবীর সমতুল্য বিশ্বনবীর শক্তি ছিল। হাদিসে আছে প্রত্যেক বেহেস্তি যুবকের গায়ে দুনিয়ার ১০০ যুবকের মত শক্তি হবে।

প্রত্যেক বেহেস্তি যুবক দুনিয়ার ১০০ জন যুবকের মত শক্তি হবে।

দুনিয়ার ১জন = বেহেস্তের ১০০জন।

" ৪০ " = " ৪০ X ১০০= ৪০০০ জন।

রছুলুল্লাহর (সঃ) শক্তি ছিল ৪০০০ যুবকের সামন (তরজুমায়ে কুরআন, শায়খুল হিন্দ, খাচা ৭০ পৃঃ আনো ঃ ১৩৫ পৃঃ মাওয়া, ২৭৫ পৃঃ)

শরিয়তের আইন অনুসারে একজন সুস্থ ও সক্ষম যুবক ৪ জন বিবি রাখতে পারে।

১ জন যুবক রাখতে পারে = ৪ জন বিবি

৪০০০ জন যুবক রাখতে পারে= ৪০০০ X ৪ = ১৬,০০০ হাজার বিবি

অতএব, বিশ্বনবী ১৬,০০০ হাজার বিবি রাখতেও সক্ষম ছিলেন।

কোন কোন একদেশদর্শী লোক বলে থাকে। রছুলুল্লাহ (সঃ) কামুক ছিল (না-আউযুবিল্লাহে মিন জালিকা)। হিসেবে দেখা যায় রছুলুল্লাহ (সঃ) যদি কামুক হতেন তবে তিনি ১৬০০০ বিবি রাখার মত তাঁর দৈহিক শক্তি এবং সক্ষম সমর্থ ছিলেন। তাঁর মাত্র ১১ বিবি এবং হাদিয়া পাওয়া বিবি মারিয়া সহ ১২জন বিবি ছিল।

যুবকরা কুমারী কন্যাই বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মহানবীর জীবনে তারও দৃষ্টান্ত নাই। তিনি যখন ২৫ বছরের পূর্ন যুবক তখন তিনি তদানিন্তন (ভারতে এখনও আজ ২০০০ ইশায়ী সন পর্যন্ত কুমারী অকুমারী নির্বিশেষে বিধবাদের জন্য মোশরেক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানজনক স্থান বিরল এবং আরবের মোশরেক সম্প্রদায়ের মধ্যে

www.pathagar.com

বিধবা নারীই ছিল, দারুন অবহেলিতা) আরবের ৪০ বছর বয়স্কা বিধবা খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) কে বিবাহ করেন। তিনি ৬৫ বছর বয়সে বৃদ্ধা অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর জিবদ্দশায় রছুলুল্লাহ্ অন্য কোন বিয়ে করেন নাই। মহানবী এই বিধবার সংগে ২৫ বছর সংসার জীবন সুখে শান্তিতে কাটান। ইনার ইন্তেকালের সময় মহনবীর বয়স ৫০ বছর।

এই ৫০ বছর বয়সের পর মহানবী একটি মাত্র অবিধবা ৬ বছরের কন্যা আয়েশা ছিদ্দিকাকে (রাঃ) বিবাহ করেন। এতে দেখা যায় আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) ছাড়া বিশ্বনবীর বিবিদের মধ্যে সবাই বৃদ্ধা ও বিধবা ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, অসহায় অবহেলিতা বিধবাকে রছুলুল্লাহ বিয়ে করে তাদের পূনর্বাসন ও ইজ্জত আবরুর আশ্রয় দানই মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কামভাব চরিতার্থের জন্য রছুলুল্লাহ বৃদ্ধা ও বিধবা বিয়ে করা —একজন বিশ্ব সম্রাট ও বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্ব নবীর প্রয়োজন ছিল না। নাবুয়াতির ১০ বছর পর ৫০ বছর বয়সে নবী ছিলেন 'আল আমিন' সকলের বিশ্বস্ত এবং প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী— শ্রেষ্ঠ রছুল। তিনি ইচ্ছা করলে সম্ভোগের জন্য বহু সেরা সেরা সুশ্রী কন্যাও পেতেন। কাজেই, তাঁর বিয়ে নিয়ে যারা সমালোচনা করে থাকেন তাঁরা শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ বশতই শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ করে থাকেন। রছুলুল্লাহ (সঃ) আরবের অন্ধকারাচ্ছন্ন আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময়ে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়ে কল্পনাতীত অল্প সময়ের মধ্যে ৬৬ বা ততোদিক দুর্ধর্ষ জেহাদের মোকাবেলা করেন। কয়েক দেশের রাজ্যভার নিঃসম্বল অবস্থায় গ্রহণ করেন। দোজখ বেহেস্ত, হাশর, কেয়ামত, কবর, আরশ, কুর্চি, সপ্তাকাশ ভ্রমন, আল্লাহর জাত আজমত প্রভৃতির ভয়ঙ্কর বিভৎস ব্যাপারাদি দেখে শুনে ঠিক থাকা, বিরাট নবুয়াতের দায়িত্বভার, যা আছমান জমিন, পাহাড় পর্বত পর্যন্ত বইতে সাহস করে নাই, যা হাজার হাজার সুদক্ষ মানুষ মিলেও নবুয়াতির গুরুভার বহন করতে সাহসী হয় নাই, তা সবই মহানবী মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ(সঃ) সহজেই সমর্থ হয়েছিলেন। এই গুরু ভার অন্য কোন জিন এনছানের উপর ছেড়ে দিলে, সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। অথচ মহানবী অতসব দায়িত্বের ভার সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অটল পর্বতের মত। অতটুকু সাহসচ্যুত হন

www.pathagar.com

নাই। আমরন তাঁর শরীরে বার্ধক্যের কোন আলামত দেখা যায় নাই। অতিবেশী খুসব ব্যবহারের ফলে ১৭-২০ খানা চুল লালছে হয়েছিল— পাকে নাই। তিনি ছিলেন আমরন বীর যুবকের মত শক্তি ধর। তিনি শেষ কালেও যে শক্তি বিরত্ব ও সাহসিকতা দেখায়ে গেছেন. তা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে অতুলনীয়। এমন এক মহানবী, মহাবীরের জন্য ১২/১৩ জন বিধবাকে বিয়ের আশ্রয় দেয়া কামুকতা বা লাম্পট্যপনা নিশ্চয় নয়। আগেই বলেছি রসুলুল্লার দৈহিক শক্তি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে জিন এনছান বা অন্য কোন সৃষ্ট জীব নাই যা নবীর শক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায়। নবী করিম নিজেও ফরমায়েছেন আল্লাহ্ আমাকে চারটি অলৌকিক শক্তি দান করেছেন।

১। দানে অতুলনীয়, ২। বাহাদুরিতে অতুলনীয়, ৩। অধিক সঙ্গমে অতুলনীয় এবং ৪। দৃঢ়ভাবে ধরতে অতুলনীয়।

মহানবী বলেন যখন আমার ছিনা চাক করা হয় তখন উপস্থিত ফেরেস্তাগন আমাকে ওজন করে। ওজনে ১০জন সবল ব্যক্তি অপেক্ষা ভারি হলাম, তারপর ১০০ জন সবল ব্যক্তি অপেক্ষা ভারি হলাম, তারপর ১০০০ জন সবল ব্যক্তি অপেক্ষা ভারি হলাম। তখন ফেরেস্তারা পরস্পর বলাবলি করল। আর দরকার নাই। সমস্ত উম্মতও এক পাল্লায় অন্য পাল্লায় তাঁকে দিলে তিনি ওজনে ভারি হবেন।

রছুলুল্লাহর (সঃ) জমনায় আরবে রোকানা নামে এক মহাশক্তিশালী বীর ছিল। তার শরীর অত শক্ত ও মজবুত ছিল যে, উটের কাঁচা চামড়ার উপর বসায়ে ঐ চামড়া ধরে সাতজন সবল লোকে টানলেও এক চুল পরিমানও সরাতে পারত না। অথচ চামড়া ছিঁড়ে যেত। সে বড় বড় পাথর ছুঁড়ে মারতে পারত এবং বড় বড় গাছও উপড়ে সহজে ফেলতে পারত। তার মত শক্তিধর তৎকালে কেউ ছিল না। রছুলুল্লাহ্ যখন রোকানাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন সে মনে মনে চিন্তা করল যে, আমার মত শক্তিধর বীর দুনিয়াতে নাই। তাই সে শর্ত করল যদি আপনি কুস্তিতে আমার সঙ্গে জিততে পারেন তবে আমি ইছলাম কবুল করব।

মহানবী সন্তুষ্ট হয়ে তার সঙ্গে কুস্তির জন্য সম্মত হলেন। কুস্তিতে রোকানা রছুলুল্লাহকে (সঃ) একচুল পরিমানও হেলাতে পারল না। কিন্তু রছুলুল্লহ রোকানাকে এক হাতে তার কোমর ধরে শূন্যে তুলে

www.pathagar.com

পাখির মতো নাচায়ে ফেলে দিয়ে বুকের উপর বসলেন। রোকানার কথা মত রছুলুল্লাহ (সঃ) তিনবার কুস্তি ধরেন এবং প্রতিবারই অতি সহজে তাকে নীচে ফেলে দেন। এর পর তার ভুল স্বীকার করে ইছলাম কবুল করে এবং সে স্বীকার করল নিশ্চয় মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিশালী। এতে বুঝা যায় যে, রছুলুল্লাহর (সঃ) দেহে কত শক্তি ছিল।

রছুলুল্লাহর (সঃ) ওজন

নবী করিম (সঃ) বলেন আমাকে ছিনাচাক করার সময় উপস্থিত ফেরেস্তাদের এক ফেরেস্তা আমাকে ওজন করলেন। আমি ১০ ব্যক্তি অপেক্ষা ভারী হলাম। তারপর ১০০ ব্যক্তি অপেক্ষা ভারি হলাম। তারপর ১০০০ হাজার ব্যক্তি অপেক্ষা ভারি হলাম। তারপর ফেরেস্তারা একজন অপর জনকে বল্ল আর দরকার নাই, সমস্ত উম্মত এক পাল্লায় অন্য পাল্লায় রছুলকে দিলে, তবুও রছুলুল্লার (সঃ) ওজন বেশী হবে। (মেশকাত মাওয়া: ৩০ পৃঃ ১৫৬পৃঃ হেশাম) যদি ১০০০ লোকের হিসেবে হিসাব করা হয়, তবে রছুলুল্লাহ (সঃ) (৪০০০ হাজার বিবি রাখতে পারতেন। কারণ শরিয়াতে একজনে ৪ জন বিয়ে করতে পারে।

১ জনে বিয়ে করতে পারে = ৪ জন

১০০০ জনে বিয়ে করতে পারে= ৪ X ১০০০ = ৪০০০ জন।

যেহেতু রছুলুল্লার (সঃ) ওজন বা শক্তি ১০০০ হাজার লোকের মত ছিল সেহেতু রছুলুল্লাও (সঃ) ৪ X ১০০০ = ৪০০০ বিবি বিয়ে করতে পারতেন। রছুলুল্লাহ (সঃ) কামুক বা লম্পট ছিলেন না। তিনি জীবকুলের উত্তম আদর্শ হিসেবে একটি মাত্র কুমারী ছাড়া (তাও তাঁর ৫০ বছর বয়সের পর) কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে তিনি কোন কুমারী বিয়ে করেন নাই।

তিনি তাঁর বিবিদের সঙ্গে সমান ভাবে রাত যাপন করতেন। কোন অবস্থাতেই কোন বিবির হক অন্যথা করতেন না। কিন্তু বিবি ছাওদা (রাঃ) বার্দ্ধক্যতা জনিত কারণে সহবাসে অক্ষম হওয়ায় তাঁর পালা বিবি আয়েশাকে (রাঃ) দান করায় বিবি আয়শা ছিদ্দিকার (রাঃ) পালা দ্বিগুণ ছিল। সুতরাং, তিনি কামুক বা লম্পট ছিলেন না। তিনি ছিলেন,

www.pathagar.com

আল্লাহর আদেশ নির্দেশের উপর আমলকারী আল্লাহর প্রেরিত রছুল। তিনি মানব শ্রেষ্ঠ, মানব শিরমনি, মহামানুষ, মহা পুরুষ, মানব মুকুট, মহাঋষি, মহামনীষী, মহামুনি ইত্যাকার কোন নামে খ্যাত কোন লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন, আহমদ মোছতফা মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ-রহমাতুল্লিল আলামিন শেষ মহানবী— নবীদের মধ্যে সেরা বা শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনের সমস্ত জীবের উত্তম আদর্শ।

ওহীর ব্যবহার ও প্রয়োজন

পবিত্র কুরআন মাজিদ যেমন আল্লাহর ওহী তেমনি রছুলুল্লাহর আদেশ -নিষেধ, পছন্দ মোযেযা, আমল প্রভৃতিও 'ওহী'র অন্তর্গত হাদিস। ওহী ও হাদিসের বহু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। ওহীর ব্যবহারিক ক্ষেত্র প্রধানত দু'প্রকারঃ ১। ওহীয়ে মাত্লু, যা নামাজে তেলাওয়াত করার বিধান রয়েছে। অর্থাৎ আল-কুরআন মজিদ।

২। ওহীয়ে গায়রে মাত্লু যা নামাজে পড়ার বিধান নাই। এ সব ওহী হাদিসের অন্তর্গত।

ওহীকৃত কুরআন মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে রয়েছে শিক্ষানীতি, সমাজ নীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সরকার ও পররাষ্ট্রনীতি, উত্তরাধিকার আইন, ইতিহাস, দর্শন, আধ্যাত্মিক নীতি, গবেষণা-পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সামরিক অস্ত্র ব্যবহার ও নির্মাণ করার বিধান, জেহাদ ও দণ্ডবিধি, ব্যক্তি ও পারিবারিক নীতি, পর্বত ও সাগর জয়, আকাশ-পাতাল জয়, খনিজ ও উদ্ভিদ পশুপাখি, আগুন, পানি, মাটি, বায়ু নিয়ন্ত্রণ করে ভোগ করার নীতি। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সমস্যার শান্তি জনক শুষ্ঠু ও বাস্তব সমাধান। চলিত বিজ্ঞানের সকল শাখা এবং ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের উৎসও এই কুরআনে বিধৃত। এসব আমার কল্পনার কথা নয়। পবিত্র কুরআনে এ শবের সমর্থন রয়েছে। চিন্তাশীলদের জন্য কুরআনে সহজ-সরল ভাষায় বিশ্লেষিত রয়েছে।

আদম (আঃ) এর কাছে আল্লাহ যে ইছলাম-নাযিল করেছেন, সে হতে শুরু করে নবী-রছুল পরম্পরা একই ইছলাম রছুলে করিম খাতামুন্নাবিয়্যিন মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহর (সঃ) সময় ইছলামের পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রছুলকে ৬ পারা, ৫ ছুরা

www.pathagar.com

মায়দা, ৩ আয়াতের মধ্যে বলেছেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ন করলাম এবং তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করলাম আমার নেয়ামত এবং তোমাদের ইসলামকে (আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করা) দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"

আদম হতে আজ পর্যন্ত যত দিন-ধর্ম গ্রন্থ নাযিল হয়েছে, তা সবের খাঁটিত্ব ও আসল সত্য সহ এ পবিত্র কুরআন সারাবিশ্বে বর্তমান রয়েছে।

এই ওহীর মাধ্যমে আমরা নবী, কুরআন, হাদিস, দ্বীন-ইছলাম, আল্লাহ, ফেরেস্তা, কেতাব, রছুল, পরকাল, ভাল-মন্দ কপালের লিখন, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া প্রভৃতি ইছলামের মৌলিক আহকামাদি বুঝেছি, দ্বীন ইছলাম কবুল ও বিশ্বাস করে ইমান এনে, মোমেন-মুছালমান হয়ে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত রছুল খাতামুন্নাবিয়্যিন-শেষ নবীর পরিচয় এই 'ওহী' দ্বারা পেয়েছি। ওহী ছাড়া এসব কল্পনাও করা যেত না।

ওহী দ্বীন-ইছলামের ভিত্তি ও উৎস। ওহী ছাড়া দ্বীন ইছলাম অর্থহীন। রছুলুল্লাহকে ছিনেছি, ওহী বা প্রত্যাদেশ দ্বারা কুরআন হাদিস বুঝেছি (ইছলামের আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ) । আগুন, পানি, মাটি ও বায়ুর আনুগত্য করে না, এমন কোন সৃষ্টি স্রষ্টার সৃষ্টিতে নাই। এতে জাত, বেজাত, ঈমান ও বেঈমান বলতে ধরা-বাঁধা নাই। কিন্তু ইছলামের আনুগত্যার্থে ইমান ও বেইমান সংজ্ঞায়িত অবশ্যই আছে এবং থাকবেও চিরকাল।

আনুগত্যের অর্থে— ইছলাম হলো দ্বীন ইছলামের উৎস (জিকরুল্লাহ) ও আত্মসমর্পনের অর্থে— ইছলাম হলো ইমান। ইমানের ঘরবাড়ি ওহী। ওহীর ঘরবাড়ি পবিত্র কুরআন ও হাদিস। কুরআন ও হাদিস হলো (দ্বীন বা কুরআন ও হাদিসের) পূর্ণাঙ্গজীবন বিধান। দ্বীনের বিধান হলো একজন ইমানদার মুছালমানের আল্লাহ ও রছুলের আদেশ-নির্দেশ মত এবাদত-বন্দেগী বা দাস্য বৃত্তি করা এবং একজন ঈমানদার মোমেনের প্রতিটি ব্যবহারিক কাজ-কর্মে, অফিস-আদালতে, কলে-কারখানায় আল্লাহ ও রছুলের আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা এসব স্মরণে রাখার মানি

www.pathagar.com

জিকরুল্লাহ। মোমেনের জিকরুল্লাহ ছাড়া এবাদত নাই, এবং এবাদত ছাড়া জেকের নাই।

মাঠে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে, অফিসে-আদালতে, কলে-কারখানায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও লেখা পড়া প্রভৃতি একজন মুছালমানের এবাদত বা কাজ দুনিয়াবী হলেও, একজন মুমিনের জিকরুল্লাহ ছাড়া এবাদত হয় না। চোখ-মুখ বন্দ করে, হাত-পা গুটিয়ে জেকের করাটার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ নাই- এসব এবাদাত নয়। মোমেনের এবাদত মাত্রই দ্বান্দ্বিক বা হক নাহকের, সত্য মিথ্যার সাংঘর্ষিক। প্রতিটি এবাদাত বন্দেগীতে, কাজে-কর্মে, কথা-বার্তায়, নাহক হতে হকের, মিথ্যা হতে সত্যের আমল করাটাই মোমেনের এবাদত। তাই মোমেনের এবাদত মাত্রই দ্বান্দ্বিক বা সাংঘর্ষিক।

এবাদত ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই করে। তাই জিকরুল্লাহ সহ এবাদত মোমেনের এবং জিকরুল্লাহ ছাড়া এবাদত অমোমেনের।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় ঃ রছুলুল্লাহর (সঃ) সংসার ও কর্মজীবন

বিশ্বের নূর নবীকে প্রেরণের মাধ্যম

আরবের বিখ্যাত কোরেশ বংশের

১। আবদুল মন্নাফ -এর ছেলে

২। হাশিম-এর ছেলে

৩। আবদুল মুতালিব-এর ছেলে

৪। আবদুল্লাহ;

এই আব্দুল্লাহর স্ত্রী আমেনার মাধ্যমে মহানুভব ভুবন বিখ্যাত শিশু আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ নূরনবী রছুলুল্লাহ (সঃ) নিখিল বিশ্বের রহমাতুল্লিল আলামিন— সাত আছমান জমিনের অনু-পরমানু, পশু-পাখি, কীট, পতঙ্গ, জিন-এনছান নির্বিশেষে আল্লাহর সৃষ্ট দৃশ্য-অদৃশ্য বান্দাদের সকলের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ ও মূর্ত আশীর্বাদ-চরম ও পরম আদর্শ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সল্লেল্লাহু আলাইহেছ ছালামের মর্ত্য লোকে প্রেরণ ঘটে।

ইনি ছিলেন মানুষ ও অতি মানুষের মিলিতরূপ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মিলনের যোগসূত্র স্থাপনের সর্বোত্তম আদর্শ ও সোপান এবং সেই মহাবিচার দিনের পুলছেরাতে পারাপারের তরনী।

তিনি হলেন স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ পেয়ারা প্রতিনিধি বা খলিফা।

আল্লাহ সাকার, সৃষ্টিকুলের জন্য নিরাকার। তিনি কার জাত নন। তিনি কাউকেই জন্ম দেন নাই এবং দেন না। তিনি এক। তিনি সর্বক্ষম-স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি সৃষ্টির জন্য নিরাকার। তাঁর সৃষ্টি সাকার-নশ্বর।

কেমন করে অরূপ হতে রূপে, আকার হতে নিরাকারে, এপার হতে ওপারে পৌছা যায়? খেয়াতরীর মাঝির মতন এপার হতে ওপারে পারাপারের জন্য যে এক অলৌকিক বাহনের প্রয়োজন সেই অনুপম বাহনই আমিনার নয়নমনি আনন্দদায়ক নন্দন বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ)।

www.pathagar.com

এ বাহনই হচ্ছে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)। যিনি নিরাকার স্রষ্টা ও সাকার সৃষ্টির মধ্যে মিলন সূত্র..... আহমদ (সঃ)। একদিকে তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি, অপরদিকে তিনিই বান্দার হয়ে বান্দাদের প্রতিনিধি। এক দিকে তিনি আল্লাহর বানী বা ওহী বহন করে এনে সৃষ্টির দরজায় পৌঁছায়ে দেন এবং অপর দিকে সৃষ্টির সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা, অভাব-অভিযোগ-অভিলাষ স্রষ্টার দরবারে পেশ করেন। তাই তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়েরই এত প্রয়োজন।

তিনি কবে, কোন পরিবেশে, কোথায় কিভাবে কেন এই আদি সৃষ্টি চির সুন্দর রূপে এই ধরাধামে আবির্ভূত হবেন। এসব শুভসংবাদ সেই আদি হতে আজ পর্যন্ত এমন কোন নবী-রছুল এবং সত্যাশ্রয়ী মুনি-ঋষি, জ্ঞানী-গুণী, সাধক-ভজক নাই এবং এমন কোন নির্ভেজাল নিষ্কলঙ্ক পবিত্র দ্বীন বা ধর্ম নাই যার মধ্যে তাঁর নাম, স্থান, কাল, পাত্র প্রভৃতি (এ খন্ডের ৮ম অধ্যায় দেখুন) সবিস্তারে তাঁর লক্ষণাবলীর বিবরণ বিঘোষিত হয় নাই।

৫৭০ ইসায়ী সনের ১২ই রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার সোবহেসাদেকের সময়ে (রছুলুল্লাহর (সঃ) এই প্রেরণ তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে— এতদ্দেশীয় ওলামা কেরামদের অধিকাংশের মতে এই তারিখ স্বীকৃত) আরবের বিখ্যাত কোরেশ বংশের হাশেমী গোত্রের আব্দুল্লাহ এবং বনি যোহরা গোত্রের ওহাবের স্বনামধন্যা রূপেগুণে অতুলনীয়া পুণ্যময়ী আমিনার মাধ্যমে মোহাম্মদ (সঃ) —চরম প্রশংসিত, আর আহমদ— চরম প্রশংসাকারী— মোহাম্মদ (সঃ), আহমদ (সঃ) ধরাধামে প্রেরিত হন।

[সোমবারের বৈশিষ্ট্যঃ ১। রছুলুল্লাহর, আবির্ভাব ও তিরোধান, ২। মক্কা হতে মদিনায় হেজরাত, ৩। মদিনায় প্রবেশ, ৪। মেরাজ সফর, ৫। মক্কা বিজয়, ৬। দুনিয়ার স্থলভাগ সৃষ্টি প্রভৃতি অনেক বড় বড় বিষয় সোমবারে ঘটেছে, ৭। সোমবারে নবুয়াত লাভ।]

(দালা ঃ ৯৬ পৃষ্ঠা, মাওয়া ঃ ২৬ পৃষ্ঠা খাছাঃ ২৭০ পৃষ্ঠা)

নূরনবীর দুধ পান

নূরবীর দুধ পান

১। প্রথম ঃ ৭ দিন মায়ের

২। ২য় ঃ ৮ দিন ছারিয়ার

www.pathagar.com

৩। ৩য় ঃ প্রায় ২ বছর মা হালিমার দুধ পান করেছেন। অনেকের মতে দুধ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথা ফোটেছে।

নূরনবীর আব্বা ও আম্মার ইন্তেকাল ও প্রাসঙ্গিক কথা

আম্মার গর্ভে যখন তিনি ২ মাস তখন তাঁর আব্বা আবদুল্লাহ ২৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ৮ বছর বয়স পর্যন্ত দুধ-আম্মা বিবি হালিমার ঘরে লালিত পালিত হন। নূরনবীর ছয় বছর বয়সে মা আমিনা ইন্তেকাল ফরমান। ৭ বছর বয়সে কাবা ঘর মেরামতে সকলের সঙ্গে যোগ দেন এবং নিজ হাতে পাথর বহন করেন। ৮ বছর বয়সে দাদা আব্দুল মুতালিব ইন্তেকাল করেন। ১২ বছর বয়সে চাচা আবুতালেবের সাথে শাম দেশে বাণিজ্যে যাবার পথে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে।

১৪ বছর বয়সে ফুজ্জার যুদ্ধে তৎপর হন এবং হলফুল ফুজুল যুদ্ধে যোগদান করেন। ২৪ বছর বয়সে হযরত আবুবকরের সাথে দ্বিতীয়বার শামদেশে বাণিজ্যে যান। ২৫ বছর বয়সে বিবি খাদিজার মাল নিয়ে তৃতীয় বার শাম দেশে বাণিজ্যে যান। এ বছর শাম দেশ হতে ঘুরে আসার দুই মাস পর ৪০ বছর বয়স্কা বিবি খাদিজার সঙ্গে প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

৩৫ বছর বয়সে কাবা ঘর মেরামতের নেতা হিসেবে সকলের সঙ্গে শরিক হন। তিনি নিজ হাতে হাজরে আছওয়াদ (কাল পাথর) কাবা ঘরের যথাস্থানে স্থাপন করেন। এ বছর পাঁচ বছর বয়সের ছেলে হযরত আলী (রাঃ) কে লালন পালনের জন্য নিজের ঘরে আনেন।

আশৈশব কোনদিন কাউকে গালমন্দ, কটু কথা, ঝগড়াঝাটি, মারামারি, খেলাধূলা, গানবাদ্য, শরাব পান, প্রতিমা বা মূর্তি পূজা করেন নাই। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, সৎ আল-আমিন—বিশ্বাসী; সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, সদাচার করেছেন। কার মনে কষ্ট পায় এমন কোন কথা বলেন নাই। বকরি পালন, ব্যবসা করা, অনেক সময়ে নিকটস্থ হিরা পর্বত গুহায় ধ্যান করাই ছিল তাঁর অভ্যাস।

এভাবে ৪০ বছর পর্যন্ত ধ্যান করার পর ৪০ বছর ১ দিন বয়সে ৮ই রবিউল আউয়াল সোমবার হিরা পর্বত গুহায় নবুয়াত প্রাপ্ত হন।

www.pathagar.com

ঐদিন হতেই তাঁর উপর পবিত্র কুরআন নাজিল শুরু হয়। নবুয়াত লাভের ৬ মাস পূর্ব হতে সত্য স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

রছুলুল্লাহর (সঃ) ছিনাচাক

অর্থ ঃ রিপুর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য জনিত কলুষতা, পাপ-পঙ্কিলতা এবং শয়তানের অংশটুকু অপারেশন করে কেটে ফেলে দেয়া। বিশ্বনবী রচয়িতা মরহুম কবি গোলাম মোস্তফা 'ছিনাচাকের' বাংলা অর্থ করেছেন "বক্ষ-বিদারন" ইংরেজিতে 'হার্ট অপারেশন' বলা হয়।

রছুলুল্লাহর (সঃ) মোট ৪ বার 'ছিনাচাক'

প্রথমবার ছিনাচাক ঃ

'৪ বছর বয়সে যখন তিনি দুধ ভাই আবদুল্লাহর সাথে জঙ্গলে বকরি চরাতে যান তখন সাদা পোষাক পরিহিত দু'জন ফেরেস্তা তাঁকে চিত করে শোয়ায়ে, বেহোঁশ করে, তাঁর ছিনাচাক করা হয়। তারপর হৃদয় হতে ছেলে বেলার চঞ্চলতা, দুষ্টুমি ও যত প্রকার কুভাব আসতে পারে তা সব সোনার তস্তরিতে (দুনিয়ার মত সোনার তস্তরি নয়) রেখে জমজমের (কিছুদিন আগে বিভিন্ন খবরের কাগজে দেখা গেছে অমুছলিম বিশারদেরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ঘোষণা করেছেন, "জমজমের পানির মত অত নির্মল, বিশুদ্ধ পানি দুনিয়ার কোথাও নাই) পানি দ্বারা হৃৎপিন্ড হতে সমস্ত খারাপ ভাব ধুয়ে পরিষ্কার করে পবিত্র নুর ঢুকায়ে শিলাই করে যথাস্থানে রেখেছেন। তাই রছুলুল্লাহ (সঃ) ছোটবেলা হতেই কোন প্রকার কলুষিত, কলঙ্কিত, দুষিত, কটু কথা, অসংযত ব্যবহার কার সাথে করেন নাই। ছোট বেলার দুষ্টুমি জনিত অপরাধ হতে নবীকে মুক্ত রাখার জন্য এ ছিনাচাক করা হয়।

দ্বিতীয় বার ছিনাচাক ঃ

১০ বছর বয়সে যৌবনের প্রাক্কালে খোলা মাঠে ছিনাচাক করা হয়। যৌবনের উন্মাদনায় কাম-রিপুর তাড়নায় ভ্রষ্টামি হতে বিশ্ব নবীকে রক্ষা করার জন্য ফেরেস্তাগণ তাঁর ছিনা ফাড়িয়ে ভেতর হতে কামরিপুর কলুষতা ও দুষিত বীজানুগুলো ধুয়ে ছাফ করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় বার ছিনাচাক ঃ

৪০ বছর বয়সে হেরা পর্বত গুহায় রমজান মাসে কিংবা রবিউল আউয়াল মাসে রহমাতুল্লিল আলামিন মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহর কাছে জিব্‌রাইল (আঃ) মারফত প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে (এ গ্রন্থের ৩য় অধ্যায় ওহী দ্রষ্টব্য)। ওহী অত্যন্ত ভারি। তীব্র শীতের সময়ও রছুলুল্লাহর কাছে ওহী আসলে তাঁর শরীর ঘামে ভিজে যেত। ওহীর অতুলনীয় ভার সহ্য করার উপযোগী শারীরিক ও মানসিক সহনশীলতার জন্য রাব্বুল আলামিনের আদেশে ফেরেস্তাগণ তাঁর ছিনাচাক করে হৃদয় হতে মানবিক দুর্বলতা জনিত অক্ষমতা ধুয়ে মুছে দূর করে ফেলে দিয়ে সর্বশক্তিমান মাবুদের দেয়া অলৌকিক শক্তি ঢুকায়ে শেলাই করে দেন।

৪র্থ বার ছিনাচাক ঃ

৫১/৫২ বছর বয়সে জমজম কূপের পানিতে অজু করে রছুলুল্লাহর (সঃ) সপ্তাকাশে বা মেরাজে (সপ্ত আকাশ মানি সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য আকাশ বুঝতে হবে) ভ্রমনের প্রাক্কালে ৪র্থ বার তাঁর ছিনাচাক (Heart operation) করা হয়। সেখানে রয়েছে, আরশ, কুরছি, বেহেস্ত, দোজখ, বিরাট, বিকট অতি ভয়ঙ্কর, বিভৎসকান্ড কারখানা দেখে যাতে করে রছুলুল্লাহ ভয় না পান সে জন্য আল্লাহর আদেশে ফেরেস্তাগণ তাঁর বুক চিরে হৃদয় হতে মানবীয় দুর্বলতা ও অক্ষমতা সমূহ ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক শক্তি ও সাহস ঢুকায়ে দিয়ে শেলাই করেছেন (নশঃ ২৬ পৃঃ, খাজেনঃ হেশাম ১৫৪ পৃঃ)

বিঃদ্রঃ আজকাল ডাক্তারগণ যেরূপ (Operation theatre) -এ অস্ত্রোপচারাগারে অস্ত্র দ্বারা রোগীর বুক, পেট, হৃৎপিণ্ড ও দেহের অন্যান্য স্থান কেটে চিরে ভেতরের রোগ বীজানু, দুষিত বা ভাঙ্গাচুরা কলকব্‌জা, দুষিত নাড়ীভূড়ি ফেলে শেলাই করে দিয়ে, রোগীকে সুস্থ সবলদেহী করে তোলে সেরূপই রছুলুল্লাহকে (সঃ) ফেরেস্তারা ছিনাচাক করে ওহী সহনশীল করে তুলেছিলেন।

www.pathagar.com

বিশ্ব নবীর বিবিগণ

প্রথম বিবাহ ঃ- বিধবা খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) পিতা খোয়াইলাদের সঙ্গে তাঁর বিয়ের সময় বয়স ছিল ৪০ বছর এবং রছুলুল্লাহ্ (সঃ) এর বয়স ছিল ২৫ বছর। খাদিজাতুল কুবরা ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল ফরমান (ইন্নালিল্লাহি .....)। তিনি বেঁচে থাকতে আল্লাহর প্রেরিত রছুল (সঃ) অন্য কোন বিবাহ করেন নাই।

দ্বিতীয় বিবাহ - বিবি ছওদা (রাঃ)। পিতার নাম - জময়হ;

তৃতীয় বিবাহ - বিবি আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ)। পিতার নাম - আবুবকর;

চতুর্থ বিবাহ - বিবি হাফছা (রাঃ)। পিতার নাম - ওমর;

পঞ্চম বিবাহ - বিবি জয়নাব (রাঃ)। ৩য় হিজরি। পিতার নাম - খোজায়মাহ;

ষষ্ঠ বিবাহ - বিবি উম্মে ছালমা (রাঃ)। ৪র্থ হিজরি, পিতার নাম - আবি উমাইয়াহ

সপ্তম বিবাহ - বিবি জয়নব (রা)। ৫ম হিজরি, পিতার নাম - জাহাশ;

অষ্টম বিবাহ - বিবি খোয়াই বিয়া (রাঃ)। ৫ম হিজরি, পিতার নাম - হারেস;

নবম বিবাহ - বিবি উম্মে হাবিবা (রাঃ)। ৭ম হিজরি, পিতার নাম - আবু সুফিয়ান;

দশম বিবাহ - বিবি সুফিয়া (রাঃ)। ৭ম হজরি, পিতার নাম - হোয়াই;

একাদশ বিবাহ - বিবি মাইমুনা (রাঃ)। ৭ম হিজরি, পিতার নাম - হারেশ;

দ্বাদশ বিবাহ - (হাদিয়া স্বরূপ) মারিয়া (রাঃ)। ৭ম হিজরি

সর্বশেষ দ্বাদশ বিবি মারিয়া (রাঃ) কে অনেকেই হাদিয়া হিসেবে গণ্য করেন। যেহেতু তিনি দাসী ছিলেন এবং রছুলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে হাদিয়া হিসেবে পেয়েছিলেন। বিবি মারিয়ার গর্ভে রছুলুল্লাহর (সঃ) ইবরহীম নামে এক সন্তান ছিল। সুতরাং রছুলুল্লাহর (সঃ) মোট ১২ (বার) বিয়ে। তারমধ্যে একজন কুমারী, একজন বিধবা বৃদ্ধা দাসী হাদিয়া প্রাপ্তা এবং অবশিষ্ট ১০ (দশ) বিধবা ছিলেন।

www.pathagar.com

১। খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) ও ২। বিবি জয়নব (রাঃ) রছুলুল্লাহর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল ফরমান। রছুলুল্লাহর (সঃ) সংসার ত্যাগের পর প্রথম বিবি খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) ও বিবি জয়নব (রাঃ) ছাড়া হাদিয়া প্রাপ্ত বিবি মারিয়া সহ ১০ (দশ) জন জীবিত ছিলেন। কোন কোন কিতাবে শামউনের মেয়ে রায়হানা রাঃ সহ তের জন বিবি দেখায়েছেন।

বিশ্ব নবীর ছেলে-মেয়ে

ছেলেঃ-

১। কাশেম,

২। তৈয়াব,

৩। তাহের। তাঁদের মা খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) এবং তৈয়াব ও তাহেরকে আব্দুল্লাহ ডাকত। এনারা দুজন নন।

৪। ইবরহীম, ইনার মা হাদিয়াপ্রাপ্তা মারিয়া (রাঃ) (বিশ্বনবী পরিচয় ১৪২ পৃঃ দ্রঃ)

মেয়েঃ-

১। জয়নব,

২। উম্মে কুলসুম,

৩। রুকাইয়া,

৪। ফাতিমা, ইনাদের মা খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)।

খাদিজাতুল কোবরার (রাঃ) সংসারে মোট ৩/৪ ছেলে এবং ৪ মেয়ে।

হাদিয়া প্রাপ্তা বিবি মারিয়ার সংসারে ইবরহীম নামক মাত্র এক ছেলে।

রছুলুল্লাহর মোট চার ছেলে এবং চার মেয়ে। এনাদের মধ্যে ফাতেমা (রাঃ) ছাড়া আর সবাই রছুলুল্লাহর (সঃ) জীবদ্দশায় এন্তেকাল ফরমায়েছেন।

হাবশে হিজরত

নবুয়াতের প্রথম ৩ বছর গোপনে পবিত্র কালিমার দাওয়াত দেন। তারপর প্রকাশ্যভাবে দ্বীনের দাওয়াতি কাজ শুরু করেন। এরি মধ্যে

www.pathagar.com

বহু লোক দ্বীন ইছলাম কবুল করে ইমান আনেন। দ্বীন-ইছলামের দ্রুত প্রসার দেখে বিধর্মীরা নওমুছলিমদের উপর ভীষণ নির্যাতন ও উৎপীড়ন শুরু করে দেয়।

নবুয়াতের ৫ম বছর ১৬ জন নওমুসলিমকে হাবশে হিজরত করার আদেশ দেন। পরে রছুলের (সঃ) আদেশে ১০১ জন নওমুছলিম হাবশে হিজরত করেন।

নবুয়াতের ৬ষ্ট সনে হজরত হামজা ও হজরত ওমর ইছলাম কবুল করেন।

নবুয়াতের ৭ম সনে চাঁদকে দু'ভাগ করেন। নবুয়াতের ১০ম সনে চাচা আবু তালেব ইন্তিকাল করেন। তার ৩ দিন পর, বিবাহের ২৫ বছর পর, বিবি খাদিজা (রাঃ) ৬৫ বছর বয়সে এন্তেকাল ফরমান। তারপর বিবি ছওদাকে (রাঃ) বিয়ে করেন। শাওয়াল মাসে ৬ বছর বয়সের আয়শা ছিদ্দিকাকে বিবাহ করেন। নবুয়াতের ১১শ সনে মহররম মাসে রছুলুল্লাহ (সঃ) তায়েফে হিজরত করেন। তায়েফ বাসীর অসহ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১ মাস পরই ফিরে আসেন।

তায়েফ হতে ফেরার পথে জিন সম্প্রদায় রছুলুল্লাহর হাতে ইছলাম গ্রহণ করেন।

নবুয়াতের ১২শ সনে ৫২ বছর বয়সে ২৭শে রজব রাত্রিতে রছুলুল্লাহ (সঃ) সশরীরে মেরাজে গমন করেন। রছুলুল্লাহর মেরাজে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়।

নবুয়াতের ১৩শ সনে সাহাবাগণকে মদিনায় হিজরত করার আদেশ দেন। পরে তিনি ঐ বছরই ৫৩ বছর বয়সে সোমবার হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং আমের ইব্‌নি ফাহিরা (রাঃ) সহ মদিনার দিকে হিজরত করেন। ৮ই রবিউল আউয়াল সোমবারে মদিনার নিকটে কোবায় হাজির হন। এখানে একটি মছজিদ তৈয়ার করেন। সেখান হতে ৪ দিন পর শুক্রবারে মদিনায় হাজির হন। এখানে বনি ছালেম মহল্লার ১০০ জন সাহাবি সহ জুমআর নামাজ পড়েন। এটা প্রথম জুমা নামাজ।

রছুলুল্লাহ (সঃ) মনিদায় বনি নাজ্জা কাউমের পাশে বাড়ি তৈয়ার করেন। এখানে একটি মছজিদ তৈয়ার করেন। এ মছজিদই বিশ্ব বিখ্যাত মছজিদে নববী এবং এবছর হতে হিজরী সন শুরু হয়।

www.pathagar.com

হিজরি সনের বিশেষ বিশেষ দিক

১ম হিজরি ঃ

জুমআ ফরজ হয়; আজান দেবার ব্যবস্থা হয়; ৯ বছর বয়স্কা আয়েশা সিদ্দিকার সঙ্গে শাওয়াল মাসে রছুলুল্লাহর প্রথম মিলন হয়। ৬ মাস পর রমজান মাসে কাফেরদের সঙ্গে জেহাদের হুকুম হয়, ৩টি ছারিয়া জেহাদ হয়। যে জেহাদে রছুলুল্লাহ (সঃ) নিজে উপস্থিত না হয়ে সাহাবাগণকে পাঠাতেন তাকে "ছারিয়া" জেহাদ বলে এবং যে জেহাদে রছুলুল্লাহ (সঃ) নিজে জেহাদে অংশগ্রহণ করতেন তাকে 'গাজওয়া' জেহাদ বলে।

২য় হিজরি ঃ

৫টি গাজওয়া জেহাদ হয় ঃ ১। এবওয়া, ২। বোয়াত, ৩। বদর-কোবরা, ৪। বনি কাইনকায়, ৫। ছবিক এবং ৩টি ছারিয়া জেহাদ হয়। এ বছর মোট ৮টি জেহাদ হয়। এ বছর জাকাত, রোজা, ঈদ, ফেতরা ও কোরবানির হুকুম হয় এবং সাবান মাসে কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়ার হুকুম হয়। হযরত আলি করমুল্লাহর (রাঃ) সঙ্গে হযরত ফাতেমার (রাঃ) বিবাহ হয়। কন্যা রোকেয়া ইন্তিকাল ফরমান।

৩য় হিজরি ঃ

৩টি গাজওয়া জেহাদ ঃ ১। গাতফাল, ২। ওহুদ, ৩। হামরাওয়াল আছাদ এবং ২টি ছারিয়া সহ মোট ৫টি জেহাদ হয়। এ বছর হযরত হামজা (রাঃ) ওহুদের জেহাদে শহীদ হন। রছুলুল্লাহ (সঃ) বিবি হাফছা ও জয়নাবকে বিবাহ করেন। মেয়ে উম্মে কুলছুমকে হযরত ওছমান গনির (রাঃ) সঙ্গে বিবাহ দেন। মেয়ে ফাতেমার ঘরে নাতি হযরত হাছানের জন্ম হয়। মিরাছ (ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের বিধান এবং কেছাছের বিধান নাযিল হয়)।

৪র্থ হিজরি ঃ

২টি গাজওয়া ঃ ১। বনি নাজির, ২। বদরে ছোগরা; ৪টি ছারিয়া সহ মোট ৬টি জেহাদ সংঘটিত হয়। রছুলুল্লাহ (সঃ) উম্মে ছালমাকে বিবাহ করেন। মেয়ে ফাতেমার ঘরে নাতি হোছাইনের জন্ম হয়। সরাব হারাম হয়।

www.pathagar.com

৫ম হিজরি ঃ

৫টি গাজওয়া ঃ ১। জাতর রকা, ২। দাওমাতুল জন্দুল, ৩। বনি মোস্তালেক, ৪। খন্দক, ৫। বনিকোরাইজা এবং ১টি ছারিয়া সহ মোট ৬টি জেহাদ সংঘঠিত হয়। রছুলুল্লাহ বিবি জয়নব ও জোয়াইবিয়াকে বিবাহ করেন। পর্দা, অজু, তায়াম্মম করার হুকুম হয়। রছুলুল্লাহ (সঃ) ঘোড়া হতে পড়ে পায়ে গুরুতর আঘাত লাগার কারণে তিনি ৫দিন যাবৎ বসে নামাজ পড়েন।

৬ষ্ঠ হিজরি ঃ

৩টি গাজওয়া ঃ ১। বনিলেহ্ইয়ান, ২। গারা, ৩। হোদায়বিয়া এবং ১১টি ছারিয়া সহ মোট ১৪টি জেহাদ সংঘটিত হয়। রছুলুল্লাহ (সঃ) ওমরা করতে মক্কা রওয়ানা হন। ঐতিহাসিক হোদায়বিয়ার ছোলেহ করেন। ইছলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে। ছুরা ফাত্হ নাযিল হয়। রছুলুল্লাহর (সঃ) দোয়ায় প্রচুর বৃষ্টি হয়। শীলমোহর দেয়ার জন্য রূপার আংটি হাতে দেন। দুনিয়ার বিভিন্ন বাদশাহদেরকে ইছলামের দাওয়াত দেন। ২৮ পারা, ৬৫ ছুরা তালাক নাজিল হয়।

৭ম হিজরি ঃ

৩টি গাজওয়া ঃ ১। খায়বর, ২। ওয়াদিয়ে কোরা, ৩। জাতর রব। ৫টি ছারিয়া সহ মোট ৮টি জেহাদ সংঘটিত হয়। রছুলুল্লাহ (সঃ) উম্মে হাবিবা,সুফিয়া ও মায়মুনাকে বিবাহ করেন এবং মারিয়া নামক এক দাসীকে হাদিয়া স্বরূপ পান। রছুলুল্লাহ (সঃ) মোট ১২ বিয়ে করেন। ২ বিবি তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। ১০ বিবি রেখে তিনি ওফাত ফরমান। এ বছরই নাজ্জাশি বাদশা মোছালমান হন। এক ইহুদী নারী রছুলুল্লাহকে (সঃ) খাদ্যের সঙ্গে বিষ খাওয়ান। গাধা, হিংস্র পশু পাখির মাংস হারাম হয়। রছুলুল্লাহ (সঃ) কাবায় কাজা ওমরাহ পালন করেন।

৮ম হিজরি ঃ

৪টি গাজওয়া ঃ ১। মুতা, ২। ফতেহ মক্কা, ৩। হোনায়েন, ৪। তায়েফ। ১০টি ছারিয়া সহ মোট ১৪টি জেহাদ সংঘটিত হয়। রছুলুল্লাহ (সঃ) কাবাঘর তোয়াফ করেন। কাবাঘরকে মূর্তি ও

www.pathagar.com

অপবিত্রতা হতে পবিত্র করেন। মছজিদে মিম্বর তৈয়ার করেন। সুদ হারাম হয়। খালেদ, আবুছুফিয়ান প্রমুখ বড় বড় নেতা মুছালমান হন। পুত্র ইবরাহিমের জন্ম হয়। মেয়ে জয়নব ইন্তেকাল ফরমান।

৯ম হিজরি ঃ

১টি গাজওয়া ঃ ১। তাবুক। ৩টি ছারিয়াসহ মোট ৪টি জেহাদ সংঘটিত হয়। লোক দলে দলে ইছলাম গ্রহণ করতে থাকে। মূর্তিঘরগুলো ভাঙ্গা হয়। মেয়ে উম্মে কুলছুমের ইন্তেকাল হয়। হযরত আবুবকরকে (রাঃ) বহু সাহাবা সহ হজ্জে পাঠিয়ে দেন। জেরার (বিরুদ্ধ) মছজিদগুলো ধ্বংস করেন। কোন কারণে বিবিদের নিকট একমাস যাবত না খাওয়ার কছম করেন।

১০ম হিজরি ঃ

২টি ছারিয়া জেহাদ হয়। ছেলে ইবরাহিমের এন্তেকাল। হাজার হাজার সাহাবা নিয়ে রছুলুল্লাহ (সঃ) নিজে হজ্জে যান। এটি তাঁর শেষ হজ্জ। তিনি সারা জীবনে ফরজ হজ্জ একবারই করেছেন। হজ্জের ময়দানে ইছলামের গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ের উপর খুদবা দেন। যা বিদায় হজ্জের বাণী নামে প্রসিদ্ধ।

১১দশ হিজরি ঃ

১টি ছারিয়া যা রছুলুল্লাহর (সঃ) আদেশে হযরত আবুবকর (রাঃ) সুসম্পন্ন করেন। মোট ৭১টি জেহাদ করেন। ২৬টি গাজওয়া। ছারিয়া ৪৫টি। কার কার মতে আরো বেশি জেহাদ সংঘটিত হয়েছে। আবার কার মতে ৬৬টি জেহাদ সংঘটিত হয়।

এবছরই ২৮শে ছফর বুধবার রছুলুল্লাহর (সঃ) মাথা ব্যথা সহ জ্বর হয়। এই জ্বর ক্রমশ বাড়তে থাকে। এ সময়ে রছুলুল্লাহর (সঃ) স্থলে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ইমামতি করে ১৭ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। ১৩ কি ১৪ দিন জ্বর থাকার পর চাঁদের বছর হিসেবে ৬৩ বছর ৫ দিন বয়সে (ইংরেজী ৬৩২ ইসায়ী সন ১৮ই জুন) ১২ই রবিউ আউয়াল সোমবার প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলামিন ইহলোক ত্যাগ করে আল্লাহর দিদার লাভের জন্য পরলোক গমন করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। পরদিন

www.pathagar.com

মঙ্গলবার দিবাগত রাত হযরত আয়েশা সিদ্দিকার হুজরায় যেখানে তিনি ওফাত ফরমায়েছেন সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

সল্লেল্লাহু আলা খাইরে খালকিহি মোহাম্মদিউঁ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি, ওয়া আজওয়াজিহি, ওয়া আহলে বাইতিহি আজমাইন। এয়া নবী ছালামু আলাইকা, এয়া রছুল ছালামু আলাইকা।

প্রথম হিজরি হতে একাদশ হিজরি পর্যন্ত কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

প্রথম হিজরি ঃ

১। জুমআ নামাজ ফরজ হয়।

২। আজান দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

৩। আয়েশার (রাঃ) সাথে প্রথম মিলন।

৪। দুশমন কাফেরদের সাথে জেহাদের হুকুম হয়।

৫। ৩টি ছারিয়া জেহাদ (রছুলুল্লাহ ছাড়া সাহাবাদের দ্বারা পরিচালিত জেহাদ।

দ্বিতীয় হিজরি ঃ

১। ৩টি ছারিয়া খন্ড জেহাদ হয়।

২। ৫টি গাজওয়া জেহাদ সহ ৮ টি জেহাদ হয় (যে জেহাদে রছুলুল্লাহ (সঃ) নিজে যোগদান করতেন তাকে গাজওয়া বলে)।

গাজওয়া ঃ ক। এবওয়া, খ। বোয়াত, গ। বদরে কোবরা, ঘ। বনিকাইনকায়, ঙ। ছবিক।

৩। জাকাত ফরজ হয়।

৪। রোজা ফরজ হয়।

৫। ঈদ ওয়াজিব হয়।

৬। ফিৎরা ওয়াজিব হয়।

৭। কোরবাণী ওয়াজিব হয়।

৮। সাবান মাসে কাবার দিকে নামাজ পড়ার হুকুম হয়।

৯। হযরত আলি করমুল্লাহ (রাঃ)-র সাথে ফাতিমা (রাঃ)-র বিয়ে হয়।

১০। রছুলুল্লাহর (সঃ) মেয়ে রুকাইয়ার এন্তেকাল হয়।

www.pathagar.com

তৃতীয় হিজরি ঃ

১। ২টি ছারিয়া জেহাদ হয়।

২। ৩টি গাজওয়া জেহাদ হয়। যথা- ক) গাতফান, খ) ওহুদ, গ) হামরাওল আছাদ।

৩। হুজুরে পাক (সঃ) -এর ২টি বিয়ে হয়।।

ক) জয়নাব (রাঃ),

খ) উম্মে হাফছা (রাঃ)

৪। সাহাবা ওসমান গণি (রাঃ)-র সঙ্গে হুজুরের মেয়ে কুলসুমের বিয়ে হয়।

৫। হাছান (রাঃ)-র জন্ম হয়।

৬। মিরাছ (ওয়ারিছদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের নিয়ম)।

৭। কেছাছ এর হুকুম (দন্ড বা শাস্তির বিধান) হয়।

চতুর্থ হিজরি ঃ

১। ৪টি ছারিয়া জেহাদ হয়।

২। ২টি গাজওয়া জেহাদ হয়। ক) বনি নাজির, খ। বদরে ছোগরা।

৩। হযরত হোসাইনের (রাঃ) জন্ম হয়।

৫। সরাব (মদ) হারাম হয়।

৬। হুজুর (সঃ) -এর সাথে ছালমা (রাঃ)-র বিয়ে হয়।

পঞ্চম হিজরি ঃ

১। ১টি ছারিয়া জেহাদ হয়।

২। ৫টি গাজওয়া জেহাদ হয়

মোট ৬টি জেহাদ।

যথা ঃ

ক। জাতর রকা;

খ। দাওমাতুল জন্দুল

গ। বনি মাস্তালেক

ঘ। খন্দক ও, ঙ। বনি কোরাজা।

৩। হুজুর (সঃ) ক। বিবি জয়নাবকে বিয়ে করেন।

খ। বিবি জোয়াই বিয়াকে (রাঃ) বিয়ে করেন।

www.pathagar.com

৪। পর্দার হুকুম হয়।

৫। অজুর হুকুম হয়।

৬। তায়াম্মমের হুকুম হয়।

৭। হুজুর (সাঃ) ঘোড়া হতে পড়ে পায়ে কঠিন আঘাত পান। ৫দিন বসে নামাজ পড়েন।

৬ষ্ঠ হিজরি ঃ

১। ১১টি ছারিয়া জেহাদ হয়।

২। ৩টি গাজওয়া জেহাদ হয়। যথা ঃ- ক) বনি লেহইয়ান, খ) গাবা, গ) হোদায় বিয়া।

৩। হুজুর (সঃ) ওমরা করার জন্য মক্কা রওয়ানা হন।

৪। ঐতিহাসিক হোদায়বিয়ার সন্ধি হয়।

৫। ছুরা ফাত্হ নাযেল হয়।

৬। হুজুরে পাক (সঃ) -এর দোয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

৭। শীলমোহর দেয়ার জন্য রূপার আংটি পরেন।

৮। বিভিন্ন বাদশাদের কাছে ইছলামের দাওয়াত দেন।

৯। ২৮ পারা, ৬৫ ছুরা তালাক নাযেল হয়।

সপ্তম হিজরি ঃ

১। ৫টি ছারিয়া জেহাদ হয়।

২। ৩টি গাজওয়া জেহাদ হয়। যথা ঃ ক) খয়বর, খ) ওয়াদিয়ে কোরা, গ) জাতর রব।

৩। হুজুর (সঃ) চারটি বিয়ে করেন -

ক) উম্মে হাবিবা (রাঃ)

খ) সুফিয়া (রাঃ)

গ) মায়মুনা (রাঃ)

ঘ) মারিয়া দাসী হিসেবে হাদিয়া পান।

অষ্টম হিজরি ঃ

১। ১০টি ছারিয়া জেহাদ হয়েছে।

২। ৪টি গাজওয়া জেহাদ হয়েছে যথা ঃ ক) মুতা, খ) ফতেহ মক্কা, গ) হোনায়েন, ঘ) তায়েফ।

www.pathagar.com

৩। হুজুর পাক (সাঃ) কাবাঘর তোওয়াফ করেন।
৪। কাবাঘর হতে মূর্তি ও অপবিত্রতা দূর করেন।
৫। মছজিদে মিম্বার তৈয়ার করেন।
৬। সুদ হারাম করা হয়।
৭। খালেদ, আর-ছফিয়ান প্রমুখ বড় বড় নেতা মুছালমান হন।
৮। হুজুরের ছেলে ইবরাহিমের জন্ম হয়।
৯। হুজুরের মেয়ে জয়নবের মৃত্যু হয়।

নবম হিজরি ঃ

১। ৩টি ছারিয়া জেহাদ হয়েছে।
২। ১টি গাজওয়া জেহাদ হয়েছে। যথা ঃ তাবুক।
৩। দলে দলে মুছালমান হয়।
৪। হুজুর পাকের (সাঃ) মেয়ে উম্মে কুলছুমের মৃত্যু।
৫। হযরত আবু বকর সহ বহু সাহাবাকে হজে পাঠান।
৬। মূর্তি ঘর ভাঙ্গা হয়।
৭। জেরার (বিরুদ্ধে) মছজিদ ভাঙ্গা হয়।
৮। বিবিদের নিকট কোন কারণে এক মাস যাবৎ না খাওয়ার কছম করেন।

দশম হিজরি ঃ

১। ২টি ছারিয়া জেহাদ হয়।
২। হুজুরে পাকের (সঃ) ছেলে ইবরাহিমের ওফাত।
৩। হাজার হাজার সাহাবা নিয়ে রছুলুল্লাহ তাঁর জীবনে একটি মাত্র হজ্জ পালন করেন।
৪। তিনি একটি হজ্জ করেছেন।
৫। তাঁর শেষ হজের ময়দানে গুরুত্ব পূর্ন ভাষন দেন যা বিদায় হজ্জের বানী নামে প্রসিদ্ধ।

একাদশ হিজরি ঃ

১। ১টি ছারিয়া জেহাদ হয়। হুজুরে পাকের (সঃ) হুকুমে হযরত আবুবকর (রাঃ) এ জেহাদ পরিচালনা ও সুসম্পন্ন করেন।

মোট ঃ

www.pathagar.com

মোট ছারিয়া ও গাজওয়া হয় ৭১টি। তার মধ্যে গাজওয়া = ২৬

ছারিয়া= ৪৫

মোট= ৭১টি

(কার কার মতে ৬৬টি জেহাদ করেন)।

এ বছর ২৮শে ছফর বুধবার হতে হুজুরে পাকের (সাঃ) মাথা ব্যথা ও জ্বর শুরু হয় এবং ক্রমে বৃদ্ধি হতে থাকে। ফলে হযরত আবুবকরের (রাঃ) ইমামতিতে হুজুরে পাক ১৭ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন।

১৩/১৪ দিন জ্বর থাকার পর আরবী বা চান্দ্র মাসের হিসেবে ৬৩ বছর ৫দিন এবং ইংরেজী বছর হিসেবে ৬১ বছর ১৫ দিন বয়সে ৬৩২ ইসায়ী ১৮ই জুন মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারে প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় রছুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়া ত্যাগ করেন (ইন্নানিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন)।

মঙ্গল বার দিবাগত রাত হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) হুজুরায় যেখানে হুজুর ইহ ধাম ত্যাগ করেন, সেখানে রছুলুল্লাহকে (সঃ) দাফন করেন। এয়া নবী ছালামু আলাইকা, এয়া রছুল ছালামু আলাইকা, এয়া হাবিব ছালামু আলাইকা। ছালাওয়া তুল্লাহ আলাইকা।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় ঃ আল-কুরআনের শাশ্বত বৈশিষ্ট্য

কুরআন সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারনা

পাশ্চাত্যে (এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন কোন মহল) ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে আগাগোড়া ভুল ধারণা বিদ্যমান। সত্যি বলতে কি, ইসলাম ও কুরআন-সম্পর্কিত এহেন ভুল ধারণার মধ্যেই বেশির ভাগ আধুনিক শিক্ষিত মানুষের বেড়ে ওঠা, গড়ে ওঠা এবং এমন কি বসবাস পর্যন্ত সম্পন্ন হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের কথা বলতে গেলে নিজের কথাই বলতে হয়। আমি (ডঃ মরিস বুকাইলি) আমার জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেছি অনুরূপ ভুল ধারণার মধ্যে। ইছলাম সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিত মহলে ভুল ধারণা যে কি রকম, সে সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতা থেকে দু'একটা উদাহরণ তুলে ধরছি।

লেখাপড়া শিখে আমি যখন বড় হচ্ছিলাম, তখনকার কথা। গোড়া থেকেই আমাকে সবদিক দিয়ে একটা কথা শেখান হচ্ছিল যে, কুরআন হচ্ছে 'মেহোমেটের' রচিত একখানি 'পুস্তক'। 'মেহোমেট' অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) যে কুরআনের লেখক বা রচয়িতা, সেই কথাটা আমি কুরআনের এক ফরাসী অনুবাদের ভূমিকাতেও দেখেছি। শুধু তাই নয়, আমার শিক্ষাজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বারে-বারেই যে কথাটা আমার মনে গেঁথে দেয়ার প্রয়াস চলেছে, তা হল, কুরআনের লেখক (অর্থাৎ 'মেহোমেট') কুরআন রচনা করেছেন— আগাগোড়া বাইবেল নকল করেই। তবে সেই নকলের বেলায় তিনি কিছুটা ভিন্ন ধারা অবলম্বন করেছেন। যেমন, বাইবেলে বর্ণিত বিভিন্ন 'পবিত্র কাহিনী' সংকলনের বেলায় তিনি কোন কোন অনুচ্ছেদ কাটছাঁট করেছেন; কোন কোন স্থানে কিছুটা যোগ-সংযোগও করেছেন এবং তার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়েছেন— যে ধর্মের তিনি প্রচারক বলে দাবি করেছেন—সেই ইসলাম ধর্মের কিছু রীতি-নিয়ম আর কিছু নীতি-আদর্শের কথা!

আজকের এই যুগেও ফ্রান্সসহ পাশ্চাত্য জগতে' (এবং প্রাচ্যের আধুনিক শিক্ষিত মহলে) 'ইছলামবিশারদ' হিসাবে খ্যাতিসম্পন্ন এক ধরনের 'পণ্ডিত' ব্যক্তি রয়েছেন। পেশায় এঁরা বেশির ভাগই শিক্ষক। এঁরা প্রায় সবাই 'কুরআন'ও 'মেহোমেট' সম্পর্কে কম-বেশি—উপরে

www.pathagar.com

যেভাবে বলেছি, তদনুরূপ ধারণাই পোষণ করেন। তবে, তাঁদের মধ্যে কারো কারো প্রকাশভঙ্গি কিছুটা শালীন, কৌশলপূর্ণ ও সূক্ষ্ম।

কুরআনের 'মূল সূত্র' সম্পর্কে এই যে প্রচারণা—যা শিক্ষা প্রদানের নাম করে প্রচার করা হয়ে থাকে, তা কিন্তু আসল সত্যের ধারে-কাছেরও কিছু নয়! তবুও কুরআন সম্পর্কে এই অসত্য শিক্ষা কখনো সরাসরি, আবার কখনো সুকৌশলে সর্বত্র প্রচার করা হচ্ছে। আর এই ধরনের শিক্ষায় 'শিক্ষিত' হয়ে যারা 'বড়' হচ্ছেন, তাঁরা যে দেশের বা যে ধর্মেরই হোন না কেন, তাঁরা ধরেই নিচ্ছেন যে, বিজ্ঞান-সম্পর্কিত বিষয়ে বাইবেলে যে ধরনের ভুলের গোনজায়েশ রয়েছে, কুরআনও তা থেকে মুক্ত নয়।

আসলে কুরআন সম্পর্কে যে সব 'শিক্ষা' ও 'প্রচার' সর্বত্র চালু রয়েছে, তাতে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সেই প্রচারণায় অনুপ্রাণিত যে-কারো পক্ষে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো খুবই স্বাভাবিক। অথচ কে তাঁদের বুঝাবে যে, তাঁদের সেই সিদ্ধান্তটি তো বটেই, —সেই সিদ্ধান্তের মূলে কার্যকর যে শিক্ষা ও প্রচারণা— তাও আগাগোড়া অসত্য, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

কুরআনের সঠিকত্ব

মোহাম্মদের (দঃ) বয়স তখন ৪০ বছর। তিনি সে সময়ে প্রায়শঃ মক্কানগরীর বাইরে এক নির্জন স্থানে (হেরা পর্বতের গুহায়) গমন করতেন এবং সাধনায় নিমগ্ন হতেন। এই স্থানেই তিনি একদা ফেরেস্তা জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে লাভ করেন ওহী তথা আল্লাহ্‌র বাণী বা প্রত্যাদেশ। সময়টা হচ্ছে, ৬১০ খ্রিস্টাব্দ। কিছুদিন নীরবতার পর আবারও এই ওহী বা প্রত্যাদেশ আসা শুরু হয় এবং এভাবে একটানা দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে মোহাম্মদ (দঃ) যে সব প্রত্যাদেশ লাভ করেন, সেই সব প্রত্যাদেশের সমষ্টিই হচ্ছে কুরআন।

মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই নাযেলকৃত ওইসব ওহী বা প্রত্যাদেশ সাহাবী-সঙ্গী-সাথীদের সহায়তায় দু'ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এক. লিখিতভাবে, দুই. মুখস্থ করে। মোহাম্মদের (দঃ) জীবদ্দশাতেই ওইসব ওহী বা প্রত্যাদেশ বিভিন্ন সূরা বা অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয় এবং ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর ওইসব লিখিত

www.pathagar.com

সূরা কেতাবের আকারে একত্রিত করা হয়। যেহেতু মোহাম্মদের (দঃ) জীবদ্দশাতেই তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কুরআন লিখিত ও মুখস্থ উভয় প্রকারে সংরক্ষিত হয়েছিল, যেহেতু কেতাব হিসেবে সঙ্কলনের বেলায় কুরআনের প্রত্যেকটি সূরার ও প্রতিটি আয়াত বা বাণীর সঠিকত্ব নির্ধারণে মোহাম্মদের (দঃ) সময়কালের লিপি এবং তাঁর সাহাবী-সঙ্গীদের মুখস্থ-জ্ঞান —এই উভয় ধারাই কাজে লাগান হয়েছিল এবং যেহেতু সেই প্রথম যুগের সংরক্ষিত কুরআনের সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত কুরআনের বিন্দুমাত্র গরমিল নাই, সেহেতু নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, কুরআন এমন এক আসমানী কেতাব যা আগাগোড়া মানুষের হস্তক্ষেপমুক্ত।

[কুরআনের কোন সূরায় কিংবা আয়াতে এমন কি কোন-একটা হরফেও যে মানুষের কোন হস্তক্ষেপ পড়ে নাই, তার ভুরিভুরি প্রমাণ বিদ্যমান। নীচে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল। এটি গ্রন্থকারের রচনাঃ]

তাছাড়া, পবিত্র কুরআনের ভাষা, অন্য কোন জাতি গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা ব্যক্তির ভাষা নয়-এটা আল্লাহ কর্তৃক দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তির জন্য মনোনিত আমলের এক মাত্র উত্তম আদর্শ।

কুরআনের ভাষা আরবী বটে, কিন্তু সৌদী আরব, মিশর বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোন অঞ্চলের বা আরববাসীর মুখের ভাষা নয় এবং এসব অঞ্চলে বা অন্য কোন দেশে কুরআনের ভাষায় কেহ কথা বলেনা।

পবিত্র কুরআনের ভাষা আল্লাহ তালার নিজস্ব ভাষা। তিনি তাঁর নিজস্ব অলংকার ভাব-ভঙ্গি, ঢং, ব্যঞ্জনা, বানান, বিন্যাস ও ওজস্বিতা দিয়ে পবিত্র কুরআনকে লোহ মাহফুজের সুরক্ষিত ফলকে লেখায়ে রেখেছেন। এই পবিত্র কুরআনের হুবহু ফটোকপি তাঁর খাছ বান্দাদের দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তির জন্য স্মরণ ও এবাদতের একমাত্র উত্তম আদর্শ হিসেবে স্ব স্ব তওফিক অনুসারে আমলের জন্য মুখস্থ ও লিখিত কুরআন রেখেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষা কুরআনে। পবিত্র কুরআন মোমেনদের আমল-আখলাকে পরিস্ফুট।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআন গদ্য-পদ্য মিত্র বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বই নয়— লোভেল, নাটক, উপন্যাসও নয় এবং অন্য কোন শাস্ত্রও নয়— এসবই পবিত্র কুরআনের অনন্য মোযেযা এবং মক্কা, মদিনা বা অন্য কোথাও কেউ কুরআনের ভাষায় কথা বলে না— এটাও পবিত্র কুরআনের সংখ্যা তাত্ত্বিক মোযেযা (গ্রন্থকার)]

কুরআন ও বিজ্ঞান-

৬১০ থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কুরআন মোহাম্মদের (দঃ) উপরে নাজিল হয়েছিল ওহীর মাধ্যমে। সেই সময়কালে শুধু প্রাচ্যে নয়, পাশ্চাত্যেও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিরাজ করছিল অজ্ঞানতার এক নিদারুণ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো জ্বালাবার পথেও ছিল হাজারটা প্রতিবন্ধকতা। সময়ের উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্সের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ফ্রান্সে তখন রাজত্ব করছিলেন রাজা ডগোবার্টে-মেরোভিঙ্গায়ান বংশের শেষ নরপতি।

আজ কুরআনের বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বক্তব্য সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষিতমহলে যে ধারণা গড়ে উঠেছে, উপস্থিত ক্ষেত্রে অনেকের নিকট তা 'অযৌক্তিক' বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সেই সময়কালের প্রেক্ষাপট বিচার-বিবেচনা করে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁদের ওই ধারণা শুধু অমূলক নয়, অবান্তরও বটে। তদুপরি, কুরআনের বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিভিন্ন বক্তব্য সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি-ভঙ্গিতে আধুনিক তথ্য-জ্ঞানের সহায়তায় বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটাও পরিষ্কার-ভাবে ধরা পড়ে যে, কুরআন সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিত মহলের ওইসব তথা-কথিত ধারণার অবস্থান আসল সত্য থেকে বহু দূরে। পরবর্তী পর্যালোচনায় বিষয়টি আরো বিশদভাবে ফুটে উঠবে।

কুরআনের বিজ্ঞান-সম্পর্কিত কোন বক্তব্য যখন আধুনিক জ্ঞান-গবেষণার নিরিখে সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং একই সংগে বাইবেলের বা অন্য কোন ধর্মের ধর্মগ্রন্থের অনুরূপ কোন বক্তব্য বিজ্ঞানের অনুরূপ কষ্টিপাথরে অগ্রহণযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হয়, তখন আধুনিক শিক্ষিত মানুষমাত্রই এক ধরনের মর্মবেদনায় ভুগতে শুরু করে দেন। তখন তাঁরা তড়িঘড়ি এই মর্মে জওয়াব দিয়ে বসেন যে, বাইবেলের বা অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থের অনেক পরে কুরআন রচিত এবং

www.pathagar.com

সেই মুদ্দতে আরব বিজ্ঞানীরা গবেষণা ও বিজ্ঞানে বহু উন্নতি সাধন করেছিলেন। ফলে, কুরআনের বক্তব্য বৈজ্ঞানিক সত্যের অত কাছাকাছি হতে পেরেছে, ইত্যাদি।

অথচ এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওইসব শিক্ষিত ব্যক্তি বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস একেবারেই ভুলে যান। সত্য বটে, মহান ইছলামী সভ্যতার আমলে মুছলিম বিজ্ঞানীরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, আবিষ্কারে ও গবেষণায় প্রভূত উৎকর্ষ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা আরো বেশি সত্য যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুছলিম মনীষীদের সেই তরক্কী সাধিত হয়েছিল কুরআন নাজিল হওয়ার শতাব্দী কয়েক পরে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের আরও জানাচ্ছে যে, আমরা আমাদের এই পুস্তকে মানুষের আদি উৎস-সম্পর্কিত যে বিষয়টি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করেছি, অন্য ধর্মের ধর্মীয়গ্রন্থের সময়কাল থেকে তো বটেই, এমন কি বাইবেলের আমল থেকে শুরু করে কুরআন নাজিলের সময়কাল অবধি ওই বিষয়ে আদৌ জ্ঞান-বিজ্ঞানের তেমন কোন গবেষণা কিংবা আবিষ্কার সাধিত বা সম্পাদিত হয় নাই।

কোন কোন শিক্ষিত মহলকে আরো একটা কথা বলে বিষয়টা এড়িয়ে যেতে দেখা যায়। কথাটা হল, কুরআনের বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বাণী ও বক্তব্য সম্পর্কে আজ যে সব কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে কুরআনের কোন অনুবাদকর্মে কিংবা টীকা-ভাষ্যমূলক গ্রন্থে সেগুলি উল্লেখ নাই কেন? এমন কি কুরআনের আধুনিক যে সব অনুবাদ, তফসীর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ সেগুলিতেও এসবের কোন ইঙ্গিত-ইশারা তো দেখা যায় না। এর জওয়াব কোথায়?

অস্বীকার করার উপায় নাই যে, আধুনিক শিক্ষিত মহলের এসব বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের নিকট এ ধরনের যুক্তি গুরুত্বপ্রাপ্তিরও হকদার। কুরআনের ফরাসী অনুবাদকর্মের কথাই ধরা যাক। অমুছলিম কোন পণ্ডিতের বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ কোন মুছলিম ভাষাবিদ-কর্তৃক সম্পাদিত কুরআনের ফরাসী অনুবাদেও বিজ্ঞান-সম্পর্কিত তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন টীকা-ভাষ্য, মন্তব্য কিংবা পর্যালোচনা অনুপস্থিত। (অপরাপর ভাষার অনুবাদকর্মেও এ কথা

www.pathagar.com

খাটে।) কারণ আর কিছুই নয়, মুছলিম-অমুছলিম নির্বিশেষে ওইসব অনুবাদক ও ভাষ্যকার মূলত বিজ্ঞ-বিদগ্ধ ভাষাবিদ পণ্ডিত (কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কে বলতে গেলে অনবহিত)। তাই দেখা যায়, কুরআনের যে সব অনুচ্ছেদ বা অধ্যায়ে বিজ্ঞানের বিষয় বিদ্যমান বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে সবের অনুবাদ হয় ভ্রান্তিপূর্ণ; নতুবা সে সবের ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর। সত্যি কথা বলতে কি, কুরআনের মত বিজ্ঞানময় একটি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের জন্য যা অত্যাবশ্যক, তা হল, আরবী ভাষার সুগভীর জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞানের সব কয়টি শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অনুবাদককে সর্বাগ্রে বুঝে নিতে হবে যে, কুরআনের মূল আরবীতে সঠিক কোন্ বক্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে; তারপর আসবে অন্য ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সেই বক্তব্যের যথাযথ রূপান্তর ও পরিস্ফুটনের প্রশ্ন।

কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত বা অনুচ্ছেদের ভুল তরজমা ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আরো একটি কারণ বিদ্যমান। সে কারণটি হল, আধুনিক অনুবাদক কর্তৃক আদিযুগের অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারদের অন্ধ-অনুসরণ। প্রচলিত ঐতিহ্যের ধারায় প্রাচীন যুগের অনুবাদক ও তফসীরকারদের টীকা-টিপ্পনী, মন্তব্য, বক্তব্য ও বিশ্লেষণকে প্রায় ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত, অলঙ্ঘনীয় ও অপ্রতিরোধ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রাচীন যুগের ওইসব তর্জমাকারী ও তফসীরকারদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মনীষার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হয যে, তাঁরা আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা ও আবিষ্কার থেকে বহু দূরে অবস্থান করতেন। সেই প্রাচীন যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আবিষ্কার ও গবেষণা ছিল একেবারেই অভাবিত। ফলে, আধুনিক যুগের শিক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও চর্চা মানবজাতিকে যা কিছু উপহার দিয়েছে, তার আলোকে সে যুগে বসে কুরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত কোন বাণী বা বক্তব্যের অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ধার আক্ষরিক অর্থেই ছিল অকল্পনীয়। সে কারণে সে যুগের অনুবাদে ও ব্যাখ্যায় কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক মূল শব্দের সঠিক অর্থ ও যথাযথ তাৎপর্য অনধিগত থাকাটা অস্বাভাবিক ছিল না মোটেও। আর এতসব কারণে কুরআনের

www.pathagar.com

প্রাচীন ও আধুনিক অনুবাদ ও তফসীরসমূহ পুরোপুরি ভুল তরজমা ও অযথার্থ ব্যাখ্যা না হলেও কোন কোন বিষয়ে ও ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর অনুবাদ ও অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হিসাবে চালু রয়েছে।

বিভ্রান্তির এই বেড়াজাল থেকে কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক বাণী ও বক্তব্যকে মুক্ত করতে চাইলে অনুবাদককে মূল আরবী ভাষায় কুরআন বুঝবার মত ভাষাজ্ঞান ও পারদর্শিতা যেমন অর্জন করতে হবে; তেমনি তাঁকে একই সঙ্গে হতে হবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সবিশেষ বিজ্ঞ ও যথার্থ অভিজ্ঞ।

মোহাম্মাদ (দঃ) যদি নিজেই কুরআন রচনা করে থাকেন (যে অভিযোগ ভিত্তিহীনভাবে এখনো অনেকে করতে চান), তাহলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন না উঠে পারে না যে, সে যুগে বসে বাইবেল নকল করে কুরআন রচনা করতে গিয়ে কিভাবে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রত্যেকটি ভুলত্রুটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সনাক্ত করলেন ও বাদ দিতে পারলেন? শুধু কি তাই? একই সঙ্গে নিরক্ষর মোহাম্মাদ (দঃ) সে যুগে বসে কিভাবেই বা অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণা ও আবিষ্কারের সাথে একান্ত সঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য রচনা করে নিয়ে বেছে বেছে সে সব স্থানে বসাতে পারলেন?

কুরআন ঃ সংকলন ঃ সংরক্ষণ

বর্তমানে প্রচলিত বাইবেল যে প্রাচীনকালের আদি ও অকৃত্রিম তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলের অভিন্নরূপের সংকলন, সে কথা বলার উপায় নাই। পক্ষান্তরে, কুরআন প্রথম যুগের সেই প্রত্যাদিষ্ট বাণী, উপরে যা বলা হয়েছে সেই পদ্ধতিতেই তা আগাগোড়া সংরক্ষিত রয়েছে। আরবী ভাষায় অবতীর্ণ সেই বাণীই এখন বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে নানা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। কিন্তু মূল বাণী তার আদি ও অকৃত্রিম রূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে, পবিত্র কুরআনে। কুরআনের এই নির্ভেজাল অকৃত্রিমত্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এ যুগের এই কুরআন যে সেই আদি অকৃত্রিম মূল কুরআন, তার সংকলনের ইতিহাস থেকেও তা অনুধাবন করা যেতে পারে। যেমনঃ-

প্রথমত, ইতপূর্বেই দেখান হয়েছে যে, মোহাম্মদের (দঃ) জীবদ্দশাতেই কুরআনের ছুরাসমূহ লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করে ধরে

www.pathagar.com

রাখা হয়েছিল। সে সময়ে কাগজের প্রচলন তেমন ছিল না। ফলে, অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওহী লেখকদের মাধ্যমে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, নরম পাথরের টুকরায়, চামড়ায়, হাড়ে ও সে সময়ে প্রচলিত অন্যান্য উপকরণে। বিভিন্ন আয়াতে ও কুরআনকে স্পষ্ট ভাষায় 'লিখিত কিতাব', 'উন্মুক্ত গ্রন্থ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তা উল্লেখ করা হয়েছে হিজরতের আগে ও পরের অবতীর্ণ বিভিন্ন সুরায়। উল্লেখ্য যে, ৬২২ সালে মোহাম্মদের (দঃ) মক্কা থেকে মদীনা গমনের ঘটনা 'হিজরত' নামে পরিচিত। (মানুষের আদি উৎস, মূলঃ ডঃ মরিস বুকাইলি, অনুবাদ - আখতার-উল-আলম)

কুরআনের আসলত্ব, কিভাবে তা লেখা হয়

কুরআনের আসল হওয়া সম্পর্কে কোন মতবিরোধ না থাকায় বিভিন্ন ওহীর গ্রন্থের মধ্যে এ গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট একক স্থান আছে। এ বৈশিষ্ট্য নিউ টেস্টামেন্টেও নেই, ওল্ড টেস্টামেন্টেও নেই। কুরআনের ক্ষেত্রে কিন্তু তার কিছু ঘটেনি; কারণ কুরআন মোহাম্মদের (সঃ) আমলেই লিখে ফেলা হয়েছিল। কিভাবে লেখা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রক্রিয়া কি ছিল, একটু পরেই তা আমরা বর্ণনা করব।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুরআনের সঙ্গে বাইবেলের যে পার্থক্য আছে, তা কোন মতেই মূলত এ দুটি গ্রন্থের নাযিল হওয়ার তারিখের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কিছু লোক এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন বটে, কিন্তু ইহুদী-খৃষ্ট গ্রন্থ এবং কুরআন যখন লেখা হয়েছিল, তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি তাঁরা বিবেচনায় আনেন না; এবং নবীর উপরে কুরআন নাযিল হওয়ার পরিবেশ-পরিস্থিতিও তাঁরা বিবেচনা করেন না। তাঁরা বলে থাকেন যে, পনের শত বছরের পুরোনা গ্রন্থের তুলনায় সপ্তম শতাব্দীর একখানি গ্রন্থের বিনা রদবদলে আমাদের সময় পর্যন্ত চলে আসার সম্ভাবনাই বেশী। সে কথা ঠিক, কিন্তু কারণ হিসেবে এটা যথেষ্ট নয়। ইহুদী-খৃষ্ট গ্রন্থে যে রদবদল হয়েছে, তার অজুহাত হিসেবেই এ কথা বলা হয়ে থাকে; কিন্তু মানুষের দ্বারা কুরআনের এবারতের রদবদল হওয়ার যে আদৌ কোন আশংকা ছিল না সে সত্যের স্বীকৃতি এ কথায় নেই।

ওল্ড টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু বহু লেখক একই কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং কতিপয় গ্রন্থ যেহেতু খৃষ্টপূর্ব আমল থেকে বহুবার

www.pathagar.com

সংশোধিত হয়েছে, সেহেতু ভুল ও স্ববিরোধিতার ঠিক অতগুলি কারণ ঘটেছে। আর নিউ টেস্টামেন্ট অর্থাৎ গসপেলের ক্ষেত্রে কেউই দাবী করতে পারেন না যে, এ গ্রন্থে যিশুর বাণী বা তাঁর কাজের বিবরণ সঠিক ও বাস্তব সম্মতভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। তাছাড়া আমরা আগেই দেখেছি যে, বিভিন্ন সময়ে এবারতের যে সকল পাঠ একটির পর একটি প্রস্তুত করা হয়েছে তার কোন একটিও আসল ছিল না এবং ঐ সকল পাঠের লেখকগণের একজনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না।

এ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কুরআন হচ্ছে লিখিত ওহীর গ্রন্থ, আর হাদীস হচ্ছে মোহাম্মদের (সঃ) কথা ও কাজের বিবরণের সংকলন। নবীর ইন্তেকালের পরই তাঁর কয়েকজন সঙ্গী ঐ বিবরণ লিখতে শুরু করেন। কিছু বিবরণ আরও পরেও লেখা হয়েছে। অবশ্যি কিছু বিবরণ নবীর জীবদ্দশাই তিনি নিজে ও তাঁর সাহাবাগণও লিখেছেন। শ্রুতি বা স্মৃতির ক্ষেত্রে মানুষ মাত্রেরই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণে এ জাতীয় সকল রচনা কঠোর সমালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে হাদীস যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে বাইবেলের বিবরণের মত বিভিন্ন হাদীসের আসল হওয়ার ব্যাপারেও কমবেশী হওয়ার অবকাশ আছে। তবুও উল্লেখযোগ্য যে, বাইবেলের কোন বিবরণই যিশুর আমলে লেখা হয়নি; অনেক পরে লেখা হয়েছে। হাদীসও মোহাম্মদের (সঃ) জীবিত কালে সংকলিত হয়নি; তবে তার অব্যবহিত পরেই সংকলনের কাজ শুরু হয়েছে।

কুরআনের ক্ষেত্রে অবশ্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কোন ওহীর নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী ও তাঁর সঙ্গীগণ তা মুখস্ত করে ফেলতেন এবং তাঁর অনুসারী ও নিযুক্ত লেখকগণ তা লিখে ফেলতেন। সুতরাং, কুরআনের শুরুই হয়েছে দুটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে— মুখস্থ করা ও লিখে ফেলা এবং এ দুটিই হচ্ছে আসল হওয়ার প্রমাণ। বাইবেলের ক্ষেত্রে তেমন কোন বৈশিষ্ট্যও নেই, আসল হওয়ার প্রমাণও নেই। কুরআন মুখস্থ করা ও লিখে ফেলার ঐ প্রক্রিয়া মোহাম্মদের (সঃ) ইন্তেকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সেই আমলে যখন অনেকেই লেখাপড়া জানত না, অর্থাৎ লিখতে পারত না, কিন্তু

www.pathagar.com

সকলেই মুখস্থ করতে ও আবৃত্তি করতে পারত। তখন একটি বিরল সুবিধা ছিল এই যে, ওহীর লিখিত আকারে সংকলনের সময় একাধিক মানুষের আবৃত্তির সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা সম্ভব ছিল।

কুরআনের ওহী জিবরাইল ফেরেশতার মারফত মোহাম্মদের (সঃ) উপর নাযিল হয়েছিল। এ নাযিল হওয়া বিশ বছরেরও অধিককাল যাবত চালু ছিল। প্রথম নাযিল হয়েছিল ৯৬নং নম্বর সূরার (আল-আলাক) কয়েকটি আয়াত, তারপর তিন বছর যাবৎ আর কোন ওহী নাযিল হয়নি। তিন বছর পর আবার ওহী নাযিল হতে থাকে এবং ৬৩২ খৃষ্টাব্দে নবীর এন্তেকালের সময় পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর যাবত চালু থাকে। এ বিশ বছরের প্রথম দশ বছর ছিল হিজরতের (৬২২ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদের (সঃ) মক্কা থেকে মদীনা গমন) আগের এবং পরের দশ বছর ছিল তার পরের।

প্রথম ওহী ছিল নিম্নরূপ (সূরা ৯৬, আল-আলাক, আয়াত ১-৫)ঃ

"পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন-

সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষের রক্তপিন্ড হইতে।

পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক

মহা মহিমান্বিত,

যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন-

শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না।"

এ ওহীতে মোহাম্মদ (সঃ) সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি যে লিখতেও জানতেন না, পড়তেও জানতেন না। আমরা পরে এ ওহীর ব্যাখ্যা করব।

প্রফেসর হামিদুল্লাহ তাঁর কুরআনের ফরাসী তরজমার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, এ প্রথম ওহী একটি বিষয় হচ্ছে "মানুষের জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে কলমের প্রশংসা" এবং "এ জন্যই নবী লিখিত আকারে কুরআন সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন।"

খোদ কুরআনের এবারত থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মোহাম্মদের (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পূর্বেই সেই সময় পর্যন্ত নাযিল হওয়া ওহী লিখে ফেলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে কুরআন যে সত্যিই আসল তা আমরা এখনই দেখতে পারব। কারণ

www.pathagar.com

প্রথম দিকের ওহী লিখিত হয়ে যাওয়ার কথা পরবর্তী ওহীতেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি যে মোহাম্মদ (দঃ) ও তার সঙ্গীগণ ওহীর এবারত মুখস্থ, অর্থাৎ স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করতে অভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং, পরবর্তী ওহীতে যখন পূর্ববর্তী ওহী লিখিত হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া খুবই সহজ ছিল। যাঁরা কুরআন লিখে রাখার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করলেই ঐ প্রমাণ পাওয়া যেত।

হিজরতের আগেই যে ঐ সময় পর্যন্ত নাযিল হওয়া ওহী লিখে ফেলা হয়েছিল, ঐ সময়ের চারটি সূরাতে তার উল্লেখ আছে।

৩০ পারা-সূরা আবাসা (৮০ ঃ ১১-১৬)ঃ "এ প্রকার আচরণ অনুচিত; ইহা উপদেশ বাণী; যে ইচ্ছা করিবে সে ইহা স্মরণ রাখিবে, উহা আছে মহান, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন পবিত্র গ্রন্থে, মহান পূত পবিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।"

আল্লামা ইউসুফ আলী তাঁর ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত কুরআনের তরজমার ভাষ্যে বলেছেন যে, এ সুরাটি যখন নাযিল হয়, তখন বিয়াল্লিশ বা পয়তাল্লিশটি সূরা (মোট ১১৪টি সূরার মধ্যে) লেখা হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানগণ তা মক্কায় সংরক্ষণ করতেন।

৩০ পারা-সূরা বুরুজ (৮৫ ঃ ২১-২২)ঃ "বস্তুতঃ ইহা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।"

২৭ পারা-সূরা ওয়াকিয়া (৫৬ ঃ ৭৭-৮০)ঃ "নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন, যাহা আছে সুরক্ষিত গ্রন্থে, যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করিবে না। ইহা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।"

১৮ পারা-সূরা ফুরকান (২৫ ঃ ৫)ঃ "উহারা বলে, 'এগুলি তো সেকালের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে; এগুলি সকাল সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়।"

এখানে নবীর দুশমনদের অভিযোগের উল্লেখ আছে। তারা তাঁকে ভন্ড বলে মনে করত। তারা এ গুজব ছড়াত যে, তাঁর কাছে প্রাচীন উপকথা বর্ণনা করা হয়ে থাকে, এবং তিনি তা লিখিয়ে নেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লিখিত দলিল যে প্রস্তুত করা হত, এ কথা মোহাম্মদের (সঃ) দুশমনেরাও উল্লেখ করেছে।

www.pathagar.com

হিজরতের পরে নাযিল হওয়া একটি ছুরায় আসমানী উপদেশমালা লিখিত পৃষ্ঠাসমূহের উল্লেখ সর্বশেষ বারের মত করা হয়েছে।

৩০ পারা-সূরা বাইয়্যিনা (৯৮ ঃ ২-৩)ঃ "আল্লাহর নিকট হইতে এক রসূল, যে আবৃত্তি করে গ্রন্থ- যাহাতে আছে সরল বিধান।"

সুতরাং, খোদ কুরআনেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, নবীর আমলেই কুরআন লিখে ফেলা হয়েছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে, তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কাতিব বা লেখক ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যায়েদ বিন সাবিতের নামই সর্বাধিক বিখ্যাত।

প্রফেসর হামিদুল্লাহ তার কুরআনের ফরাসী তরজমার (১৯৭১) ভূমিকায় নবীর ইন্তেকাল পর্যন্ত সময়ে কুরআনের এবারত লিখিত হওয়ার সময় যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল, তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "সকল বিশেষজ্ঞই একমত হয়ে বলেছেন যে, যখনই কোন ওহী নাযিল হত, তখনই নবী মোহাম্মদ (সঃ) তাঁর লেখাপড়া জানা সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজনকে ডেকে নিয়ে তা লিখিয়ে নিতেন এবং এ নতুন ওহী পূর্বে নাযিল হওয়া ওহীর পরম্পরায় কোন জায়গায় বসাতে হবে তা বলে দিতেন। ...লেখা হয়ে যাওয়ার পর লেখককে তিনি তা পড়ে শুনাতে বলতেন এবং লেখায় কোন ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করে দিতেন। ...অপর একটি বিবরণে জানা যায় যে, প্রতি বছর রমযান মাসে নবী ঐ সময় পর্যন্ত নাযিল হওয়া সমুদয় ওহী তেলাওয়াত করে জিবরাইল ফেরশতাকে শুনাতেন... তাঁর ইন্তিকালের আগের রমযানে জিবরাইল তাঁকে দিয়ে সমগ্র কুরআন দুবার পড়ায়ে নিয়েছিলেন... একথা সর্বজনবিদিত যে, প্রতিদিন পাঁচ বারের নামাযে কুরআন পাঠ করা ছাড়াও সেই মোহাম্মদের (সঃ) আমল থেকেই মুসলমানগণ রমযান মাসে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে সমগ্র কুরআন পাঠ করতে অভ্যস্ত। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে, ওহীর এবারতের চূড়ান্ত সংকলনের সময় মোহাম্মদের (সঃ) কাতেব যায়েদ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যত্র অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।"

প্রথমবার কুরআন বিভিন্ন জিনিসের উপর লেখা হয়। চামড়া, কাঠের তক্তি, উটের কাঁধের হাড়, পাথর প্রভৃতি নানাবিধ জিনিস

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদ (সঃ) তাঁর সঙ্গীদের কুরআন মুখস্থ করতে বলতেন এবং তাঁরা সেই মত কাজ করতেন। ফলে তখন অনেকেই সমগ্র কুরআন মুখস্থ করে হাফেজ নামে পরিচিত হন এবং বিভিন্ন দেশে কুরআনের বাণী প্রচার করেন। এভাবে লিখিত আকারে ও মুখস্থ করে দুভাবে কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারটি কালক্রমে খুবই মুল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নবী মোহাম্মদের (সঃ) ইন্তেকালের (৬৩২ খৃষ্টাব্দ) কিছুদিন পরই ইসলামের প্রথম খালীফা আবু বকর নবীর সাবেক প্রধান কাতেব যায়েদ ইবনে সাবিতকে এক জেলদ কুরআন নকল করে দিতে বলেন। ওমরের (ভবিষ্যত দ্বিতীয় খলীফা) তত্ত্বাবধানে যায়েদ মদীনায় তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন লোকের কাছে থাকা বিভিন্ন জিনিসের উপরে লেখা কুরআনের এবারত একত্রিত করেন এবং হাফেজদের সঙ্গে পরামর্শ করে ও তাঁদের মুখস্থ থাকা বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে একখানি পূর্ণাঙ্গ কপি প্রস্তুত করেন। এভাবে একখানি নির্ভুল ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সংকলন প্রস্তুত হয়।

বিশেষজ্ঞদের সূত্রে জানা যায় যে, খালীফা ওমর (আবু বকরের পর ৬৩৪ সালে খালীফা হন) পরে সমগ্র কুরআনের একটি এককখন্ড প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করেন। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি এ খন্ডটি তাঁর কন্যা ও নবীর বিধবা স্ত্রী হাফসাকে দিয়ে যান।

তৃতীয় খালীফা হযরত ওসমান ৬৪৪ থেকে ৬৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন। তিনি সংকলনটি আরও উন্নত ও সংহত করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেন। এ কমিশন আবু বকরের আমলে প্রস্তুত করা ও তখন হাফসার হেফাজতে থাকা সংকলনটির ভিত্তিতে কাজ শুরু করেন। তাঁরা হাফেজদের মুখস্থ থাকা বিবরণ শোনেন এবং তাঁদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। এভাবে প্রত্যেকটি এবারতের আসল হওয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য পুংখানুপুংখ রূপে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালান। এ ব্যাপারে কঠোরতম সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং সামান্যতম সন্দেহজনক ক্ষেত্রেও সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য মিলে না যাওয়া পর্যন্ত কোন এবারত আসল ও নির্ভুল বলে গ্রহণ করা হয়নি। একথা সর্বজনবিদিত যে, কুরআনের কতিপয় আয়াতে নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে অপর কয়েকটি আয়াত চহীর

www.pathagar.com

মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে। মোহাম্মদের (সঃ) নবুওতের কর্মধারা বিশ বছরের অধিক কাল যাবত বিস্তৃত ছিল, এ কথা মনে রাখলে এ অবস্থার একটি সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নবী মোহাম্মদ (সঃ) রমযান মাসে সমগ্র কুরআন আবৃত্তি করার সময় যে ক্রমিকতা অনুসরণ করতেন, কমিশনও ঠিক সেই ক্রমিকতা অনুসরণ করে ছুরাগুলি সেইভাবে সাজিয়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করেন।

প্রথম তিনজন খালীফা, বিশেষত ওসমানের আমলে কুরআন সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল সে সম্পর্কে অনেকের মনেই হয়ত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব খুবই সহজ। নবীর এন্তেকালের পরবর্তী প্রথম কয়েক দশকে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং এ প্রসার যে সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘটে তাদের মাতৃভাষা আরবী ছিল না। সুতরাং অন্য ভাষায় তরজমা হওয়ার পূর্বে মূল ভাষার এবারত যাতে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল থাকে তার নিশ্চয়তা বিধান করার প্রয়োজন ছিল। এটাই ছিল ওসমান কমিশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

খলীফা ওসমান ঐভাবে সংকলিত কুরআনের কপি ইছলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করেন এবং এ কারণেই প্রফেসর হামিদুল্লাহ বলেছেন, ওসমানী সংকলনের ঐ কুরআন এখনও তাসখন্দ ও ইস্তাম্বুলের প্রাচীন সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে ইছলামী দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে যে সকল প্রাচীনতম কুরআনের সন্ধান পাওয়া যায়, নকল করার দু-একটি ছোটখাট ভুল ছাড়া তা সব একই প্রকারের। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত কুরআনের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। (প্যারিসের বাইব্লিওথেক ন্যাশনাল পাঠাগারে প্রাচীন কুরআনের যে অংশ বিশেষ সংরক্ষিত আছে, তা খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর, অর্থাৎ হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর আমলের বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন)। যা হোক আসল কথা এই যে, প্রাচীন কুরআনের যতগুলি কপির সন্ধান এযাবত পাওয়া গেছে, তার সবগুলিই একই প্রকারের। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত সামান্য বিভিন্নতা আছে, কিন্তু তার এবারতের সাধারণ অর্থ আদৌ বদল হয় না। কোন প্রসঙ্গে যদি একাধিক প্রকারের ব্যাখ্যার সুযোগ আছে বলে দেখা যায়, তাহলে তার কারণ সম্ভবত এ হতে পারে না, কুরআনের রচনা পদ্ধতি

www.pathagar.com

বর্তমান কালের রচনা পদ্ধতির তুলনায় অনেক সহজ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, উচ্চারণের গতি নির্দেশক চিহ্ন (জের, জবর, পেশ প্রভৃতি) না থাকার ফলে কোন ক্রিয়াপদ সকর্মক হিসাবেও গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার অকর্মক হিসাবেও গ্রহণ করা যেতে পারে; কোন লিঙ্গ পুংলিঙ্গ হিসাবেও গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবেও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু বাক্যের প্রসঙ্গেই যেহেতু অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায় সেহেতু এ অসুবিধা আসলে কোন অসুবিধাই নয়।

কুরআনের ১১৪টি ছুরা দৈর্ঘ্য অনুসারে বড় ছুরার পরে ছোট সূরা সাজানো আছে; কিন্তু এ নিয়মের আবার ব্যতিক্রমও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওহী নাযিল হওয়ার ক্রমিকতা বজায় থাকলেও সর্বত্র তা নেই। একই বিষয়ের অনেক বর্ণনা এবারতের বিভিন্ন স্থানে এসেছে; ফলে পুনরাবৃত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, একই অনুচ্ছেদে এমন একটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, যা অপর একটি অনুচ্ছেদে অসম্পূর্ণ অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত অনেক বিষয়ের মত আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কোন প্রকার শ্রেণী বিভাগ করা নাই। (বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান মুল ঃ ডঃ মরিস বুকাইলি, অনুবাদ ঃ ওসমান গণি)

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর মেরাজ ও সময়ের মূল্যায়ন

দরুদ শরিফ

সাল্লাল্লাহু আলা ছাইয়্যিদিনা, ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিওঁ, ওয়া আলা আলিহি, ওয়া আসহাবিহি, ওয়া আজওয়া জিহি, ওয়া জুর রিয়াতিহি, ওয়া আহ্‌লি বাইতিহি, ওয়া আহলে তা-আতিকা আজ মাইনা মিন আহলেছ ছামাওয়াতি, ওয়াল আরদিনা বেরহমাতেকা ইয়া আর হামার রাহি মিনা, ওয়াইয়া আকরামাল আকরা মিনা, ওয়া সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলা ছাইয়্যিদিনা মোহাম্মদিওঁ, ওয়া আলিহি, ওয়া আসহাবিহি আজমায়িনা, ওয়া ছাল্লামা তাছলিমান দায়েমান আবাদান কাছিরান কাছিরাওঁ, ওয়াল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন।

মেরাজের সময়

আসুন, অজু করে পবিত্র হয়ে উর্ধলোকে ভ্রমনের জন্য প্রস্তুত হই। ষড় রিপুর, (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য) মায়া বন্ধন ছিন্ন করে সাত রং (এই রং বহুবচন, সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য রং) অন্তহিন সৃষ্টির অনন্ত সৃষ্টি পাড়ি দিয়ে আলমে নাছুতের (হায়ওয়া নিয়াতের) সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা ত্যাগ করে, আলমে মলকুতকে (জিন্নি খাছলতকে) কলুষতা মুক্ত করে, আলমে যাবরুত (ফেরেস্তা তুল্য পবিত্রতা) মোকাম পার হয়ে, সর্বোচ্চ রহমানি মোকাম আলমে লাহুতে আসুন। এর পর ফানা ফিল্লাহ। এখানে আমিত্বকে সম্পুর্ন বিস্মৃত হলে যে দিব্য দৃষ্টি গোচর হবে তা মহামায়ার মহাস্থানে এক নির্মল আনন্দময় সৌম্যরূপ। এরপর বাকা বিল্লাহ। এসব দিব্য জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক সাধকের আশ্রয় ছাড়া বুঝা সুকঠিন। তবে আল্লাহর ইচ্ছা কার এখতেয়ারে নাই।

এই বাকা বিল্লাহ পর্যন্তই আমাদের মত পাপিষ্ঠ নরাধমের দৌড়। আমি আল্লাহর ব্যাপকতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে দেখেছি পৃথিবীকে ঘুর্ণামান রাখতে হলে তার চাইতে তের লক্ষ গুণ বড় সুর্যের দরকার। তাহলে সুর্যকে ঘুর্নায়মান অবস্থায় রাখতে হলে তার চাইতে কমচেকম ১৩ X ১৩ = ১৬৯ লক্ষগুণ বড় সূর্যের দরকার। এভাবে উর্ধক্রমে

www.pathagar.com

বৃহৎ, বৃহত্তর,বৃহত্তম সুর্যটি যেখানে সেখান থেকে চিন্তা, মন, কল্পনাকে নিতে নিতে এমন এক বিন্দুতে নেই, যে বিন্দু হতে চিন্তা মন-কল্পনা আর দূরে যায় না, ঠিক সেখান থেকে আল্লাহর বাকা বিল্লাহ্ শুরু।

আল্লাহ্ তা-আলার গুপ্ত বিষয় নবী-রছুল কেউ জানে না এবং তিনি কাউকে তার প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু জানান না

বিজ্ঞান বলে আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ (একলক্ষ ছিয়াশি হাজার) মাইল। আবার কেউ বলে মনের গতি আরো বেশী। আমি বলি আত্মার গতি আরো বেশী। আত্মা না থাকলে মন, চিন্তা, কল্পনা সবই শেষ।

বিজ্ঞান বলে সুর্য রশ্মির সাতরং। আল্লাহ্ বলেন, "সাত আছমান। তোমরা কি দেখনা যে— আল্লাহ্ কি ভাবে ধাপে ধাপে সাত আছমান সৃষ্টি করেছেন।

২৯ পারা, ৭১ ছুরা নূহ ১৫ আয়াত।

আবার অন্যত্র বলেন "এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রং এ সৃষ্টি করেছেন (একই ছুরা ১৪ আয়াত)। বর্তমানে পৃথিবীতে ৫০০ কোটিরও বেশী মানুষ এদের কার চেহারা (মুখমন্ডল) কার সঙ্গে মিল নেই। সাত রংয়ে কত রং তার হিসেব কে দেবে। তাহলে বাকাবিল্লাহ্ পর্যন্ত সাত আছসান সাত রং এ সৃষ্টি— অন্তের মধ্যে অনন্ত সৃষ্টি দেখলাম। কিন্তু অন্ত কোথায়? তা কি আল্লাহ্ কাউকে বলেছেন— এসবই মিরাজের খবর।

তাহলে উর্ধলোকে সূর্য বা সবচাইতে বৃহত্তম নক্ষত্রটির ব্যাপকতা ও পরিধি কত? পৃথিবীর ১ দিন ২৪ ঘন্টা বা ৮৬,৪০০/- (ছিয়াশি হাজার চারশত) সেকেন্ড। ঐ বৃহত্তম নক্ষত্রটি পৃথিবী অপেক্ষা কত বড় এবং ওখানের ১দিন, সেকেন্ড কত বড়, তা কি কল্পনা করে, অঙ্ক কষে দুনিয়ার সংখ্যা দিয়ে স্থির করা সম্ভব?

আবার ঐ বৃহত্তম নক্ষত্রটির সাথে পৃথিবীকে তুলনা করলে তার ক্ষুদ্রতা কি কোন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যাবে। সপ্ত আকাশের উপরে যেখানে মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ) বোরাক বা বিদ্যুৎযানে আরোহন করে (বোরাকের গতি মনের গতি অপেক্ষাও দ্রুত ছিল) রছুলুল্লাহ (সঃ) বোরাকে (গতি মনের গতি অপেক্ষাও দ্রুত ছিল) করে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন চরম উর্ধে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হন।

www.pathagar.com

এ স্থান বৃহত্তম নক্ষত্র রাজ্য অপেক্ষাও সীমার মধ্যে অসীম বড় মহানক্ষত্রের ওপারে। তবে বাকা বিল্লাহ্ অতিক্রম করে নয়।

পৃথিবীর একদিনে ২৪ ঘন্টা ধরে, কিন্তু ওখানে মহানক্ষত্রের ওপারে যেখানে আল্লাহর পেয়ারা হাবিব মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ) মেরাজ হয়েছে সেখানে কত কোটি দিনে ১দিন হয় তা আলেমুল গায়েবই অবগত আছেন। ওখানের ১ সেকেন্ড আমাদের পৃথিবীর কত শত বছর কেজানে। বস্তুমন্ডিত মাথায় হিসেব করা সম্ভব নয়।আদম (আঃ) হতে শুরু করে মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহর আগে বা পরে প্রলয়কাল পর্যন্ত কার ভাগ্যে এই মিরাজ ঘটে নাই। এবং ঘটবেও না। এ মেরাজই বিশ্ব নবী মোহাম্মদু রছুলুল্লাহর (সঃ) অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা মোযেযা।

প্রথমে এখানে দিন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন হতে ৬টি আয়াতে আল্লাহ্ কি বলেন তা শুনে তারপর বিচার করে দেখব যে, দিনের মেয়াদ কালের দৈর্ঘ্য কত?

১। এই শবে কদর- সম্মানের রাত, হাজার মাস অপেক্ষাও সম্মানিত।

৩০ পারা, ৯৭ ছুরা কদর ৩ আয়াত।

২। অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের রব, আকাশ সমূহ ও দুনিয়া (সমূহ) সৃষ্টি করেছেন ৬ দিনে ....

৮ পারা ৭ ছুরা আরাফ ৫৪ আয়াতাংশ।

৩। তিনিই আছমান হতে দুনিয়া পর্যন্ত সকল ব্যাপার পরিচালনা করেন, অবশেষে তাঁর কাছে পৌঁছায় এমন এক দিনে যার পরিমান (মেয়াদ) তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর হয় (এবছরের মেয়াদ ও অসীম)।

২১ পারা ৩২ ছুরা ছিজদা ৫ আয়াত।

৪। ফিরিস্তা ও (ইমানদারদের) রূহ (এই সিঁড়ি সকলের মধ্য দিয়ে) তাঁর দিকে সে দিন যাবে, যেদিনের মেয়াদ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

২৯ পারা ৭০ ছুরা মাআরিজ ৪ আয়াত।

৫। হে রছুল, আপনি বলুনঃ তোমরা কি আল্লাহকে অস্বীকার

www.pathagar.com

করছ - তিনি দু'দিনে দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন, আর অন্যকে তোমরা তাঁর সংগে শরিক করছ? তিনিই সারা জাহানের রব।

২৪ পারা, ৪১ ছুরা হা-মীম ৯ আয়াত।

৬। তিনিই আল্লাহ, যিনি সাত আছমান এবং সেরূপ পৃথিবীকেও.....

২৮ পারা, ৬৫ ছুরা তালাক ১২ আয়াতাংশ।

উপরে পবিত্র কুরআন হতে উদ্ধৃত ১ নম্বরে ছুরা কদরের ৩নং আয়াতের সম্মানিত রাতের যে কোন মুহূর্তে কোন দাসের ভাগ্যে কি ঘটবে তা কেউ অবগত নয়। শুভাশুভ যার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, এঘটনা মুহূর্তে ঘটে, এ বিষয় চিন্তাশীল সবাই একমত। তাহলে, মুহূর্ত যদি হাজার মাস হয়, তবে এক দিনে কত বছর হবে, তা হিসেব কষলেও জাগতিক হিসেবের আওতায় নাই (এ বিষয় আগেও আলোচনা করেছি।)।

দু' নং আয়াতে আছমান সমূহ ও দুনিয়া সমূহ। এতে বুঝা যায় সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য আছমান ও দুনিয়া (এ দুনিয়ার মত নয়) রয়েছে;

তিন নং আয়াতে দেখা যায়, আমাদের একদিন সমান হাজার (হাজার) বছর;

চার নং আয়াতে বুঝা যায়, যে সিঁড়ি বেয়ে বেহেস্তিগণ বেহেস্তে উঠবে সে সিঁড়ির দৈর্ঘ্য আমাদের হিসেবে পঞ্চাশ হাজার বছর (সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য বছর)।

পাঁচ নং আয়াতে বলা হচ্ছেঃ দু'দিনেই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাছে এ দু'দিন ৪নং আয়াতানুসারে এক লক্ষ বছর ত হবেই। আসলে কত কোটি বছর তা তাঁর জ্ঞানেই সীমায়িত।

ছয় নং আয়াতের সাত আছমান ও সাত জমিন যে, কত কোটি আছমান আর জমিন তা সসীমের মধ্যেই অসীম।

আমি উক্ত আয়াতাবলীর উল্লেখ করছি এজন্য যে, শবে মেরাজে রছুলুল্লাহর সময়ের মেয়াদ— কত কোটি বা কত বছর তা আল্লাহ ছাড়া, রাছুলুল্লাহরও আওতাভুক্ত নয়।

www.pathagar.com

৭০ ছুরা মাআরিজের ৫ আয়াতে, যে সিঁড়ির উল্লেখ রয়েছে তা পার হতে একজন ইমানদারের (এক মুহূর্ত) পঞ্চাশ হাজার বছর সময়ের মেয়াদ রয়েছে। আসলে এ মেয়াদ যে কত তা বলার জ্ঞান এ বস্তু মস্তিষ্কে আঁচ করা সম্ভব নয়। আমার বাল্যকালে একবার নিমোনিয়ার ইনজেকশন পুশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া জনিত কারণে কয়েক সেকেন্ড বেহুঁশ ছিলাম। তখন আমার বেহুঁশ অবস্থায় আমার মনে হলো, আমি এক টুকরা সাদা জ্যোতির মত সেই মহাশূন্যে কোথায় যেন চলে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে প্রতিষেধক ইনজেকশন দেয়ার পর আমার হুঁশ ফিরে আসে। আমি দেখি আমার চারপাশে মানুষ ও ডাক্তার। তারা কেউ আমার মাথায় পানি ঢালছে, আর কেউ দুধ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই কয়েক সেকেন্ডে আমার মনে হয় কয়েক কোটি মাইল মহাকাশে উঠেছিলাম, আর অত দূর হতে এসে হুঁশ ফিরে পেলাম। এতে অনুমান করা যায় যে, সময়ের মেয়াদ সময়ের স্রষ্টার হাতে। পঞ্চাশ হাজার বা অঙ্ক দিয়ে, অঙ্গ কষে সংখ্যা দিয়ে সংখ্যায়িত করা অসম্ভব। এরূপই মেরাজের সময়ের ব্যাপকতা

এয়া রব! আলো দাও, জ্ঞান দাও;

এয়া হাকিম! বিজ্ঞানময় বিজ্ঞান দাও,

তোমার দাসকে ধরা জয় করতে দাও।

আমিন

মেরাজের সফর সূচী

এ মেরাজ রছুলুল্লাহ (সঃ) ছফর করেছেন আল্লাহর ব্যাপকতার মধ্যে প্রায় সর্বত্র এবং

আট বেহেস্ত	সাত দোজখ
১। ফিরদাউস	১। জাহান্নাম
২। নাইম	২। হাবিয়া
৩। মাওয়া	৩। ছাকার
৪। দারুল খুলদ	৪। হোতামা
৫। আদনান	৫। সায়ির
৬। ইল্লিয়্যিন	৬। জাহিম ও
৭। দারুছ ছালাম ও	৭। সাজ।
৮। দারুল মকাম এবং	

www.pathagar.com

বেহেস্তের সুখ-শান্তি কি কি এবং কেমন; দোজকের দুঃখ কষ্ট কি কি এবং কেমন তন্ন তন্ন করে টিভির পর্দায় আমরা যেমন দেখি তেমনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর দোস্তকে দেখায়েছেন। আদম হতে কেয়ামত, কেয়ামত হতে মহাহাশর এবং আলা ইল্লিয়্যিন, তাহ তাছ ছিজ্জিন এবং শেষ বিচার দিনের হাওলাতাদি এবঙ বেহেস্ত দোজখের হাওলাতাদি পর্যন্ত কি কি ঘটল এবং কেমনি ঘটবে তা সমস্ত বিস্তারিতভাবে দেখায়েছেন। অতসব জানতে ও দেখতে তাঁর কত সময় লেগেছে কত বছর বা শতাব্দি লেগেছে তা ভৌতিক জ্ঞান বা দৃষ্টিতে হিসেব-নিকাশ একান্তভাবে অসম্ভব। অথচ দুনিয়ার দৃষ্টিতে দেখা গেল যে, তিনি মেরাজ হতে ফিরে আসার পর তাঁর অযুকৃত পানি এখনও গড়াচ্ছে। এ সময়টা দুনিয়ার হিসেবে বড় জোর ত্রিশ সেকেন্ড ধরা যায় বা তারও কম।

মেরাজে গিয়ে ত্রিশ সেকেন্ডে অত কিছু করা সহজ ব্যাপার নয়। হাঁ, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন। তিনি হাজার হাজার বছরকে সেকেন্ড এবং সেকেন্ডকে হাজার বছর করতে পারেন। আমি কোন কিছু মনে করা মাত্রই চলে গেলাম, সপ্তাকাশ ভেদ করে সেই বৃহত্তম নক্ষত্র লোকে। ওখানের সেকেন্ড, দুনিয়ার হাজার হাজার বছর এবং এখানে দুনিয়াতে নেমে এসে দেখি ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম।

এক এক গ্রহ বা নক্ষত্রের ছোট বড় ভেদে সময়েরও বেশ-কম হয়। সব চাইতে বড় নক্ষত্রের সময় সব চাইতে বড়। এ হিসেবে আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের এসব কথা আল্লাহর ভাষায় এভাবে প্রকাশ করেছেন। 'অথবা ঐ ব্যাক্তির কথা মনে কর যে, এক গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল যার ঘর বাড়ির ছাদ-দেয়াল সহ পড়ে গিয়েছিল। সে বলল হে! আল্লাহ মরনের পর একে কি ভাবে জীবিত করবে? তখন তাকে শত বছর মৃত অবস্থায় রাখার পর (কার মতে তিনশ (৩০০) বছর) জীবিত করলেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মৃত অবস্থায় কতক্ষন ছিলে (এ ব্যাপারে আমাদের প্রতিদিন কার স্বপ্নের তুল্য) ? সে উত্তর দিল একদিন বা এক দিনের কিয়দংশ। তিনি বল্লেন বরং একশত বছর মৃত ছিলে কিন্তু তোমার খানা-পানির দিকে চোখ দিয়ে দেখ, তা টাটকা রয়েছে, আর তোমার গাধার দিকেও তাকিয়ে দেখ। আর উদ্দেশ্য যে, আমি তোমাকে লোকের জন্য নিদর্শন স্বরূপ করব, এবং গাধার হাঁড়গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখ কিরূপে ও

www.pathagar.com

গুলোকে জোড়া দেই এবং গোস্ত দিয়ে ঢেকে দেই। যখন এটা তার কাছে সুস্পষ্ট হলো, সে বল্ল আমি বুঝলাম যে, আল্লাহ সর্ব শক্তিমান।'

৩ পারা, ২ ছুরা, বাকারা ২৫৯ আয়াত। এবং ১৫ পারা ১৮ ছুরা কাহাফ ৯-১৫ আয়াতে বর্নিত আসহাবুল কাহাফ গুহাবাসীদের কাহিনী এখানে স্মরনীয়।

পবিত্র কুরআনে চৌদ্দশ বছর আগেই ঘোষনা করেছেন, সময়ের নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সময়ের স্রষ্টার হাতেই রয়েছে 'হয়াত'। 'হয়াত'-মউতের অর্থও সময়। এসময় সৃষ্টি করেছেন যিনি, তিনি আমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সব চাইতে বেশী সৎকাজ করে। এবং তিনি মহা শক্তিমান ক্ষমাশীল।

[২৯ পারা ৬৭ ছুরা মুলক ২ আয়াত]

তা হলে হয়াত-মউত বা সময়ের স্রষ্টা সময়ের নিয়ন্ত্রক। কারণ হয়াত কার কত, মউত কার কখন কেমন কেউ আজ পর্যন্ত বলতে পারে নাই এবং বলার খবরও কার জানা নাই। যারা জানে তারা বলে না। এযে নিয়তির নীতিতে নাই। তিনি এক সেকেন্ডকে শত হাজার বছর, আবার শত হাজার বছরকে ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম করার এক ছেটিয়া অধিকার রাখেন।

উক্ত আয়াতে হয়াত-মউতের বা সময়ের সঙ্গে পাপ পূন্য বা সদসত কাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। সময়টা পাপ পূন্যের দাঁড়ি - পাল্লা। যেখানে দাঁড়ি পাল্লা ব্যবহৃত হবে সেখানে ওজনের কম-বেশির প্রশ্ন জড়িত। তা হলে সময়ের ওজন আছে। যেহেতু সময় বা হয়াত মউত পাপ পূন্যের উপর নির্ভরশীল; সেহেতু এই পাপ পূন্য মহাহাশরের বিচার দিনে দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে ওজন করা হবে। আর ওজনে এক রতিও বেশ কম হবে না। এটা বিষয়াসক্ত লোকের মাপ কাঠির ফাঁকি ঝুঁকি নয়, ত্রিভুবনের মালিক ও নিয়তির কথা। যাঁর পূন্যের পাল্লা ভারি হবে তিনি বেহেস্তি; আর যার পাপের পাল্লা ভারি হবে সে পাবে হাবিয়া (দোজখ)। একথাগুলো আল্লাহ এভাবে বলেছেন, "তারপর যার (পুণ্যের) ওজন ভারি হবে। ফলে সে আনন্দময় জীবন উপভোগ করবে (বেহেস্তে)। আর যার পূণ্যের ওজন হালকা হবে; ফলে তার স্থান হাবিয়া দোজখ।

৩০ পারা ১০১ ছুরা আল কারিয়া ৬-৯ আয়াত।

www.pathagar.com

এরূপই আল্লাহর কথা। আল্লাহর কথা মাত্রই ওহী বা পবিত্র কুরআনের ভার পর্বতও বহন করতে পারে নাই।

২৮ পারা-৫৯ ছুরা হাশর, ২১ আয়াত।

পাপকে বলা হয় তলাতল রসাতল দুনিয়া-আখেরাতের ঘৃন্যতম বস্তু! বস্তু বলছি এজন্য যে পাপ পূণ্যের ওজন আছে। বস্তু না হলে ওজন হয় কি করে? ওহীর ওজনের কিঞ্চিৎ আভাস আগেই দিয়েছি। সুতরাং পুণ্য বা ছাওয়াব প্রায় ওহীর সমপর্যায়। তাই বলে ওহী নয়— ওহীর পক্ষে ক্রিয়ার নাম পুণ্য এবং ওহীর বিপক্ষে ক্রিয়ার নাম পাপ বা গুনা। পাপ পুণ্যের গুরুত্ব বা ভারিত্ব নিয়েই ওজন করা হবে।

আসুন, মেরাজের দিকে ফিরে যাই। মেরাজে রছুল (সঃ) কত সময় কাটিয়েছেন তা সময়ের স্রষ্টা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। আমি মেরাজের সময়ের হিসেব নিকেশ ও মনস্থ করলেই, আমার মন ছুরা বাকারার ২৫৯ আয়াত এবং ছুরা কাহাফ ৯-১৬ আয়াতের দিকে ছুটে যায়। পবিত্র কুরআনের এসব নিদর্শনবলী হতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আল্লাহ দিনের কিয়দংশকে ৩০০ বছরের বেশী করতে পারেন। আরো নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কার কাছে এক দিনের কিয়দংশ, আর কার কাছে ৩০০ বছরের বেশি। এ শাশ্বত সূত্র ধরে বলা যায় যে, বিশ্ব নবী (সঃ) এর মেরাজের সময় আমাদের ভৌতিক মন-মানসিকতা দিয়ে সেকেন্ড মনে করলেও সপ্তাকাশের যে খানে রছুলুল্লাহর (সঃ) মেরাজ হয়েছিল, সেখানে যে কয়েক শ বছর লাগে নাই তা কি করে অনিশ্চিত হওয়া যায়।

আল্লাহ বলেন, ঐ সম্মানিত রাত হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম।

৩০ পারা ৯৭ ছুরা কদর ৩ আয়াত।

এ আয়াতটি পবিত্র কুরআনের ৯৭ ছুরা কদর হতে উদ্ধৃত। কদর শব্দের ধাতুগত অর্থ পরিমান-পরিমাপ, নিরূপন, ভাগ্য নির্ধারন বা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। এরাত সাধারণত শবে কদর নামে পরিচিত। উক্ত হাজার মাস যা আমাদের ভুমন্ডলীয় হিসেবে ৮৩ বছর ৪ মাস। ঐ রাতে কার এবাদত আল্লাহ গফুরুর রহীম কবুল করলে, সে ৮৩ বছর ৪ মাসের বা হাজার মাসের সমান ছওয়াব পাবে। তার বেশিও পেতে পারে। এই ছাওয়াবের ওজন সম্বন্ধে আগে আভাস দিয়েছি। বলা হয়, ঐ রাত্রের কোন এক মুহূর্তে আল্লাহ তার বান্দার দোআ' কবুল করেন,

www.pathagar.com

তার কোন নির্দিষ্ট সময় নিশ্চিত নয়। যদিও কোন বান্দা এ সময়ে, ওসময় বলে থাকেন— তা সম্পুর্ন অনিশ্চিত। তবে মুহূর্ত বা অতি অল্প সময়। এ ব্যাপারে প্রায় সবাই এক মত। মুহূর্ত বা সেকেন্ড যদি ৮৩ বছর ৪ মাস হয়, তবে আমরা মনে করতে পারি যে, রছুলুল্লাহ(সাঃ) মেরাজে কমছেকম ৮৩ বছর ৪ মাস ছিলেন যা তাঁর দুনিয়াবী হিসাবের ৬৩ বছর বয়স অপেক্ষা ২০ বছর ৪ মাস বেশী। অজুর পানি গড়ালে যদিও কয়েক সেকেন্ড সমান ১ মুহূর্ত হয়, শবে কদর হাজার মাস সমান ৮৩ বছর ৪ মাস হয়।

রছুলুল্লাহ লক্ষ লক্ষ বছরের রাস্তা অতিক্রম করে সপ্তাকাশ ভেদ করে, সাত দোজখ, আট বেহেস্ত, আরশ- কুরছি, ভ্রমন করে হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলী দেখে শুনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফিরে আসার পর দেখা গেল, তখনও অজুর পানি গড়াচ্ছিল, বিছানা গরম ছিল এবং দরজার সিগল ঝুলতেছিল। এ সময়ে তিনি মেরাজে হাজার হাজার রহস্যের কথাবার্তা শেষ করে মর্ত লোকে ফিরে এসেছেন।

অজু যত উঁচুতে বসে করা হবে অজুর পানি গড়ায়ে নীচে নামতে তত বেশী সময় লাগবে। কত উঁচুতে বসে তিনি অজু করে ছিলেন তার দলিল আমার হাতে নেই। দরজার কড়া যত বেশী হালকা হবে, তত বেশিক্ষণ লড়বে এবং বিছানার গরম কাটতেও কয়েক মিনিট সময় লাগা সম্ভব। যা হউক অজুর পানি গড়ানো, দরজার কড়া নড়া এবং বিছানার গরমের সময় গড়ে যদি ৪ সেকেন্ড ধরি তবে, শবে বরাতের রাতের হাজার মাস বা ৮৩ বছর ৪ মাসকে ৪দিয়ে গুণ করলে আমরা পাই ৮৩ বছর ৪ মাস X ৪ সেকেন্ড = ৩৩৩ বছর ৪ মাস। তাহলে তিনি মিরাজে ৩৩৩ বছর ৪ মাস ছিলেন। এ হিসেবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত গুহাবাসী বা আস হাবুল কাহফের সময়ের কাছাকাছি হয়। যা হউক রছুল (সঃ) মেরাজে ৩৩৩ বছর ৪ মাস ছিলেন, না কয়েক হাজার বছর ছিলেন তা আলেমুল গায়েব ছাড়া কেউ জানেন না।

তিনি মেরাজে যত বছরই থাকুন না কেন তিনি সশরীরে (এ শরীর নুরের, কারণ নুরুন্নবী ছিলেন)। আমাদের মত টেলি ভিশনের সামনে বসে দুনিয়া আখেরাতের ভালমন্দ সুখ-দুঃখ, পাপ পুণ্য, শান্তি-শাস্তি খুটি নাটি সহ কুল মাখলুকাতের আদি সৃষ্টি হতে অন্ত এবং অন্ত

www.pathagar.com

হতে মহা বিচার দিন এবং ঐ দিনের আগে পরে কোথায় কেমন কি হবে না হবে প্রয়োজনীয় সব কিছুই আল্লাহর হুকুমে ফেরেস্তারা দেখায়েছেন। দুনিয়াতে এসে তিনি মেরাজের অলৌকিক মোযেযা যা যা দেখেছেন তা সবই তাঁর উম্মাতকে ব্যবহারিক বাচনিক সমর্থনের মধ্য দিয়ে পৌছাইয়েছেন।

উপরে বর্ণিত কুরআনের ভাষা হতে স্পষ্ট যে স্থান কাল পাত্র মহাকর্ষ বা গতির প্রশ্ন তুলে রছুলুল্লাহর (সঃ) সশরীরে বিদ্যুৎযানে করে মেরাজ যাওয়া এখন এই বিজ্ঞানের যুগে অবিশ্বাস করাটা নেহায়েত কুপমন্ডুকতা। তবে সময় যে কত গেছে তা নির্দিষ্ট করে সময়ের স্রষ্টাই বলতে পারেন। অন্য কেউ নয়।

এখন মেরাজকে বিশ্বাস না করলে বর্তমান যুগের কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যই বুঝা সম্ভব নয়। এখন আকাশ ভ্রমনের বা গ্রহ হতে গ্রহে ভ্রমনের (Inter Planetory flight বা Space Travel) -এর যুগ এসে গেছে। অন্ধের হস্তী দর্শনের নয়। পৃথিবী হতে চাঁদে Ship -এ চড়ে বৈজ্ঞানিকেরা চাঁদের দেশে ও গ্রহ হতে মঙ্গল হয়ে অন্য সব গ্রহ নক্ষত্রে (Fire Proof -Sheet) বা Fire-Ship উদ্ভাবিত করে ভ্রমন করাই আজকের বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য। তবে Space Ship বা রকেটের সঙ্গে বোরাকের গতির তুলনা করা বাতুলতা মাত্র। বোরাকের গতি মনের গতি অপেক্ষা কল্পনাতীত বেশী বিধায় রছুলুল্লাহ সশরীরে মেরাজ করেছেন। সশরীরে চাঁদে ভ্রমন যত সত্য তার চাইতেও অধিক সত্য সশরীরে মেরাজ করা। যারা মনে করেন বোরাক (বিদ্যুৎযান) বল্লে ধর্মীয় গোড়ামি হয়, আর রকেট বল্লে বৈজ্ঞানিক সত্য হয়, এধরনের চিন্তা করা তাদের অন্যায় নয় কি?

যাঁরা বেহেস্তের কাছে 'আলাইল্লিয়্যিনে' অবস্থান করছেন তাদের কাছে মনে হবে এই বুঝি কিয়ামত হয়ে গেল। বিচার দিন অত্যাসন্ন —এ চিন্তায় অস্থির। আমরা মনে করি দুনিযা সৃষ্টির পর কোটি কোটি বছর গত হয়েছে, আরো কোটি কোটি বছর বাকী রয়েছে কিয়ামতের, দোজখের কাছে 'তাহতাছ ছিজ্জিনে' যারা অবস্থান করছে তাদের সময় আর যায় না। এভাবে কার সময় কম, আর কার কাছে সময়ের শেষ কল্পনাই করতে পারছে না।

এযেন সুর্যলোকের আগুনের সৃষ্টিকে মর্ত্যলোকে, আর মাটির সৃষ্টিকে সুর্যলোকে ফেললেই শাস্তির কিছুটা আলামত আঁচ করা যাবে

www.pathagar.com

বটে, তাই বলে এ নয়, মহাহাশরের বিচারের পর দোজখের শাস্তির সমপর্যায়। একটু চিন্তা করুন। কিরামান কাতেবিন অত পাপ পুণ্য লেখে রাখে কোথায়? আবার কার সারাজীবনে কবে, কোথায় কার সঙ্গে কি বলেছে, কি কি বলছি, কি পড়েছি, কি পড়ায়েছি, কি কি পাপ পুণ্য করছি তা সবের টালকে টাল নিয়ে মাপা হবে। কানে শুনে অস্বীকার করার উপায় নাই— কান যে ক্যাসেট; চোখে দেখে অস্বীকার করার উপায় নাই— চোখ যে ফটো তোলার ক্যামেরা; মুখে না বলে উপায় নাই— মুখ যে ছাউণ্ড বকস। হাত, পা, চামড়া, লোম-কূপ সবাই সত্য কথা বলবে— বুঝবার চেষ্টা করুন। এদিন দিন নয়। বেশী কাঁদ, হাস কম— টেপরেকর্ডার, ক্যামেরা, ছাউণ্ড বক্স সঙ্গেই আছে। পালাবার বা কোন কিছু গোপন করার উপায় নাই। যদি কেউ বলে সারাজীবনের অত কথা, অত পাপ-পুণ্য লেখে রাখছে কোথায়? মনকে জিজ্ঞাসা করুন। পবিত্র মহাগ্রন্থ কুরআন মুখস্থ করে রাখছে কোথায়? এম,এ, ওকালতি, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কোথায় রাখেন? - যখন যা মনে হয় তখন তা বলে দেন। সময় যাঁর, তাঁর কাছে ধরা অবশ্যই পড়বেন।

মেরাজের সময় নিয়ে অনেক দিকে অনেক কথাই বলেছি। বিজ্ঞানময়, পবিত্র কুরআনই বিজ্ঞানাধার। বিজ্ঞান ছাড়া কুরআন এবং কুরআন ছাড়া বিজ্ঞান অসার, এসব আমি বলিনা, আমার আমি আমাকে অপার করুনাময়(বিজ্ঞান পাঠ) শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে কথা বলতে শিখায়েছেন। তাঁরই হুকুমে, চাঁদ সুরুজ গণনায় নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। তৃন-লতা তাঁর সেজদা করছে।

(২৭ পারা ৫৫ ছুরা রহমান ১-৬ আয়াত) এবং ইকরা পড় (রছুলুল্লাহর কাছে পবিত্র হিরাগুহায় প্রথম ওহী প্রথম শব্দ, এই প্রথম নিয়ে মতভেদ আছে) ৩০ পারা ৯৬ ছুরা আলাক ১ ও ৪ আয়াত।

রছুলুল্লাহ (সঃ) মেরাজের সময় কত বছর-কাল তা সময়ের স্রষ্টা আল্লাহই সুপরিজ্ঞাত। আমার মত নাচিজ ক্ষুদ্রতম জ্ঞানী নরাধমের বুদ্ধি ও জ্ঞানের অগোচর। আমি মহা জ্ঞানময়ের কাছে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি ভিক্ষা চাই। আশ্রয় চাই-শয়তান হতে। তাঁর কাছে যাচঞা করার তৌফিক চাই। সকল প্রকার পাপের পাপ হতে মুক্তি চাই। আমিন।

www.pathagar.com

রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর সময়ের মূল্যায়ন - ১

সূক্ষ্মভাবে হিসেব করলে এক দিনে হয়, ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। আমাদের হিসেবে ২৪ ঘন্টার ১ দিন অপেক্ষা ৩ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড কম। যা হউক, একদিন ২৪ ঘন্টার হিসেবে, একদিনে ঃ ২৪ ঘন্টা X ৬০ মিনিট = ১৪৪০ মিনিট হয়।

মনে করি, আমি যে দিন বা তারিখটি আমার নিজের চিন্তা প্রসূত সময়ের হিসেবের জন্য ঠিক করেছি, সে তারিখটি ছিল, জুমআর দিন-শুক্রবার। নীচের হিসেবের ফর্দে ৩৫টি বিষয়ের উপর আমার কল্পনা মত (কেউ যেন এ হিসেবকে কোন হাদিস মনে না করেন) হুজুরে পাক (সঃ) -এর এক দিনের এবাদতের সময় দেখাবার চেষ্টা করেছি।

রছুলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সময়কে তিন ভাগ করতেনঃ-

১। আল্লাহর বন্দেগীর জন্য,

২। সর্বসাধারনের জন্য এবং বিবিদের জন্য (এ সময়ে তাঁদের সঙ্গে খোশ আলাপ করতেন),

৩। ব্যক্তিগত কাজের জন্য— এ অংশে খাছ খাছ লোকদের জন্য ব্যয় করতেন।

হুজুরে পাক (সঃ) ফজরের নামাজের পর এবং মাগরিবের পর কিছু সময় বসে থাকতেন। এ সময়ে নবুয়াতি দরবার, অর্থাৎ শরিয়াত সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হত; হুজরে পাক নিজের ও সাহাবাদের স্বপ্নের বিষয় আলোচিত হত। ইছলামের আদর্শ— আল্লাহর আদেশ সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছায়ে দেয়া যায়, তার পরামর্শ করা হত। কার কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর এবং আল্লাহর ওহীর দুর্বোধ্যাংশের ব্যাখ্যা দান করতেন।

১। ফজরের নামাজ ও জেকের ইত্যাদি ঃ

হুজুর পাক (সঃ) -এর ফজরের আজানের জওয়াব, নামাজ ও জেকের, তাছবিহ প্রভৃতি সহ এশরাক নামাজের পূর্ব পর্যন্ত সময় ব্যয় হত অন্তত .... ৬০ মিনিট

২। এশরাক নামাজ ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) সকালে সূর্য কিছু দূর উঠার (৭/৮টা) পর—

www.pathagar.com

২, ৪ কিংবা ৬ রাকাত নামাজ পড়তেন। এ নামাজে গড়ে সময় ব্যয় হত অন্তত ..... ২০ মিঃ

৩। চাশতের নামাজ ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) বেলা প্রায় ৯/১০টার সময়, ৪, ৮ বা ১২ রাকাত চাশতের নামাজ পড়তেন। হুজুর এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি বেলা দ্বিপ্রহরের আগে ৪ রাকাত নামাজ পড়ে, সে যেন শবে কদরের নামাজ পড়ল— যার ফজিলত হাজার মাস অপেক্ষাও বেশী। এ নামাজের গড়ে সময় ব্যয় হত অন্তত ... ৩৬ মিঃ

৪। জোহরের নামাজ ও (কাইলুলা) শোয়া ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) -এর জোহরের আজানের জওয়াব, নামাজ ও কাইলুলা সহ সময় ব্যয় হত অন্তত ..... ৪০ মিঃ

৫। জাওয়াল নামাজ ঃ

হুজুরে পাক বেলা পড়ার পর ৪ রাকাত ছালাতে জওয়াল নামাজ প্রায়ই পড়তেন। এ নামাজে সময় ব্যয় হত অন্তত ..... ২০ মিঃ

৬। আছর নামাজ ও বিবিদের সঙ্গে খোশ আলাপ ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) -এর আছরের নামাজের আজানের জওয়াব ও নামাজ পড়ে, বেশ কিছুক্ষণ বিবিদের সঙ্গে খোশ আলাপ করতেন। এতে সময় ব্যয় হত অন্তত ... ৫০ মিঃ

৭। মাগরিব, তছবিহ তাহলিল ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) -এর মাগরিবের আজানের জওয়াব, তছবিহ তাহলিল সহ সময় ব্যয় হত অন্তত ..... ৩০ মিঃ

৮। ছালাতে আউয়াবিন ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) -এর মাগরিবের ২ রাকাত ছুন্নাত আদায় করে, ৬ হতে ২০ রাকাত পর্যন্ত ছালাতে আউয়াবিনের নামাজ পড়তেন। এতে অসীম ছওয়াব আছে। এ নামাজের সময় গড়ে ব্যয় হত অন্তত.... ৪০ মিঃ

৯। এশার নামাজ হতে শোয়া পর্যন্ত ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) -এর এশার আজানের জওয়াব, নামাজ ও শোয়া পর্যন্ত সময় অন্তত ..... ১২০ মিঃ

www.pathagar.com

১০। ছালাতে তাহ্ইয়াতুল অজু এবং তায়াম্মম ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) -এর অজু থাকলেও প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করতেন। ওজর বা কষ্টদায়ক মনে করলে তিনি খালি মেছওয়াক করতেন। অজুর সময় হাত-পায়ের আঙ্গুল ও দাড়ি মোবারক খিলাল করতেন। প্রত্যেক অঙ্গ ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল ও গোড়ালি ভালভাবে পানি দ্বারা ধোতেন। অজুতে ৫ (পাঁচ) ফরজ। দাড়ি না থাকলে ৪ (চার) ফরজঃ

১। দু'হাত কনুই সহ ভালভাবে ধোয়া,

২। মুখ— উপরে চুল, নিচে থুতনি এবং দু'কানের লতি পর্যন্ত ধোয়া,

৩। দু'পা টাকনো পর্যন্ত ধোয়া,

৪। মাথা মোছেহ করা,

৫। দাড়ি থাকলে দাড়ির গোড়া পর্যন্ত আঙ্গুল দিয়ে খিলাল করে ভিজানো।

১০। ক) তায়াম্মম ঃ

পানি না পাওয়া গেলে, হিংস্র প্রাণীর ভয় বা অন্য কোন কারণে প্রাণের ভয় বা শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে, পানির পরিবর্তে পাক মাটি বা মাটি জাতীয় বিভিন্ন জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ। অজু বা গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মম করা হয়। তায়াম্মমে তিনটি ফরজ ঃ

১। নিয়াত করা ঃ আমি সহবাস বা নাজাছাতে গলিজা (গুরুতর) ও নাজাছাতে খফিফা (লঘুতর) নাপাকি দূর করবার জন্য, নামাজ, কুরান তেলাওয়াতের সুদ্ধতার ও পবিত্রতার জন্য এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তায়াম্মমের নিয়াত করছি।

২। অজুর জন্য নির্দিষ্ট মুখমন্ডল মোছেহ করা।

৩। অজুর জন্য নির্দিষ্ট হাতের কনুই সহ মোছেহ করা। (অজু ও তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ একই) হুজুরে পাক (সঃ) -এর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও তাহাজ্জুদ সহ দৈনিক ৬ বার (অন্য সময়ের অজু ধরা হয় নাই) অজু ও ৬ বার মেছওয়াকের কার্যক্রমের গড় সময় ব্যয় হত অন্তত .... ৭০ মিঃ

www.pathagar.com

১১। হুজুরে পাক (সঃ) ছালাতে তাহ্ইয়াতুল অজু নামক নামাজ পড়তেন। রাছুলুল্লাহ ফরমায়েছেন, যে কেহ মন দিয়ে এ- দু রাকাত নামাজ পড়বে তার জন্য বেহেস্ত ওয়াজিব।

দৈনিক ৬ বার অজুর × ২ = ১২ রাকাত।

অতএব এ নামাজের সময় গড়ে অন্তত .... ৪০ মিঃ

১২। ছালাতে তাহ্ইয়াতুল মছজিদ ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) মছজিদে ঢুকে ২ রাকাত ছালাতে তাহ্ইয়াতুল মছজিদ নামক নামাজ পড়তেন এবং তিনি ফরমায়েছেন— মছজিদে ঢুকে ২ রাকাত নামাজ না পড়ে বইস না।

দৈনিক ৬ বার মছজিদে × ২ রাকাত করে ১২ রাকাত নামাজ।

অতএব, এই ছালাতুল তাহ্ইয়াতুল মছজিদের সময় গড়ে অন্তত ... ৪০ মিঃ

১৩। জুমআ নামাজ ঃ

জুমআর নামাজ প্রথম হিজরি সন হতে ফরজ হয়েছে। জুমআর খুতবা সহ নামাজের সময় ব্যয় হত অন্তত .... ৬০ মিঃ

১৪। নখ, বগল, নাভির নিচের চুল, মোচ, দাড়ি ঃ

নখ, বগল, নাভির নীচের চুল ৭ দিন অন্তর কাটা সুন্নত, না হয় ২ সপ্তাহ, ৩ সপ্তাহ, ১ মাস, তা না হলে ৪০ দিনের মধ্যে কাটতেই হবে। নয়ত নামাজ মকরুহ হবে। মোচ চাঁচা ছুন্নত। দাড়ি এক মুঠ লম্বা রাখা সুন্নত। রছুলুল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মোচ খাটো করবেনা, সে আমার দলভুক্ত নয়।' অতএব দাড়ি চাঁচা এবং মোচ বড় রাখা শরিয়াত বিরোধী কাজ। সপ্তাহে একবার হিসেবে একদিনে গড়ে ২০ মিঃ

১৫। পানি পান ঃ

হুজুরে পাক একবার কিছু পানি পান করে, গ্লাস সরায়ে নিতেন। এভাবে দ্বিতীয় বার বা তৃতীয় বারও পান করতেন। এতে খানা হজম হয়। পিপাসা দূর হয়। শরীর ভাল থাকে, ৫ বারে × ৩ = ১৫ মিঃ

www.pathagar.com

১৬। পেশাব ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) ফরমায়েছেন— অধিকাংশ কবরের আজাব পেসাবে অসাবধনতার জন্য হবে। পেসাবের ছিটা-ফোঁটা কাপড়ে বা শরীরে লাগলে শরীর বা কাপড় নাপাকির কারণে, নামাজ হয় না। পেসাবের পর ঢিলা কুলুখ লয়ে কতক্ষণ (যতক্ষণ পেসাব ঝরার সন্দেহ থাকে) টহল দেয়া, পা-পা ঝাঁকি ও গলা খেকর দেয়া সুন্নত। ঢালু ও নরম যায়গায় (গর্ত, পাত্র বা বদ্ধ পানিছাড়া) বসে পেসাব করতেন। হুজুর পাক (সঃ) ছফরে যাবার কালে সঙ্গে বর্শা রাখতেন, দরকার বোধে পেসাবের যায়গা নরম করার জন্য। রছুলুল্লাহর (সঃ) পায়খানা পেসাব অত্যন্ত সুগন্ধ ছিল। রছুলের (সঃ) খাদেমা উম্মে আয়মান ভুলে রছুলের (সঃ) পেসাব পান করে বলেছিলেন, 'তার কাছে তাঁর পেসাব খুবই সুমিষ্ট ও সুঘ্রান পানির মত লেগেছিল।' ফলে উম্মে আয়মানের শরীরে জীবনভর সুগন্ধ ছিল। হুজুরে পাক (সঃ) -এর পায়খানা-পেসাবে সুগন্ধ ছিল। পায়খানা-পেশাব করার সাথে সাথে তা মাটিতে চুষে নিত।

অতএব, পেসাবের কার্যক্রমে ব্যয় হত অন্তত দৈনিক গড়ে

৫৫ মিঃ

১৭। পায়খানা ঃ

হুজুরে পাক ফরমায়েছেন— যারা রাস্তা, গাছ তলায়, পানির ঘাটে পেসাব, পায়খানা করে, তাদের উপর লানত। হুজুরে পাক (সঃ) খোলা যায়গায় মানুষের অগোচরে, অথবা খোলা যায়গায় পর্দা দিয়ে, অথবা বাঁধা পায়খানাতে কাবার দিকে মুখ বা পিঠ না দেখায়ে হাজত পুরা করতেন।

পায়খানায় ঢুকার আগে পড়তেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবছে অয়াল খাবায়েছে।" পায়খানায় ঢুকার আগে আংটি খুলে রাখতেন, কারণ আংটির উপর আল্লাহ ও রছুলের নাম খোদিত ছিল। পায়খানায় ঢুকার সময় প্রথমে বাম পা এবং বের হবার সময় প্রথমে ডান পা রাখতেন। পায়খানা শেষে ৩টি ঢিলা কুলুখ দ্বারা মলদ্বার মুছে ফেলে, পরে পানি দ্বারা ধুয়ে নিতেন। এর পর মাটিতে হাত ঘষে নিতেন এবং এ দোআ' পড়তেন, "গুফরানাকা-আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি

www.pathagar.com

আজহার আন্নি লাজা ওয়া আফানি।"

পায়খানার কার্যক্রমে ব্যয় হত অন্তত (দৈনিক একবার)

২০ মিনিট

১৮। গোছল ঃ

গোছলে ৩ ফরজ ঃ

১। গলগলা করে কুলি করা। রোজাদারের জন্য গলগলা করার সময় খুব সাবধান থাকতে হবে— যাতে করে পানি হলকুমের ভেতরে ডুকে না পড়ে।

২। নাকের ছিদ্র ভালভাবে পানি দ্বারা পরিষ্কার করা।

৩। সারা শরীর লোমকূপ, নাভি ও মাথার চুলের গোড়া সহ ধোয়া।

গোছলের কার্যক্রমে অন্তত ... ২০ মিঃ

১৯। চুল-দাড়ি আছড়ানোঃ

বকরী দোহন, জুতা, কাপড় শেলাই সহ অন্তত .... ২৫ মিঃ

২০। আতর, সুরমা ঃ

রছুলুল্লাহ (সঃ) রাত শোয়ার আগে ৩ বার 'এছমত' নামক কাল সুরমা ব্যবহার করতেন। এতে সকল প্রকার চোখের রোগ নাশ হয়। তিনি আতর, খোসবু ও বিধবা বেশি ফছন্দ করতেন। সারাদিনে এসব কার্যক্রমে ব্যয় হত অন্তত ১৫ মিঃ

২১। ওহী ঃ

হুজুরে পাক (সঃ)-এর সারা দিনে ওহীর ব্যাপারে অন্তত

২০ মিঃ

ওহী (ওহী ১ম খন্ড ৩য় অধ্যায় দেখুন) ঃ ২৪,০০০ হতে ২৭,০০০ হাজার বার নাজিল হয়েছিল বা জিবরাইল (আঃ) এসেছিলেন।

নবুয়াতির ২৩ বছরের মধ্যে প্রায় ৩ বছর যাবত ওহী নাযেল হয় নাই। অবশিষ্ট ২৩-৩ বছর = ২০ বছরের মধ্যে ২৪,০০০ (হাজার) হতে ২৭,০০০ (হাজার) ওহী নাযেল হয়েছে বা জিবরাইল (আঃ) এসেছিলেন।

১ বছরে ৩৬৫ দিন— নবুয়াতির অবশিষ্ট ২০ বছর X ৩৬৫ দিনে

www.pathagar.com

বছর = ৭৩০০ দিন। তাহলে ২০ বছরে বা ৭৩০০ দিনে ২৪,০০০ হাজার ওহী নাযেল হলে ঃ ১ দিনে— ২৪০০০ ওহী ÷ ৭৩০০ দিন = প্রায় ৩.৩ টি ওহী প্রতিদিন নাযেল বা জিবরাইল (আঃ) এসেছিলেন। আবার—

যদি ২০ বছরে বা ৭,৩০০ দিনে ২৭,০০০ (হাজার) ওহী নাযেল হয়, তবে ১ দিনে— ২৭,০০০ ÷ ৭৩০০ দিন = প্রায় ৩.৭ টি ওহী প্রতিদিন নাযেল বা জিবরাইল (আঃ) এসেছিলেন।

২০ বছরে ২৪০০০ হাজার হারে প্রতি ওহীর সময় অন্তত ১০ মিনিট হলে × ৩.৩ = ৩০.৩ মিঃ

২০ বছরে ২৭০০০ হাজার হারে প্রতি ওহীর সময় অন্তত

১০ মিনিট হলে— ৩.৭ X ১০ = ৩০.৭০ প্রায় ৩১ মিঃ

(চান্দ্র বছর ৩৫৪ দিন ধরলে সময় আরো বাড়বে। চান্দ্র বছরই সঠিক এবং ইছলামে স্বীকৃত)।

(খৃষ্ট পূর্ব ১০০-৪৪) জুলিয়ান বা সৌর ও চান্দ্র ক্যালেন্ডারের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান আছে। ২৩৫ চান্দ্র মাসে, জুলিয়ানের মতে ৩৬৫ $^{১}/_{৪}$ দিনের বছরে ঠিক ১৯ বছর হয়। কিন্তু আমরা ৩৬৫ দিনে যে সৌর বছর হিসেব করি, তাও সঠিক হয় না। কারণ প্রতি চার বছর অন্তর অধিবর্ষ (৩৬৬ দিনের বছর) ধরে তা আবার সংশোধন করতে হয়। চান্দ্র মাসের ক্ষেত্রে এ-গরমিল দেখা দেয় ১৯ বছর পর পর। এই মেটোনিক চক্র, গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেটোনের নামানুসারে নাম করা হয়। তিনি চান্দ্র ও সৌর হিসেবের নির্দিষ্ট সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। কাজেই চান্দ্র মাসের মধ্যে গরমিল অনেক কম।)

২২। খাওয়া ও নাস্তা ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) মেহমান সহ খেতে বেশ আনন্দ পেতেন। সারা দিনে খাওয়া ও নাস্তার সময় অন্তত ..... ৫০ মিঃ

২৩। সালিস ও দরবার ঃ

সকাল ফজরের পর ও মাগরিবের পর সালিস, দরবার, সামাজিক, বিষয়াদি ও স্বপ্নের তাবির সহ (ফজরের পর নিজের ও সাহাবী সহ অন্যদের স্বপ্নের তাবির করতেন) এতে অন্তত... ৭৫ মিঃ

www.pathagar.com

২৪। দাওয়াত ও ওয়াজ নসিহত ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) দাওয়াতি কাজ, ওয়াজ নসিহত ও গোত্র প্রধানদের প্রতি চিঠি প্রেরণ প্রভৃতিতে অন্তত... ৯০ মিঃ

২৫। কুরআন তেলাওয়াত ঃ

হুজুর (সঃ) বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এতে অন্তত... ৪০ মিঃ

২৬। পরামর্শ ও জেহাদ ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) পরামর্শ ও জেহাদ পরিকল্পনায় অন্তত .. ৪০ মিঃ

২৭। জেহাদ প্রশিক্ষণ ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) জেহাদ প্রশিক্ষণ, তীর, বর্শা নিক্ষেপ, তরবারী চালনা, প্রভৃতি এবং দৌড় প্রতিযোগিতার প্রশিক্ষণ দিতেন। রাছুলে পাক (সঃ) নিজ বিবিদের সঙ্গেও দৌড় প্রতিযোগিতায় কোন সময় নিজে (কৌতুক করে) হারতেন, আবার কোন সময় বিবিরা হারতেন। এসব প্রশিক্ষণে অন্তত ..... ৫০ মিঃ

২৮। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপে অন্তত .... ৫০ মিঃ

২৯। শিশুদের সঙ্গে কৌতুক ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) শিশুদের সঙ্গে স্নেহ-মমতা মাখা আলাপ, গল্প, কৌতুক করতেন।

এতে অন্তত..... ২০ মিঃ

৩০। অতিথি সেবা ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) অতিথি সেবায় ছিলেন, সর্বোত্তম। এক অতিথি বেশী করে খেয়ে, বিছানায় পেশাব -পায়খানা করে, ভুলে তরবারি রেখে পালিয়ে যায়। সকালে রছুলুল্লাহ (সঃ) অতিথির মল-মুত্র নিজ হাতে ছাপ করে, আফছুছ করতে করতে বলেন, আহা! আমার মেহমান সারা রাত কতনা কষ্ট করে অসুস্থ্যতার জন্য বেখেয়ালে তার

www.pathagar.com

তরবারিও রেখে গেছে। পরে তাকে তার তরবারি ফেরত দিয়ে, তার কাছে মাপ চায় এবং সে মুছালমান হয়। অতিথি সেবায় অন্তত -১৫ মিঃ

৩১। রোগী দেখা-শুনা ঃ

রোগী দেখা-শুনার অন্তত .... ২০ মিঃ

৩২। বাজার খরচ ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) নিজেও বাজার খরচ করতেন। এতে অন্তত- ২৫ মিঃ

৩৩। বিবিদের সাহায্য ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) বিবিদের ঘরের কাজেও সহায়তা করতেন— ঘর ঝাড়ু তরকারি প্রস্তুত করা, ঘরের আসবাব পত্র গোছানো প্রভৃতি কাজে অন্তত..... ২০মিঃ

৩৪। তাহাজ্জুদ ঃ

তাহাজ্জুদ নামাজ সম্বন্ধে কুরআন পাকের ভাষায় সব চাইতে কম সময় ধরলে হয়, ১/৩ অংশ। যদি রাতের অংশ ১১ ঘন্টা হয়, তবে ১/৩ অংশে ৩ ঘন্টা ৪০ মিনিট হয়। তাহতে ধরা হলো মাত্র- ৩০ মিঃ

(তাহাজ্জুদের বিস্তারিত বিষয়, এ গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায় তাহাজ্জাদ নামাজের সময় দ্রঃ)।

৩৫। রাতের অন্যান্য নামাজ ঃ

হুজুরে পাক (সঃ) রাতের বেলায় বেশী বেশী নফল নামাজ, এস্তেগফার প্রভৃতি করতেন। এত বেশী সময় ধরে নফল নামাজ পড়তেন যে, তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। রাতের নফল নামাজ ও অন্যান্য তছবিহ তাহলিলের সময় অন্তত ..... ১৫০ মিঃ

(বিঃ দ্রঃ এবাদত ঃ মাঠে-ময়দানে, কলে-কারখানায়, হাটে-বাজারে, লেন-দেনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, আমাদের দৈহিক ও মানসিক কার্যাবলী আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ মত হচ্ছে কিনা তার জেকের করে (স্মরণ করে), সেরূপ কাজ করার মানি এবাদাত। আর অবসর সময়ে আত্মশুদ্ধির জন্য তছবিহ তাহলিল পড়াও আল্লাহর জেকির বা স্মরণ। সাধারণতঃ জিক্‌রুন অর্থঃ সদা-উচ্চারিত, বাক্য,

www.pathagar.com

স্মরণ, সুনাম, উচ্চতা, দোআ', দিনি তথ্য বিষয়ক পুস্তক। পবিত্র কুরআনে এই 'জেকের' শব্দ বহু বার ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং, অবসর সময়ে যেসব তছবিহ তাহলিল জেকের আজকার করা হয় তার চাইতে বেশী জরুরি হালাল রুজির জন্য দৈহিক ও মানসিক কার্যক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ নির্দেশ মত কাজ করা— অন্যথায় কোন আমলই আল্লাহর শরিয়াত সম্মত নয়।

৩৬। রছুলে পাক (সঃ) ঘুম কমই যেতেন। নবীদের ঘুম বা স্বপ্নও সত্য।

৩৭। মেরাজ

মেরাজ (প্রথম খন্ডে ৬ষ্ঠ অধ্যায় মেরাজ দেখুন) ৩৩৩ বছর, ৪ দিন দুনিয়ার হিসেবে বা অলৌকিক হিসেবে কোন মতেই এর সঠিক সময় আলেমুল গায়েব ছাড়া কেউই জানেন না।

সময়ের এ মূল্যায়নে, ঘুম, রাত যাপন, জানাজা প্রভৃতি ধরা হয় নাই। এয়া আল্লাহ! এ গুনাগারকে আমল করার তৌফিক দিন। ভুল হলে মাপ করুন। আমিন।

রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর সময়ের মূল্যায়ন - ২

মূল্য (মানি—পণ, প্রতিজ্ঞা, দাম, বেতন, ভাতা প্রভৃতি) এবং অয়ন (মানি—স্থান, পথ, সূর্যের উত্তরে ২৩.৫° ডিগ্রী) গমন বা উত্তরায়ন এবং দক্ষিণে ২৩.৫° ডিগ্রী গমন বা দক্ষিণায়ন। মূল্য + অয়ন = মূল্যায়ন।

রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর সময়ের দাম বা মূল্য কত এবং রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর সময়ের গতি বেগ কত ছিল। কত গতি বা দ্রুত নামাজ, রোজা, অজু-গোছল, তায়াম্মমাদি, ফরজ, ওয়াজিব, ছুন্নাত, নফল, মুস্তাহাবাদি আদায় করেছেন, তাসবের সময়ের হিসেব বর্তমান সময়ের মত ঘন্টা, মিনিট, সেকেণ্ডে কোথাও দেয়া নাই।

কোন্ কোন্ নিয়মে হুজুর (সঃ) অজু, গোছল, নামাজ, রোজা, কথা-বার্তা, মেহমানদারী, সেবা, প্রভৃতি করতেন, তার প্রতিটি বিষয়ের বিশদ বিবরণ লেখে রাখা আছে এবং তিনি তাঁর সাহাবা কেরামদেরকে হাতে নাতে যেভাবে শিখায়েছেন, রছুলুল্লাহ (সঃ) নিজে যেভাবে করেছেন এবং সাহাবা কেরামগণ রছুলুল্লাহকে (সঃ) যেভাবে

www.pathagar.com

করতে দেখেছেন এবং তারা নিজেরা যাযা করেছেন, তা সব অবিকল লেখা রয়েছে। এসব নির্ভুল, নির্ভেজালভাবে পবিত্র কুরআন, হাদিস, উছুল, ফেকা, এজমা, কেয়াছ প্রভৃতি বিভিন্ন কিতাবে বিস্তারিত লেখা রয়েছে।

সারা দুনিয়াতে ইছলামের মূলনীতি ঃ কলেমা, নামাজ, জেহাদ, রোজা, জাকাত ও হজ্ব সম্বন্ধে দেড়শ কোটি মুছালমানের কেউই অস্বীকার করে না। যদিও কোন কোন জয়িফ হাদিস, উছুল, ফেকা, এজমা, কেয়াছে, কার কার মত পার্থক্য রয়েছে, তবুও পবিত্র কুরআনের একটি হরকত (আকার-ইকার) নিয়েও কোন মতবিরোধ নাই। দুনিয়াতে এমন ধর্মালম্বীও রয়েছে, যাদের পরিবারে, যে কয়জন সদস্য থাকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পূজ্য দেবতাও সে কয়জন থাকে।

এখানে প্রদত্ত তালিকায় ৩৬ নম্বরে ঘুম এবং ৩৭ নম্বরে মেরাজ বাদে বাকী ৩৫ টি বিষয়ের উপর রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর এক দিনের সময়ের মূল্যায়ন করেছি। এ মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব মূল্যায়ন। এ ধরনের মূল্যায়ন পবিত্র কুরআন, হাদিসে কোথাও পাই নাই। অন্য কোন কেতাবে আছে কিনা জানা নাই। না থাকারই যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড -এর হিসেব দুনিয়ার উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু সর্বত্র এক নয়, স্থানীয় সময়, আর প্রমাণ সময় ও (Local time and Standard time) এক নয়।

সূর্যের আলোর ছায়া ধরে নামাজের যে সময় ধরা হয় তাই সঠিক। দুনিয়ার সর্বত্রই ২৪ ঘন্টা পরে হউক, আর ৬ মাস পরে (মেরু অঞ্চলে) হউক সূর্য দেখা যাবেই।

সূর্য অন্তত ১ বিগত বা সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়লে অথবা নিজের ছায়া পূর্ব দিকে পড়া শুরু করলে জোহর ওয়াক্ত, নিজের ছায়া দ্বিগুণের পর হতে আছর শুরু, সূর্যাস্তের পর মাগরিব ইত্যাদি সময় দুনিয়ার সকল স্থানের জন্য সমান। তবে প্রমাণ সময় ধরে আজকাল নমাজ রোজার চিরস্থায়ী সময় নির্ধারিত হয়েছে এবং তাই অনুসরণ করা হয়।

আমাদের উত্তম আদর্শ একমাত্র রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর সময় কিভাবে ব্যয়িত হয়েছে, এবং তিনি সময়কে কত বেশি গুরুত্ব সহকারে ব্যয় করেছেন। তিনি তাঁর সময়ের অপব্যবহার করেছেন

www.pathagar.com

কিনা? আর আমরা তাঁর ওম্মতেরা তাঁর অনুসারীর দাবীদার হয়ে, আমাদের সময়ের অবমূল্যায়ন, অপব্যবহার করছি কিনা, যদি করে থাকি, তাহলে আমরা রছুলুল্লাহ (সঃ) -এর ওম্মত হওয়ার যে দাবী করছি, তার সার্থকতা কতটুকু তা বিবেচনা করে, পথান্বেষণ করার উদ্দেশ্যে এবং মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ) কে অনুসরণ করে পথ চলা এবং সংযত কথাও কাজের জন্যই আমার এই প্রয়াস।

আজ আমাদের মধ্যে আমাদের উত্তম আদর্শ বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ) নেই। একমাত্র আল্লাহর পেয়ারা বান্দা ছাড়া দুনিয়া (স্বপ্নে) ও আখেরাতে তাঁকে দেখার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু তিনি আমাদের কাছে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে তাঁর জীবন চরিত চির ভাস্বর করে রেখে গেছেন। কারণ পবিত্র কুরআন ও হাদিসে যা আছে, তাঁর জীবন চরিত্রেও তা-ই ছিল। অর্থাৎ, যেই কুরআন-হাদিস সেই রছুল (সঃ)-যেই রছুল (সঃ) সেই কুরআন-হাদিস। [গ্রন্থকার]

আমাদের ১ দিনে ১৪৪০ মিনিট হয়। আর রছুলুল্লাহর ১ দিনের মাত্র ৩৫টি বিষয়ের এবাদতের সময় দেখা যায় ১৪৯১ মিনিট।

অতএব, ১৪৯১ মিঃ - ১৪৪০ মিঃ = ৫১ মিঃ বা প্রায় ১ ঘন্টা সময় বেশী। যেখানে সময়ের বা হয়াতের ১ সেকেন্ড বাড়াবার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন জিন-এনছানের নাই, সেখানে মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (সঃ) ৫১ মিনিট বা প্রায় ১ ঘন্টা কি করে বাড়ালেন। এতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, সময়ের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুর আলামিনের ইচ্ছায়, কার সময় বা হয়াত বাড়ে; আর কার হয়াত বা সময় কমে।

এত কেবল ৩৫ টি বিষয়ের এবাদতের একেবারে কম কম সময় দেখানো হয়েছে। রছুলুল্লাহ (সঃ) ২৬টি জেহাদ করেছেন। কার কার মতে কিছু কম বা বেশী। ২৬টি জেহাদে নিজেই অংশ নিয়ে পরিচালনা করেছেন। জেহাদের জন্য মোজাহিদ সংগ্রহ, রসদ সংগ্রহ, অস্ত্র ও উট, ঘোড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করা ২/১ ঘন্টা সময়ের ব্যাপার নয়।

কোন কোন জেহাদে ২/৪ মাসও জড়িয়ে থাকতে হয়। আরবের মোশরেকদের হাতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইছলামকে রক্ষার জন্য দিন-ইছলামের মহাসংস্কারক (রছুলুল্লাহ সঃ দিন-ইছলামের প্রবর্তক ছিলেন

www.pathagar.com

না) বিশ্ব নবী রছুলে করিম (সঃ) তাঁর মদনী জীবনের শুরুতে যে বদর নামক স্থানে দিন-ইছলামের জেহাদ হয়, তার প্রস্তুতির জন্য ঘন্টা, মিনিট নয়, মাসাধিক সময় লেগে ছিল। এতে মামুলি ও নগণ্য সমর সরঞ্জাম-সহ মাত্র ৩১৩ জন অত্যন্ত অদক্ষ আনছার ও মোজাহিদ, দুর্দান্ত প্রতাপ-প্রভাব ও ক্ষমতাধর বিপুল অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত এবং প্রচুর রসদ এবং ১০০০ সুদক্ষ সৈন্যের নায়ক আবু জেহেলের মোকাবেলা করেন। প্রথমে আরবের প্রাচীন রেওয়াজ অনুসারে হযরতের নির্দেশ মত, হযরত আমীর হামজা, হযরত আলী ও হযরত আবু ওবায়দার সংগে কুরাইশদের নেতা ওতবা, শায়বা ও ওয়ালিদ-বিন-ওতবার সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ হয়। এতে কোরায়েশ পক্ষ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এর আগে হযরত আব্দুল্লাহর ভুলে নিষিদ্ধ মাসে নাখলা নামক স্থানে একটি খন্ড জেহাদও হয়। এজন্য রছুলুল্লাহ (সঃ) আব্দুল্লাহকে তিরস্কার করেন। এই নাখলার পরেই (কার কার মতে নাখলার খন্ড জেহাদের জন্যই বদর জেহাদ হয়) আবুজেহেলের সুদক্ষ ও সুসজ্জিত ১০০০ সৈন্যের সঙ্গে মাত্র উক্ত ৩১৩ জন অদক্ষ মোজাহিদ ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে, আবু জাহেলের দক্ষ ১০০০ সৈন্যের মোকাবেলা করে অপ্রত্যাশিতভাবে বিজয়ী হন। এতে ৭০ জন কুরাইশ নিহত হয় এবং মাত্র ১৪ জন বদর মোজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। এটা একটা ছোট জেহাদের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে বুঝা যায়, জেহাদে কত সময় ব্যয় করতে হয়। আরো বড় জেহাদে আরো বেশী সময় রছুলে পাক (সঃ) ব্যয় করেছেন। ২৬টি গাজওয়া জেহাদ, রছুলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং ব্যবস্থা ও পরিচালনা করেছেন এবং কমছেকম ৪৫টি ছারিয়ার ব্যবস্থাপক উপদেষ্টা ছিলেন। অত সময় তিনি পেলেন কোথায়?

তারপর ২৪,০০০ হাজার হতে ২৭,০০০ হাজার ওহীর ভার বয়েছেন। প্রতি ওহীত ১ মিনিট হলেও হয় ১৬ দিন ১৮ ঘন্টা, না হয় ১৮ দিন ১৬ ঘন্টা। এ সময় তাঁকে যে দিয়েছেন, তিনি কি হয়াত মউতের মালিক নন? এই কয়েকটি বিষয়ে সময়ের দৃষ্টান্ত অতি সংক্ষেপে পাঠক-পাঠিকাদের সামনে পেশ করলাম— আত্ম সমালোচনার জন্য।

রছুলে করিম (সঃ) তাঁর ২৩ বছর নবুয়াতি জিন্দিগীতে ২৬টি গাজওয়া জেহাদ, যাতে তিনি স্বয়ং সম্মুখ জেহাদে অংশ নিয়েছেন এবং

www.pathagar.com

৪৫টি ছারিয়া জেহাদ (যাতে তিনি অপ্রত্যক্ষভাবে উপদেষ্টা পরিচালক ছিলেন) এবং ২৪,০০০ হাজার হতে ২৭,০০০ ওহীর ভার বহন করেছেন। নবুয়াতি জিন্দিগীর মক্কি জীবনের অকথ্য, অসহনীয় ঘাত-প্রতিঘাত, মক্কার মোশরেকদের উৎপীড়ন, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন ও নির্বাসন উপেক্ষা করে দিন-ইছলামের প্রচার, প্রতিপালন এবং সর্বোপরি দুনিয়া জোড়া প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবন যাপন করা, পারিবারিক ও দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ মোতাবেক এবাদত ও আমল করার জন্য যে সময় ব্যয় করেছেন, তা যে কোন সাধারণ মানুষকে শুধু ২৩ বছর নয়, ২৩০০০ হাজার বছর সময় দিলেও সম্ভব হত না।

তিনি আমাদের মত মানুষ ছিলেন না। তিনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর নেয়ামত পাওয়ার জন্য সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শক, শেষ মহানবী ও দিন ইছলামের মহাসংস্কারক ছিলেন।

এখন আসুন, মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ সম্বন্ধে চিন্তা করি, গবেষণা করি। যতবেশী তাঁর আমল-আখলাক, স্বভাব-চরিত্র, আদেশ-নির্দেশ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করব, তত বেশী আমরা দুনিয়া-আখেরাতের কামিয়াবি হাছিল করতে পারব।

"তারা কি ভেবে (চিন্তা, গবেষণা করে) দেখেনা যে, তাদের সহচর (মোহাম্মদ সঃ) কোন প্রকার বিকৃতমনা নয়; বরং তিনি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক।

৯ পারা ৭ আরাফ, ১৮৪ আয়াত।

রছুলুল্লাহকে (সঃ) অনুসরণ না করে জ্ঞান বিজ্ঞান, দুনিয়া-আখেরাতে কোন কামিয়াবি বা উপায় নেই।

"এবং (আল্লাহ বলেন) তোমাদের মধ্যে যে, আল্লাহ ও তাঁর রছুলের অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে, আমি তাকে তার দ্বিগুণ দান করব এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক জীবিকা তৈয়ার করে রেখেছি।"

২২ পারা, ৩৩ ছুরা আহজাব, ৩১ আয়াত।

"হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহ ও রছুলের অনুগত হও এবং তোমাদের কৃতকার্যগুলো ব্যর্থ কইর না।"

২৬ পারা, ৪৭ ছুরা মোহাম্মদ, ৩৩ আয়াত।

www.pathagar.com

"তুমি বল, "তোমরা আল্লাহ ও রছুলের অনুসরণ কর ....."
৩ পারা, ৩ ছুরা ইমরান, ৩২ আয়াতাংশ।

আসুন, আমরা রছুলুল্লাহর কাজ কর্ম, আচার-ব্যবহার, আমল-আখলাক, সময়ানুবর্তিতা, পারিবারিক, সাংসারিক ও সামাজিক প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করি এবং আমল করার চেষ্টা করি। তাহলে অন্তত কিছুটা হলেও জিন্দিগী-বন্দেগীতে কামিয়াবী হাসিল করতে পারব বলে বিশ্বাস করতে পারি। আমিন।

তাহাজ্জুদ নামাজের সময়

তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার সুস্পষ্ট হুকুম রয়েছে, পবিত্র কুরআনের ছুরা মোয্যাম্মেল ও ছুরা বনিইছরাইলে। কিন্তু এ ছুরা দ্বয়ের শানে নজুল বা তফছিরে এ ছুরা দ্বয় কিংবা তাহাজ্জুদ সম্পর্কিত আয়াতাবলী নাযিলের সুনির্দিষ্ট কোন দিন-তারিখ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ বিছক্ষণ তফছিরকারদের মতে এছুরা দুটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং অতি প্রাথমিক ওহীর অর্ন্তগত।

তাহাজ্জুদ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, "রাতের অর্ধেক ১/২ কিংবা তা অপেক্ষা কিছু কম ১/৩, কিংবা অর্ধেকের বেশী ২/৩ এবং ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন আবৃত্তি কর, শীঘ্রই আমি তোমার উপর ওহীর গুরুভার পাঠাব। নিশ্চয় রাতে উঠে নামাজ পড়া আত্মসংযম ও বাক্য সংশোধন করা হয়। এতে সহজে কুরআন বুঝা যায় এবং পড়ার জন্য অতি উত্তম সময়।"

২৯ পারা ৭৩ ছুরা মুজাম্মিল ৩-৬ আয়াত।

এবং রাতের একাংশে (রাতের অপর অংশে— ফজর নমাজের পূর্ব পর্যন্ত) তাহাজ্জুদ (নামাজ) পড়া, যা তোমার জন্য অতিরিক্ত। আশা করা যায়, অতি সত্তর তোমার প্রতিপালক তোমাকে অতি প্রশংসিত স্থানে উন্নিত করবেন।

১৫ পারা ১৭ ছুরা বনিইছরাইল ৭৯ আয়াত

উক্ত ৭৩ ছুরা মোয্যাম্মেল ৫ আয়াত আল্লাহ তার প্রিয় হাবিবকে সম্বোধন করে বলেছেন, "আমি তোমার কাছে ভারি দায়িত্ব পূর্ন, অনেক বেশী ওজনের গুরু (আদেশ) বাক্য পাঠাব" এ আয়াতে দুটি বিষয় প্রকাশ পায় ঃ

www.pathagar.com

১। রছুলুল্লাহর কাছে এখনও নবুয়াতির দায়িত্ব দেয়া হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে দেয়া হবে। এতে অনুমিত হয়, এটা নবুয়াত পাওয়ার আগের ওহী। বলা হয়েছে,"ছানুল কি" অতিসত্তর পাঠাব। অদুর ভবিষ্যতকাল বুঝায়।

২। আল্লাহর ওহী বা কুরআনের গুরুত্ব বা ভারিত্ব সম্পর্কে বর্নিত হয়েছে। আল্লাহর ওহী বাক্যের গুরুত্ব বা ভারিত্ব ও ওজন কত, উপমা ছাড়া দাঁড়ি পাল্লা বা বাটখারা দিয়ে মাপার মত বস্তু নয়।

আল্লাহ তাঁর ওহীর বা বাক্যের ভারিত্ব বা ওজন এভাবে প্রকাশ করেছেন। আমি যদি কুরআনকে (ওহীকে) কোন পর্বতের উপর নাযেল করতাম, তবে তুমি (হে মোহাম্মদ) নিশ্চয় ওকে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ন ও অবনত দেখতে পেতে এবং এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করছি, যাতে করে তারা চিন্তা করে ও কুরআনের (ওহীর ভারিত্ব ও ওজন) মর্যাদা বুঝতে পারে।

২৮ পারা ৫৯ ছুরা হাশর ২১ আয়াত

যা হউক, তাহাজ্জুদ নামাজ অবস্থা ও পাত্র ভেদে ফরজ, ওয়াজিব, ছুন্নত বা নফল হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে বিশেষভাবে রছুল্লাহ (সঃ) নবুয়াত পাওয়ার আগেও, তিনি হিরা পর্বত গুহায় আল্লাহর দরবারে সত্যের অন্বেষণে ধ্যান করতেন।

নবুয়াতের আগে রছুলুল্লহ, মুসা (আঃ) -এর, না ঈসার (আঃ)-এর শরিয়াত অনুসরণ করতেন তার সঠিক তথ্য আমার হাতে নাই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ অনুযায়ী চলেছেন। এটা সুনিশ্চিত যে, রছুলুল্লাহর আগে এবং তাঁর মক্কি জীবনে মক্কাবাসীর প্রায় সবাই মূর্তিপূজা ও অন্যান্য ঘৃণ্য-জঘন্য কদাচার, লাম্পট্টপনা, মদ প্রভৃতি পাপাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল; কিন্তু রছুলুল্লাহ জীবনে কখনও এসব পাপাচারে জড়িত ছিলেন না। অন্য কোন পাপাচার বা অন্যায় কাজে জড়িত ছিলেন বলে, তাঁর চরম দুশমনেও প্রমাণ করতে পারে নাই। বরং আরবের আইয়ামে জাহেলিয়াতের জমানায়, শত্রু-মিত্র সকল মক্কাবাসীর কাছে বিশ্বাসী (আল-আমিন) ছিলেন।

তদানিন্তন মক্কাবাসীরা মূর্তি পূজক ছিল বটে, তবে তারা মনে হয়, অবচেতন ভাবে আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করত, যেহেতু তাদের নাম করনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে তা ধরা পড়ে। আব্দুল্লাহ মানি

www.pathagar.com

আল্লাহর দাস ঃ নামটাই তার প্রকৃষ্ট উদাহারণ। রছুলুল্লাহর আগে যদি আরবের মোশরেকদের আল্লাহ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকত, তবে আল্লাহর দাস হবার অথবা আদুরে ছেলেকে আল্লাহর দাস এবং মেয়েকে বিশ্বাসিনী বানাবার অভিলাশ হল কি করে? তবে ৩৬০টি মূর্তি ও তাদের সর্দার লাত, মানাত, ওজ্জাত ও নছর প্রভৃতির পূজাও ছিল।

রছুলুল্লাহ (সঃ) শিশু কাল হতে শুরু করে তাঁর ওফাত পর্যন্ত কক্ষণও কোন মূর্তি বা কল্পিতদেব দেবীর পূজা বা অন্য কোন অন্যায় কাজ করেন নাই। এটা তার চরম দুশমন বা বিরোধীরাও স্বীকার করেছে এবং করছে। এটা সুস্পষ্ট যে, রছুলুল্লাহ তাঁর নবুয়াতের আগেও হেরা গুহায় ১৫ বছর যাবৎ এক আল্লাহর দরবারে শাশ্বত সত্যের অন্বেষণে মাঝে মাঝে ধ্যানে রত থাকতেন।

উপরের আলোচনা হতে প্রতিভাত হয় যে, রছুলুল্লাহ (সঃ) নবুয়াত প্রাপ্তির শুরু হতে, তিনি তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেছেন। কারণ তাহাজ্জুদ নামাজ সম্বন্ধীয় ছুরা মোয়যাম্মেল মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ের বলে বিচক্ষন তফছিরকারগণ দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন।

২৯ পারা ৭৩ ছুরা মোয্যাম্মেল শেষ ২০ আয়াতের শুরুতে রছুলুল্লাহ এবং তাঁর সাহাবীগণ রাত্রে কতক্ষণ তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন তার উল্লেখ রয়েছে। তাতে দেখা যায়, তোমরা (রছুলুল্লাহ ও সাহাবাগণ) কখনও রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ২/৩, অর্ধাংশ ১/২ , এক তৃতীয়াংশ ১/৩ , দন্ডায়মান থাক।

স্থানীয় সময় অনুসারে দেখা যায় ঃ

রাতের ১/২ অংশ = ৫.৩০ মিনিট, যদি রাত ১১ ঘন্টা ধরা হয়।

২/৩ = ৭.২০ মিনিট

১/৩ = ৩.৪০ মিনিট

৩ অংশের গড় = ৩)১৫.৯০(৫.৩০ মিঃ) (আমি ৩ ঘন্টা ধরেছি)

সুতরাং, ৫.৩০ মিনিটের স্থলে গড়ে ৩ ঘন্টা, রছুলুল্লাহ (সঃ) রাতের তাহাজ্জুদ ও নফল ইত্যাদির জন্য ব্যয় করেছেন। হাদিস সমূহ হতে জানা যায়— রহমাতুল্লাহ (সঃ) অতদীর্ঘ সময় পর্যন্ত নফল

www.pathagar.com

নামাজ পড়তেন যে, তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত। তাই এটা বিশ্বাস হয় যে, রসুলুল্লাহ প্রতি রাত গড়ে ঘুম সহ কমছে কম (চার) ঘন্টা নফল সহ তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন। একবার তাঁর সাহাবাগণ রছুলুল্লাহর (সঃ) কাছে সবিনয় নিবেদন করলেন—আপনি আল্লাহর অনুগৃহীত নবী এবং নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক রছুলুল্লাহ। আপনি রাতে তাহাজ্জুদ বা নফল নামাজের জন্য অত কষ্ট করেন কেন? হুজুরে পাক সঃ ফরমাইলেন, "আমি কি আমার রবের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব না? আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞ দাস হতে চেষ্টা করব না"? — সহি তির মিজি।

সহি হাদিস সমূহে আছে যে, রছুলুল্লাহ রাত দ্বিপ্ররের পরে উঠে অজু করতেন এবং দুই রাকাত বা চার রাকাত করে ভোর পর্যন্ত নমাজ পড়তেন এবং সবশেষে তিন রাকাত বেতের পড়তেন।

এসব হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, রছুলুল্লাহ কমছে কম ঘুম সহ ৪ ঘন্টা রাত্রির নমাজ পড়তেন। আমি বিশ্বনাবী রহমাতুল্লিল আলামিনের রাতের ঘুম সহ তাহাজ্জুদ ও নফল এবাদতের সময় নিয়েছি, মাত্র দুনিয়াবি হিসেবের ৩ ঘন্টা বা ১৮০ মিনিট।

ওয়া সল্লাল্লাহু তা-আলা আলা খাইরে খালকিহি ওয়া আলিহি, ওয়া আজওয়াজিহি, ওয়া আহলে বাইতেহি ওয়া আস হাবিহি ওয়া ছাল্লাম।

হে আল্লাহ! সমস্ত পবিত্রতা তোমার জন্যই, তোমার জানা সত্ত্বেও সহ্য কর।

হে আল্লাহ! সমস্ত পবিত্রতা তোমার জন্যই, তোমার শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা কর।

সময়ের এ মূল্যায়নে ঘুম, রাত-যাপন, জানাজা প্রভৃতি ধরা হয় নাই।

ইয়া আল্লাহ! তোমার ও তোমার পেয়ারা হাবিব মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ (দঃ) -এর তাবেদারীর তওফিক দাও। আমিন।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায় ঃ বিশ্ব নবীর প্রয়োজন

বিশ্ব নবীর প্রয়োজন

আল্লাহ্ নিরাকার। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না, কাহারও দ্বারা তিনি জাতও নহেন ; তিনি এক, অথচ সৃষ্টি বহু ও বিচিত্র। স্রষ্টা নিরাকার, অথচ সৃষ্টি সাকার।

কেমন করিয়া অরূপ হইতে রূপে, নিরাকার হইতে সাকারে পৌঁছা যায়? এপারে-ওপারে কি করিয়া সংযোগ রাখা সম্ভব হয়?

একজন বাহন বা medium-এর এখানে নিতান্ত প্রয়োজন। খেয়াতরীর মাঝির মতন এপারে-ওপারে সে পারাপার করে।

এই মাধ্যমই হইতেছেন হযরত মোহাম্মদ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে তিনি মিলনসূত্র। একদিকে যেমন তিনি আল্লার প্রতিনিধি, অপরদিকে তেমনই তিনি আমাদেরও প্রতিনিধি। একদিকে তিনি আল্লার বাণী বহন করিয়া আনিয়া সৃষ্টির প্রাণের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দেন, অপরদিকে তেমনি সৃষ্টির ব্যথা-বেদনা ও অভাব-অভিযোগ আল্লার দরবারে পেশ করেন। কাজেই তাঁহাকে লইয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টি—উভয়েরই এত প্রয়োজন।

কুরআন শরীফে তাই বলা হইয়াছে ঃ

হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লার প্রেরিত রসুল।

অন্যত্র তেমনি বলা হইয়াছে ঃ

বল, হে মোহাম্মদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মানুষ যার উপর ওহী-নাজিল হয়।

এখানে দুই দিক হইতে হযরত মোহাম্মদের পরিচয় আমরা পাইতেছি। আল্লার তরফ হইতে তিনি তাঁহার প্রেরিত রসুল। আবার তিনি মানুষের মধ্যে ওহী প্রাপ্ত হওয়া মানুষ।

কাজেই দেখা যাইতেছে, হযরত মোহাম্মদ শুধু মানুষও নন, শুধু অতিমানুষও নন ঃ দুইয়েরই তিনি মিলিত রূপ।

হযরত মোহাম্মদকে দেখিতে ও চিনিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিকোণকে প্রথম হইতে এই ভঙ্গিতেই বাঁধিয়া লইতে হইবে। অন্যথায় আমরা তাঁহার সাচ্চা চেহারা দেখিতে পাই না।

www.pathagar.com

(হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন) সর্বপ্রথমেই আল্লাহ যাহা সৃষ্টি করেন তাহা আমার নূর।

এই নূরে-মোহাম্মদীই হইতেছেন প্রথম সৃষ্টি। কাজেই একথা অনায়াসে বলা যায় যে, হযরত মোহাম্মদ তাঁহার জন্মের পূর্বেই জন্মিয়াছিলেন। সারা সৃষ্টি তাঁহার নূরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। চাঁদে-চাঁদে তারায়-তারায় গ্রহে-গ্রহে লোকে-লোকে তাঁহার ধ্যানমূর্তি একটা জ্যোতির্ময় ছায়া ফেলিয়াছিল। বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর জুড়িয়া তাই এক পরম কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল ঃ কোথায় কবে কোনখানে কিভাবে নিখিলের এই চিরসুন্দর সৃষ্টি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবে।

'মোহাম্মদ' আসিবেন একথা তাই বিশ্ব-নিখিলের অবিদিত ছিল না। সৃষ্টির অপূর্ণতার বেদনার মধ্যেই তাঁর ধ্যানমূর্তি জাগিয়া ছিল। হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত মুসা, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ঈসা প্রভৃতি পূর্ববর্তী যাবতীয় পয়গম্বর ও তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই তাই জানিতেন যে, সেই নিশ্চিত অনাগত একদিন আসিবে; তাই তাঁহারা প্রত্যেকেই হযরত মোহাম্মদের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। বেদ-পুরাণ, জিন্দাবেস্তা দিঘা-নিকায়া, তাওরাৎ, জবুর, বাইবেল প্রভৃতি পুরাকালীন প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থেই তাই মোহাম্মদের গুণগান ও তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিঘোষিত হইয়াছে।

বেদ-পুরাণ প্রভৃতিতে নুর নবী

বেদ-পুরাণ এবং উপনিষদ হিন্দুদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এইসব প্রাচীন ধর্ম-শাস্ত্রে 'আল্লা' 'রসুল' ইত্যাদি শব্দ কিরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে দেখুন ঃ

অথর্ববেদীয় উপনিষদে আছে ঃ
অস্য ইল্ললে মিত্রাবরুণ্যে রাজা
তস্মাৎ তানি দিব্যানি পুনস্তং দুধ্যু
হবয়ামি মিলং কবর ইল্ললাং
অল্লোরহসুলমহমদরকং
বরস্য অল্ল্যে অল্লাম ইল্লল্লেতি ইল্লল্লা ॥৯॥
ভবিষ্য পুরাণে আছে ঃ

www.pathagar.com

এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিতঃ
মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখাসমন্বিতঃ ॥৫॥
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থলনিবাসিনম্
গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্যসমন্বিতৈঃ
চন্দনাদিভিরভ্যর্চ তুষ্টাব মনসা হরম্ ॥৬॥
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থলনিবাসিনে
ত্রিপুরাসুরনাশায় বহুমায়াপ্রবর্তিনে ॥৭॥
ভোজরাজ উবাচ-
ম্লেচ্ছৈগুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
ত্বং মাং হি কিঙ্করং বিদ্ধি শরনার্থমূপাগতম্ ॥৮॥

ভাবার্থ ঃ ঠিক সেই সময় 'মহামদ' নামক এক ব্যক্তি যাহার বাস 'মরুস্থলে' (আরব দেশে)—আপন সাঙ্গোপাঙ্গ সহ আবির্ভূত হইবেন। হে আরবের প্রভু, হে জগদ্‌গুরু, তোমার প্রতি আমার স্তুতিবাদ। তুমি জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করিবার বহু উপায় জান, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ! আমি তোমার দাস; আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও। 'অল্লোপনিষদের' একটি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় ঃ

হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রাঃ।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মণ অল্লাম॥
আল্লাহ্ রসুলমহমদরকং বরস্য অল্লো অল্লাম!
আদল্লাবুকমে ককম অল্লাবুক নিখাতকম ॥৩॥

ভাবার্থ ঃ আল্লা সকল গুণের অধিকারী। তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মোহাম্মদ আল্লার রসুল। আল্লা আলোকময়, অক্ষয়, এক, চিরপরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভূ।

'অথর্ববেদে' উল্লেখিত হইয়াছে

ইদঃ জনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে॥
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চ কৌরম আরুশমেষু দঘহে ॥১॥

ভাবার্থ ঃ হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। 'প্রশংসিত জন' লোকদিগের মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন। আমরা পলাতককে ৬০,০৯০ জন শত্রুর মধ্যে পাইলাম।

বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দিঘা-নিকায়ায়' উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

www.pathagar.com

"মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলিয়া যাইবে, তখন আর একজন বুদ্ধ আসিবে, তাঁহার নাম 'মৈত্রিয়' (সংস্কৃত মৈত্রেয়) অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ।"

আমরা নিম্নে সিংহল হইতে প্রাপ্ত (from Ceylonese sources) একটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। তাহাতেও উপরোক্ত কথার সমর্থন আছে ঃ

"Ananda said to the Blessed One, 'Who shall teach us when shou art gone?"

And the Blessed One replied:

'I am not the first Buddha who came on the earth, nor shall I be the last. In one time another Buddha will arise in the world, a holy one, a supremely enlightened one, endowed with wisdom in conduct... He will proclaim a religious life, wholly perfect and pure such as I now proclaim...

Ananda said, 'How shall we know him?'

The Blessed One said, 'He will be known as Maitreya'.

-The Gospel of Buddha by Carus, 117-18

অর্থাৎ ঃ আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদিগকে উপদেশ দিবে?

বুদ্ধ বলিলেন ঃ আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসিবেন-আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত—তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করিবেন—।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে আমরা চিনিব কি করিয়া?

বুদ্ধ বলিলেন ঃ তাঁর নাম হইবে মৈত্রেয়।

এই 'শান্তি ও করুণার বুদ্ধ' (মৈত্রেয়) যে মোহাম্মদ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কুরআন শরীফে মোহাম্মদের ভিশেষণও অবিকল এইরূপই আছে। মোহাম্মদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ তিনি 'রহমতুল্লিল্ আলামিন্' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য মূর্ত করুণা ও আশীর্বাদ।

www.pathagar.com

পার্শী ধর্মশাস্ত্রে

পার্শী জাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দাবিস্তা' ও 'দসাতির'। জিন্দাবিস্তায় হযরত মোহাম্মদের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। এমন কি 'আহম্মদ' নামটি পর্যন্ত উল্লিখিত রহিয়াছে। আমরা মূল শ্লোক ও তাহার অনুবাদ দিলাম

"Noid te Ahmad dragoyeitim fram-raomi

Spetama Zarathustra yam dahmam vangnim afritim.

Yunad haka hahi humananghad hvakanghad

Hushyanthnad hudaenad."

-(Zend-Avesta, Part 1, Translated by

Max Muller, p. 260)

অর্থাৎ ঃ "আমি ঘোষণা করিতেছি, হে স্পিতাম জরশুষ্ট্র, পবিত্র আহ্মদ (ন্যায়বানদিগের আশীর্বাদ) নিশ্চয়ই আসিবেন যাঁহার নিকট হইতে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে।" 'দসাতির' গ্রন্থেও অনুরূপ আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। উহার সারমর্ম এইরূপ "

"যখন পার্শীরা নিজেদের ধর্ম ভুলিয়া গিয়া নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইবে, তখন আরবদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন-যাঁহার শিষ্যেরা পারশ্যদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারশিক জাতিকে পরাজিত করিবে। নিজেদের মন্দিরে অগ্নিপূজা না করিয়া তাহারা ইব্রাহিমের কা'বা-ঘরের দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিবে; সেই কা'বা প্রতিমা-মুক্ত হইবে। সেই মহাপুরুষের শিষ্যেরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হইবে।"

"তাঁহারা পারশ্য, মাদায়েন, তুস, বল্‌খ প্রভৃতি পারশিকদের যাবতীয় পবিত্র স্থান অধিকার করিবে। তাহাদের পয়গম্বর একজন বাগ্মী পুরুষ হইবেন এবং তিনি অনেক অদ্ভুত কথা বলিবেন।"

-Muhammad in World Scriptures.

(by A. Huq Vidyarthi, p. 47)

www.pathagar.com

তাওরাতে

ইহুদীদিগের ধর্মশাস্ত্র 'তাওরাতে' নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী আছে ঃ

"The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of they brethren, like unto me. Unto him ye shall hearken." — (Duet, 15; 18)

অর্থাৎ ঃ "তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে আমার (মুসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করিবেন; তাঁহার কথা তোমরা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে।"

অন্যত্র আছে ঃ

"I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him."

And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him."

-(Duet, 18; 18-19)

অর্থাৎ ঃ "(ঈশ্বর বলিতেছেন) আমি তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে তোমার (মুসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করিব এবং তাঁহার মুখে আমার বাণী প্রকাশ করিব। তিনি তোমাদিগকে আমি যাহা আদেশ করিব তাহাই শুনাইবেন। এবং ইহা অবশ্য ঘটিবে যে তাঁহার মুখ-নিঃসৃত আমার সেই বাণী যাহারা শুনিবে না, তাহাদিগকে আমি শুনিতে বাধ্য করিব।"

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখুন ঃ

"And this is the blessing wherewith Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death;

And he said, The Lord came from Sinai rose up from Seir unto them; he shined from mount Paran and he came with ten thousands of

www.pathagar.com

Saints; from his right hand went a fiery law for them."

-(Duet, 33 : 1-2)

অর্থাৎ ঃ "এবং ঈশ্বরের মনোনীত পুরুষ মুসা মৃত্যুর পূর্বে এই বলিয়া বনি-ঈস্‌রাইলদিগকে আশীর্বাদ করিলেন "

এবং তিনি বললেন ঃ প্রভু (মুসা) সিনাই পর্বত হইতে আসিলেন এবং সিয়ের (Seir) পর্বত হইতে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার (অর্থাৎ যিনি আসিবেন) জ্যোতিঃ ফারাণ পর্বত হইতে বিকীর্ণ হইল; তিনি দশ হাজার ভক্ত সঙ্গে আনিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে এক জীবন্ত আইনগ্রন্থ বাহির হইল।"

এই সমস্ত উক্তি যে একমাত্র হযরত মোহাম্মদ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, বিদগ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

বাইবেলে

হযরত মোহাম্মদের আবির্ভাব সম্বন্ধে বাইবেল হইতেও বহু প্রমাণ দেওয়া যায়। আমরা নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

যিশুখৃষ্টের সময়ে সাধু যোহন (St. John) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যখন সকলকে বাপ্তাইজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন জেরুজালেম হইতে ইহুদীরা কতিপয় পাদ্রীকে তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা আসিয়া যোহনকে যে কয়টি প্রশ্ন করেন এবং যোহন তাহার যে উত্তর দেন, তাহাতেই হযরত মোহাম্মদের আবির্ভাবের খবর পাওয়া যায়। বাইবেলে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

"And this is the record of John, when Jews sent priests and Laites from Jerusalem to ask him, who art thou? And he confessed and denied not-I am not the Christ, And they asked him what then? Art thou Elias? And he said, I am not, Art thou THAT PROPHET? And he answered No....

And they asked him and said unto him, why

www.pathagar.com

baptizest thou then, if thou be not the Christ, nor Elias, neither that prophet?

John answered them, I baptize with water, but there standeth one amongst you whom ye know not.

He it is who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose."

-(John. Chap. 1 : 19-27)

অর্থাৎ ঃ "যোহন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, যখন জেরুজালেম হইতে ইহুদীদের দ্বারা প্রেরিত কতিপয় পাদ্রী যোহানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? তখন যোহান স্বীকার করিলেন, আমি যিশুখৃষ্ট নহি। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস? তিনি বলিলেন, আমি ইলিয়াস নহি। আপনি তবে কি সেই নবী? যোহান উত্তর দিলেন, না।

তখন তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আপনি যিশুখৃষ্ট, ইলিয়াস, অথবা সেই নবী না হন, তবে কেন বাপ্তাইজ করিতেছেন?

যোহান উত্তর দিলেন, আমি পানি দ্বারা বাপ্তাইজ করি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আসিবেন যাঁহাকে তোমরা জান না।

তিনিই সেইজন যিনি আমার পরে আসিয়াও আমা অপেক্ষা সম্মানের অধিকারী হইবেন এবং আমি যাহার জুতার ফিতা খুলিবারও যোগ্য নহি।ঃ এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যিশুখৃষ্ট এবং ইলিয়াস ছাড়া তৃতীয় আর একজন নবী যে আসিবেন, সে কথা ইহুদীরা জানিত।

এই 'সেই নবী' যে একমাত্র হযরত মোহাম্মদই, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কারণ যিশুখৃষ্টের পরবর্তী পয়গম্বর (এবং সর্বশেষ পয়গম্বর)-ই হইতেছেন হযরত মোহাম্মদ।

যিশুখৃষ্ট নিজেও বলিয়াছেন ঃ

"If you love me, keep my commandments. And I will pray to the father and He shall give

www.pathagar.com

you another comforter that he may abide with you for ever."

-(John, Chap. 14 : 15-16)

অর্থাৎ ঃ "যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, তবে আমার উপদেশ মত কার্য করিও; আমি স্বর্গীয় পিতাব নিকট প্রার্থনা কবিব যাহাতে তিনি তোমাদিগকে আর একজন শান্তিদাতা প্রেরণ করেন-যিনি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন।"

"Nevertheless I tell you the truth : It is expedient for you that I go away; for ii I go not away, the comforter will not come unto you, but if I depart I will send him unto you."

-(John : 17 : 7-8)

অর্থাৎ ঃ "যাহাই হউক, আমার উচিত যে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি চলিয়া যাই, কারণ আমি না গেলে সেই শান্তিদাতা আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।"

"Howbit when he the spirit of truth is come, he will guide you unto all truth: for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear that shall he speak and he will show you things to come." -(John : 16 : 13)

অর্থাৎ ঃ "যাহাই হউক, যখন সেই সত্য-আত্মা আসিবেন, তখন তিনি তোমাদিগকে সর্বপ্রকার সত্য পথে চালিত করিবেন, কারণ তিনি নিজের কথা কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা তিনি (ঈশ্বরের নিকট হইতে) শুনিবেন, তাহাই বলিবেন; এবং তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা দেখাইবেন।" এই 'শান্তিদাতা' (paraclete) কে? হযরত মোহাম্মদকেই কি স্পষ্টাক্ষরে এখানে ইংগিত করা হইতেছে না? যিশুখৃষ্টের পরে এক হযরত মোহাম্মদ ছাড়া আর অন্য কোন পয়গম্বর অবির্ভূত হন নাই। তা ছাড়া paraclete শব্দের অর্থও হইতেছে 'শান্তিদাতা' অথবা 'চরম প্রশংসিত'। এই দুইটি বিশেষণই হযরত মোহাম্মদের জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই এ সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

কুরআন শরীফের বহু স্থানেও এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে নানা প্রসংগে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই আয়াতের উল্লেখ করা যায় "

"এবং যখন আল্লাহ্ সমস্ত পয়গম্বরদিগের সমক্ষে এই চুক্তি করিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি যে-সমস্ত বাণী তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা সত্য,

অতঃপর একজন রসুল আসিবেন এবং তিনি আসিয়া তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার সত্যতা প্রমাণ করিবেন; তোমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবে। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা এই ব্যাপারে আমার কথা স্বীকার করিলে ত? তাঁহারা বলিল ঃ আমরা স্বীকার করিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ তাহা হইলে সাক্ষী থাকো। আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী থাকিলাম।"

৩ পারা ৩ ছুরা ইমরান ৮১ আয়াত

এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী হইতে কী বুঝা যায়? যাঁহার প্রশংসা এবং আগমনবার্তা বহু পূর্ব হইতেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, আল্লাহ্ যাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ও সর্বোত্তম আদর্শরূপে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন, তিনি কি সাধারণ মানুষ? কখনই নয়।

অতএব, হযরত মোহাম্মদকে আমরা যেন সাধারণ মানুষের পর্যায়ভূক্ত করিয়া বিচার না করি। তাঁহার জীবনে আমরা অনেক সময় অনেক অলৌকিক মহিমার প্রকাশ দেখিতে পাইব; তাঁহার অনেক কার্য হয়ত আমাদের কাছে বিসদৃশ বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু সেগুলিকে আমরা যেন ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, এক মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি এ দুনিয়ায় এসেছিলেন।

(কবি মরহুম গোলাম মোস্তফা রচিত - বিশ্বনবী দ্রঃ)

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায় ঃ পবিত্র কুরআনের সংখ্যা তাত্ত্বিক মোযেযা - ১

(কোরআনের মত অখন্ড মোযেযা এবং হাফিজ অন্য কোন প্রচলিত ধর্ম-শাস্ত্রের নাই)

আছমানী কেতাব মোট ১০৪ খানা।

(ক)

সহিফা নামীয় কেতাব ১০০ খানা

১। হযরত আদম (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ - ১০ খানা।
২। হযরত শিশের (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ - ৫০ খানা।
৩। হযরত ইদরিছ (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ - ৩০ খানা।
৪। হযরত ইবরাহিম (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ - ১০ খানা।
মোট সহিফা কিতাব = ১০০ খানা।

(খ)

অবশিষ্ট ৪ খানা কেতাব ঃ

১। হযরত মুছার (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছে - তওরাত।
২। হযরত দাউদ (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে - জাবুর।
৩। হযরত ইছা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে - ইনজিল।
৪। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে—কুরআন মজিদ।
মোট কেতাব = ৪ খানা।
সর্বমোট সহিফা সহ ১০৪ খানা।

ছেফারা বা পারা ঃ
পবিত্র কুরআনে ৩০ পারা

(গ)

পবিত্র কুরআনে - ৭ মোনজেল।

প্রথম মোনজেল ঃ ছুরা নিছার শেষ পর্যন্ত (পঞ্চম পারায় দ্রঃ)
দ্বিতীয় মোনজেল ঃ ছুরা তাউবার শেষ পর্যন্ত; (একাদশ পারায় দ্রঃ)
তৃতীয় মোনজেল ঃ ছুরা নহলের শেষ পর্যন্ত; (চতুর্দশ পারার শেষ দ্রঃ)
চতুর্থ মোনজেল ঃ ছুরা ফুরকানের শেষ পর্যন্ত; (উনবিংশ পারায় দ্রঃ)
পঞ্চম মোনজেল ঃ ছুরা সাফফাতের শেষ পর্যন্ত; (ত্রয়োবিংশ পারায় দ্রঃ)

www.pathagar.com

ষষ্ঠ মোনজেল ঃ ছুরা হুজুরাতের শেষ পর্যন্ত; (ষড়বিংশ পারায় দ্রঃ)
সপ্তম মোনজেল ঃ ছুরা নাছের শেষ পর্যন্ত; (ত্রিংশ পারায় দ্রঃ)

পবিত্র কুরআনে ছুরার সংখ্যা ঃ

পবিত্র কুরআনে ছুরার সংখ্যা

পবিত্র কুরআন শরীফের মোট ১১৪টি ছুরা মক্কা ও মদিনায় ২৩ বছরে নাযিল হয়েছে।

১। মক্কায় নাযিল হয়েছে ৮৩ টি ছুরা

২। মদিনায় নাযিল হয়েছে ৩১ টি ছুরা।

মোট = ১১৪টি

প্রমান ঃ উছিলাতুল কারী।

পবিত্র কুরআনে তেলাওয়াতে ছজিদা

পবিত্র কুরআনে মোট ১৫টি তেলাওয়াতে ছজিদা রয়েছে। তার মধ্যে কোনটি ফরজ, কোনটি ওয়াজিব ও কোনটি ছুন্নত তা নীচে দেয়া হলো।

১। ৯ পারা ৭ ছুরায়ে আরাফ ১০৬ আয়াত - ওয়াজিব।
২। ১৩ পারা ১৩ ছুরায়ে রাদ ১৫ আয়াত - ফরজ।
৩। ১৪ পারা ১৬ ছুরায়ে নহল ৫০ আয়াত - ফরজ।
৪। ১৫ পারা ১৭ ছুরায়ে বনি ইছরাইল ১০৯ আয়াত - ফরজ।
৫। ১৬ পারা ১৯ ছুরায়ে মারইয়াম ৫৮ আয়াত - ওয়াজিব।
৬। ১৭ পারা ২২ ছুরায়ে হাজ্জ ১৮ আয়াত - ফরজ।
৭।১৭ পারা ২২ ছুরায়ে হাজ্জ ৭৭ আয়াত - **শাফি মাজহাব**।
৮। ১৯ পারা ২৫ ছুরায়ে ফুরকান ৬০ আয়াত - ফরজ।
৯। ১৯ পারা ২৭ ছুরায়ে নমল ২৬ আয়াত - ছুন্নাত
১০। ২১ পারা ৩২ ছুরায়ে ছজিদা ১৫ আয়াত - ফরজ।
১১। ২৩ পারা ৩৮ ছুরায়ে সোয়াদ ২৪ আয়াত - ওয়াজিব।
১২। ২৪ পারা ৪১ ছুরায়ে হামিম ছজিদা ৩৮ আয়াত - ছুন্নত।
১৩। ২৭ পারা ৫৩ ছুরায়ে নজম ৬২ আয়াত - ওয়াজিব।
১৪। ৩০ পারা ৮৪ ছুরায়েই ইনশিকাক ২১ আয়াত - ছুন্নত।
১৫। ৩০ পারা ৮৬ ছুরায়ে আলাক ১৯ আয়াত - ছুন্নত।

বিঃ দ্রঃ হাদিস অনুসারে এবং ফেকার প্রধান প্রধান আলেমদের

www.pathagar.com

মতে শাফি মাযহাবের ছজিদা বাদে বাকী ১৪টি ছজিদা আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু ফরজ, ওয়াজিব ও ছুন্নত যা প্রতিটি ছজিদার আয়াতের ডানে দেখানো হলো, এদের প্রমাণ অতি অল্প। প্রমাণঃ মুফিদুলকারী, নাফেউলকারী ইত্যাদি।

বিষয় ভিত্তিক ৬৬৬৬ আয়াত

বিষয় ভিত্তিক ৬৬৬৬ আয়াত

১। সৎ কাজ করলে সুখবর ও পুরস্কার দেবেন বলে আল্লাহর অঙ্গীকার - ১০০০ আয়াতে।

২। মন্দ কাজ করলে আল্লাহ কঠোর শাস্তির ভয় দেখায়েছেন - ১০০০ আয়াতে।

৩। আল্লাহ সৎ কাজ করার জন্য আদেশ জারি করেছেন - ১০০০ আয়াতে।

৪। আল্লাহ অসৎ কাজে নিষেধ করেছেন - ১০০০ আয়াতে।

৫। আল্লাহ দৃষ্টান্ত দেখায়েছেন - ১০০০ আয়াতে।

৬। শুধু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে - ১০০০ আয়াতে।

৭। হালাল ও হারামের বর্ণনা - ৫০০ আয়াতে।

৮। দোআ' - ১০০ আয়াতে।

৯। অবস্থাভেদে অপ্রযোজ্য - ৬৬ আয়াতঃ (মনছুখ নয়— ৩য় খন্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ওছিয়াত দ্রঃ) মোট = ৬৬৬৬ আয়াত।

প্রমাণঃ মজমুয়ায়ে বিস্তেকেয়াত।

পবিত্র কুরআনের শব্দ সংখ্যা

পবিত্র কুরআনে মোট শব্দ সংখ্যা নিয়ে বেশ মত পার্থক্য রয়েছে।

১। বামিদের মতে শব্দ সংখ্যা - ৭৬৪৩০ টি

২। মোজাহিদের মতে শব্দ সংখ্যা - ৭০২৫০ টি

৩। ইবরাহিম তাইমির মতে শব্দ সংখ্যা ৭৭৪৩৯ টি

৪। আতায়ে খোরাসানীর মতে শব্দ সংখ্যা ৭৭৪৩৯ টি

পবিত্র কুরআনের হরফ বা বর্ণ সংখ্যা

পবিত্র কুরআনের 'হরফ' বা বর্ণ গণনাকারী সকলের বর্ণ সংখ্যা এক নয়।

www.pathagar.com

১। মাস্‌উদ-ইবনি আবদুল্লাহর গণনা মতে বর্ণ সংখ্যা - ৩,১২,৬৯০টি।

২। আব্বাসের পুত্র আবদুল্লাহর গণনা মতে বর্ণ সংখ্যা - ৩,২৩,৬৭১ টি।

৩। মোজাহিদ রাহমাতুল্লাহর গণনা মতে বর্ণ সংখ্যা - ৩,২১,১২০ টি।

৪। ইবরাহিম তাইমির গণনা মতে বর্ণ সংখ্যা - ৩,২৩,০১৫ টি।

৫। আবদুল আজিজের গণনা মতে বর্ণ সংখ্যা - ৩,১১,২০০ টি।

৬। ইব্‌রাহিম নখয়ির গণনা মতে বর্ণ সংখ্যা - ৩,২৩,২১৫ টি।

প্রমান ঃ আদাবুল কুরআন।

বিঃ দ্রঃ আয়াত, শব্দ ও বর্ণ গণনায় বেশ-কম হওয়ার কারণ ঃ-

পবিত্র কুরআনে এরূপ বহু বর্ণ রয়েছে যা লেখায় আছে, পড়ায় নাই। ফলে, পবিত্র কুরআনের অক্ষর গণনার সময় কেউ যে বর্ণ পড়া হয় না তা বাদ দিয়েছেন এবং আর কেউ যেসব বর্ণ পড়া হয় কেবল সেসব বর্ণই গণনা করেছেন। অনুরূপভাবে, কেউ তাশদিদ যুক্ত শব্দ একটি ধরে গুণেছেন। আবার কেউ দু'টি ধরে গুণেছেন। কেউ কোন শব্দকে এক শব্দ ধরে গুনেছেন, আবার কেউ দু'শব্দ ধরে গুণেছেন। তাই, শব্দ ও বর্ণ গুণতিতে পার্থক্য ঘটেছে। অনুরূপভাবে আয়াত, শব্দ ও বর্ণের ক্ষেত্রেও বুঝতে হবে।

এসব মত পার্থক্য সাহাবা ও আলেমগণ জায়েজ মনে করেন।

প্রমাণঃ বুস্তামে আবদুল্লাইছ, আদাবুল কুরআন।

পবিত্র কুরআনে কোন হরফ বা বর্ণ কয়টি

পবিত্র কুরআনে কোন বর্ণ বা 'হরফ' কয়টা আছে তার একটা হিসাব নীচে দেয়া হলো।

আলিফ বর্ণ ৪৮৮৭৬ টি	তয়া বর্ণ ১২৭৪ টি
বা বর্ণ ১১৪২৮ টি	যয়া বর্ণ ৮৪২ টি
তা বর্ণ ১০১৯৯ টি	আইন বর্ণ ২২২০ টি
ছা বর্ণ ১২৭৬ টি	গাইন বর্ণ ২২০৮ টি
জীম বর্ণ ৩২৭৩ টি	ফা বর্ণ ৮৪৯৯ টি
হা বর্ণ ৩৯৭৩ টি (হুত্তি)	কফ বর্ণ ৬৮১৩ টি

www.pathagar.com

খা বর্ণ ২৪১৬ টি
দাল বর্ণ ৫৬৪২ টি
যাল বর্ণ ৪৬৯৭ টি
রা বর্ণ ১১৭৯৩ টি
ঝা বর্ণ ১৫৯০ টি
ছিন বর্ণ ৫৮৯১ টি
শিন বর্ণ ২২৫৩ টি
সয়াদ বর্ণ ২০১৩ টি
দয়াদ বর্ণ ১৬০৭ টি
কাফ বর্ণ ৯৫২২ টি
লাম বর্ণ ৩৩৪৩২ টি
মিম বর্ণ ২৬৫৩৫ টি
নুন বর্ণ ২৬৫৬০ টি
অয়াও বর্ণ ২৫৫৩৬ টি
হা বর্ণ ১৯০৭০ টি
লামালিফ বর্ণ ৪৭২০ টি
হামযা বর্ণ ৪১১৫ টি
ইয়া বর্ণ ২৫৯১৯ টি

পবিত্র কুরআনে যের, যবর, পেশ প্রভৃতি

রছুলুল্লাহর (সঃ) সময়ে আরবী ভাষা বা পবিত্র কুরআনে হরকৎ বা জের, জবর, পেশ প্রভৃতি ছিলনা। ছাহাবাগণের ওফাতের পর ইউছুফের ছেলে হাজ্জাজের সময় সর্বসাধারণের পড়ার সুবিধার জন্য এসব হারাকাত অর্থাৎ যের, যবর, পেশ প্রভৃতি দেয়া শুরু হয়।

পবিত্র কুরআন শরিফে যের, যবর, পেশ প্রভৃতির সংখ্যা নীচে দেয়া হলোঃ-

১। যবর - ৫৩২৪৩ টি
২। যের - ৩৯৫৮২ টি
৩। পেশ - ৮৮০৪ টি
৪। মদ - ১৭৭১ টি
৫। তাশদিদ - ১২৫৩ টি
৬। নুক্‌তা - ১০৫৬৮১ টি
৭। রুকু - ৫৪০ টি

পবিত্র কুরআনে রুকু সংখ্যা

পবিত্র কুরআনে ৫৪০টি রুকু কেন?

হযরত ওসমান (রাঃ) রমজান মাসের ২৭ দিনে পবিত্র কুরআন খতম করতেন। এতে মনে হয় প্রতি রাকাতে এক রুকু পরিমান কুরআন পড়তেন। অর্থাৎ প্রতিদিন বিশ রাকাতে ২০ রুকু পড়তেন। সুতরাং ২৭ দিন X ২০ রুকু = ৫৪০ রুকু।

প্রমান ঃ মুফিদুল কারী ও উছিলাতুল কারী।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের সংখ্যাতাত্বিক মোযেযা- ২

কোরআনের মত অখন্ড মোযেযা এবং হাফিজ অন্য কোন ধর্ম-শাস্ত্রের নাই

একঃ কোরআনের সর্বপ্রথম আয়াত হল بسم الله الرحمن الرحيم আর এই আয়াতে মোট উনিশ (১৯) টি অক্ষর রয়েছে। এই সংখ্যা একটা বাস্তব সত্য যা যে কোন ব্যক্তি অতি সহজেই গুণে দেখতে পারেন। সমগ্র কোরআনে এই প্রথম আয়াতের চারটি শব্দ ইছমি, আল্লাহু, আর রাহমান ও আর রাহীম। اسم ، الله ، الرحمن و الرحيم যতবার আছে তা এই উনিশ দ্বারা বিভাজ্য। সমগ্র কোআনে ইছমি শব্দ মাত্র ১৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ শব্দ ঠিক ২,৬৯৮. (১৯ স ১৪২) বার, রাহমান মাত্র ৫৭ (১৯ স ৩) বার এবং রাহিম মাত্র ১১৪ (১৯ স ৬) বার ব্যবহৃত হয়েছে আর এ সংখ্যা গুলোর প্রত্যেকটি ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য। এ সংখ্যাগুলোর সত্যতাও যে কেউ গুণে যাচাই করে দেখতে পারেন।

ইতিপূর্বে অনেকেই কোরআনের শব্দ সহ বিভিন্ন সংখ্যা প্রকাশ করেছেন এবং তারাও এই শব্দগুলোর একই সংখ্যা পেয়েছেন, তবে এর সঙ্গে বিসমিল্লাহ শরীফের অক্ষর সংখা ১৯ এর সঙ্গে কোন যোগাযোগ লক্ষ্য করেননি। এ বিষয়ে একটি বিখ্যাত পুস্তকেই এ শব্দগুলোর সংখ্যা রয়েছে ১৯, ২৬৯৭, ৫৭ ও ১৪ বার কিন্তু কমপিউটারে গুণে দেখা গেলে যে الله শব্দ প্রকৃতপক্ষে ২৬৯৮ বার রয়েছে। পরে যাচাই করে দেখা গেল যে- লেখক গুণতিতে ভুল করেছিলেন। এখানেও লেখক বিসমিল্লাহ শরীফ বাদ দিয়ে বাকী কোরআনে اسم শব্দ গুনেছেন। এতে বুঝা যায় যে, এ শব্দ গুলোর ১৯ বা ১৯ এর দ্বারা বিভাজ্য ব্যবহার করা আল্লাহর ইচ্ছাই হয়েছে। আর কোরআনের প্রতিটি শব্দও স্বয়ং আল্লাহই বেছে দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। যন্ত্রের সাহায্যে নির্ভুল গণনায় দেখা গেল যে, মানুষের গণনায় ভুল হলেও কোরআনের শব্দ চয়নের একটা বিশেষ হিসেব রয়েছে। এখন একথা অকাট্য সত্য যে কোরআনের প্রথম আয়াতে ১৯টি অক্ষর আর এ আয়াতের চারটি

www.pathagar.com

শব্দ সমগ্র কোরআনের ১৯ বা ১৯ এর দ্বারা বিভাজ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(.Muhammad Fuad Abdul Baqi রচিত Index to the words of the Glorious Quran, প্রকাশক Dar Iniace Al-Turath Al Araby, Lebanon, Distributor: Islamic Book Service, P.O. Box. 38, Plainfield, Indiana 46168 USA.

১। যারা এ ধরনের হিসেবকে কোন গুরুত্ব দিতে নারাজ তারা বলতে পারেন যে, হয় এটা নেহায়েত ঘটনাচক্র (Sheor coincidence) না হয় মহানবী স্বয়ং ইচ্ছা করে এ শব্দগুলো এমনি সংখ্যায় ব্যবহার করেছেন। প্রথম ঘটনাচক্রের কথাই ধরা যাক। যে কোন গ্রন্থের প্রথম বাক্যে যতগুলো শব্দ ও অক্ষর রয়েছে গোটা গ্রন্থে সেই শব্দগুলো প্রথম বাক্যের অক্ষর সংখ্যার সমান বা তার বিভাজ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার মত ঘটনাচক্র কল্পনাতীত। আর যদিও বা একটা বা দুটো শব্দের বেলায় এমন পাওয়াও যায়, পর পর চারটি শব্দের বেলায় এরূপ পাওয়াকে শুধুমাত্র ঘটনাচক্র বলে উড়িয়ে দেয়া যুক্তিসংঘতও নয় বা বিজ্ঞান ভিত্তিকও নয়।

২। সন্দেহবাদীদের দ্বিতীয় যুক্তি হতে পারে যে, স্বয়ং মহানবী এ ধরনের পরিকল্পনা করেই কোরআন রচনা করেছেন। ইসলাম বিরোধীরা কোরআনকে নবীজি তথা মানবরচিত বলার বহু চেষ্টা করেছে। এরূপ অভিযোগের প্রতিবাদে যা বলা যায় তা এত যুক্তিসংগত যে, তাতে সকল সন্দেহবাদিরা তাদের ভুল স্বীকার করে নিতে বাধ্য। অবশ্য যারা কিছুতেই ঈমান আনবে না সেসব আবু জেহেল ও আবু লাহাবদের কথা স্বতন্ত্র।

ক) একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিরক্ষর ছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। ইসলাম বিরোধী খৃষ্টান ও ইহুদী পন্ডিতগণ বহু গবেষণা করেও নবীজীর উম্মী হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ আরোপ করতে সক্ষম হয়নি।

www.pathagar.com

খ) হাদিসে নবীজীর নিজস্ব ভাষা আর কোরআনের ভাষার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য পার্থক্য যে কোন আরবী ভাষাবিদদের নিকট সুস্পষ্ট। একই ব্যক্তি যিনি নিরক্ষর তিনি এক মানের ভাষায় কথা বলবেন আবার আর একমানের ভাষায় কোরআনের আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, এটাও কোন যুক্তিসংগত কথা হল না। কথা ও ভাষা লিখিত ভাষায় পার্থক্য থাকতে পারে। তাই একজন লেখক যে ভাষায় কথা বলেন হয়ত বই লিখার সময় উন্নত ভাষা ব্যবহার করেন। কিন্তু নিরক্ষর নবী তো কোন বই রচনা করেননি বা কোরআনও লিখিতভাবে নাজিল হয়নি। তাঁর মুখের ভাষা ও কোরআনের ভাষা দু'ই শুদ্ধতার দিক দিয়ে একরূপ হলেও ভাষার গাম্ভির্য, অলংকার-বিন্যাস ইত্যাদির দিক দিয়ে কোরআনের আয়াতসমূহ অনেক উন্নতমানের ছিল। একজন নিরক্ষর ব্যক্তি এরূপ দু'মানের ভাষায় কথা বলতে পারে না। যদি কোরআন কবিতার পুস্তক হতো তবুও তর্ক করা যেত। সুতরাং এ ব্যপারে দীর্ঘ আলোচনা নিস্প্রয়োজন।

গ) কোরআন সুদীর্ঘ তেইশ বছরে খন্ডে খন্ডে বা আংশিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি কোরআন নবীজির নিজস্ব রচনা হতো, তবে বলতে হয় যে, সে যুগে এ নিরক্ষর আরব আগেই ঠিক করে নিয়েছিলেন যে, তার বইয়ের প্রথম বাক্যে মোট ১৯টি হরফ থাকবে আর তাতে চারটি শব্দ থাকবে এবং এ চারটি শব্দ সমগ্র গ্রন্থে ১৯ বা ১৯এর দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যায় ব্যবহৃত হবে। এ ধরনের যুক্তি নিতান্তই হাস্যকর। তবুও যুক্তির খাতিরে যদি কেউ গোঁড়ামি করে বলেন যে, তিনিই এভাবে কোরআন রচনা করেছেন তবে প্রশ্ন উঠে তিনি তাঁর এমন চমৎকার সাহিত্যিক গৌরব তাঁর সাহাবাদের নিকট প্রকাশ করে নিজেরে গৌরব বৃদ্ধিকরলেন না কেন? শুধু তাই নয় স্বয়ং নবীজি বা তাঁর কোন সাহাবা কোন দিন কোরআনের এই সংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কথাতো শুনেননি, এমন কি ১৯৭৬ সালের জুন মাসে ডঃ রাশাদ খলিফার এ আবিস্কারের পূর্বে এ বৈশিষ্ট্যর কথা কেউ কোন দিন উল্লেখও করেননি। সুতরাং আমরা সহজেই এরূপ সন্দেহ বাতিকদের তর্ককে উপেক্ষা করতে পারি। এর পর আমরা নিঃসন্দেহ যে, এরূপ সংখ্যা তত্ত্বের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যিনি এই কোরআন উম্মী নবীর উপর নাজিল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে গোটা কোরআনের প্রতিটি শব্দই আল্লাহ কর্তৃক রচিত ও নির্ধারিত।

www.pathagar.com

দুইঃ কোরআনের মোট সুরার সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। যদিও প্রতিটি সুরার প্রথমেই "বিসমিল্লাহ শরীফ" রয়েছে তবুও নবম সুরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম নেই। আর নবীজীর নির্দেশেই এ সুরা বিসমিল্লাহ শরীফ ছাড়া পাঠ করা হয়। যদি এ সুরা পৃথক না হয়ে বিসমিল্লাহ না থাকায় ৮ম সুরায় শামিল থাকতো তবে সুরার সংখ্যা ১১৩ হতো যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। কিন্তু নবীজী নিজেই সুরা তওবাকে বিসমিল্লাহ শরীফ বাদে পৃথক সুরা হিসেবে পাঠ করে শুনিয়েছেন। সুতরাং কোরআনের ছুরার সংখ্যা ১১৪ হওয়াও আল্লার নির্দেশ।

তিনঃ বিসমিল্লাহ শরীফের অক্ষর সংখ্যা ১৯ হওয়ার আরও চমৎকার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে কোরআনের প্রথম আয়াতের অক্ষর সংখ্যা ১৯ সেই আয়াতটিও সমগ্র কোরআনে মোট ১১৪ (১৯ X ৬) বার ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা জানি যে কোরআনের সুরার সংখ্যা ১১৪ আর সুরা তওবা বাদে ১১৩টি সুরার শুরুতেই বিসমিল্লাহ শরীফ ব্যবহৃত হয়েছে। যদি প্রত্যেক সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ থাকত তবে এ আয়াতের সংখ্যাও ১১৪ হতো। এখন ছুরা তাওবায় এ আয়াত না থাকয় এর সংখ্যা ১১৩ হলে তা ১৯দিয়ে বিভ্যাজ্য হয় না। কিন্ত সূরা নমলের ৫০ নম্বর আয়াতে বিসমিল্লাহ শরিফ নাযিল হয়েছে।

সুতরাং, সুরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ শরীফ না থাকায় সমগ্র কোরআনে এ আয়া'তের সংখ্যা ১১৪ বা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হল। মনে রাখা প্রয়োজন যে কোরআনের প্রতিটি আয়াত কোন সুরার এবং কোন আয়াতের পর পাঠ করতে হবে এসবই হযরত জিবরাইল (আঃ) কর্তৃক পৌছানো নির্দেশ অনুযায়ী করা হয়েছে। আর একই নির্দেশে অর্থাৎ আল্লার সুনির্দিষ্ট হুকুমেই সুরা তওবার শুরুতে বিসিমিল্লাহ শরীফ না দিয়ে এ ব্যতিক্রম করা হয়েছে, অথচ প্রতিটি ছোট বড় সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ শরীফ রয়েছে। অবশ্য অন্য যে কোন সুরার বদলে সুরা তওবায় কেন এ ব্যতিক্রম করা হল উহা আল্লাহই ভাল জানেন। এখন বুঝা গেল যে, বিসমিল্লাহ শরিফের ১৯টি অক্ষরের তাৎপর্য কত ব্যাপক। আজ চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত প্রত্যেক কোরআন শরীফেই সুরা তওবায় বিসমিল্লাহ শরীফ বাদ দিয়ে ছাপানো হচ্ছে ও তেলাওয়াত হচ্ছে। বলা

www.pathagar.com

যায় যে, এ আয়াতের সংখ্যা ১১৪ বা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য রাখার জন্যই একটি সুরায় এ ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এতদিন এ ব্যতিক্রমের কারণ এই ছিল যে, নবিজী বলেছেন, হযরত জিবরাইল আঃ এরূপভাবে পড়তে বলেছেন। বর্তমান গবেষণায় বুঝা গেল যে, এর নতুন তাৎপর্য বেশ গুরুত্বপূর্ন ও বিস্ময়কর। যদি এ ব্যাপারে কারো মনে সুরা তওবা পৃথক সুরা হওয়ার বিষয়ে কোন রূপ সন্দেহ থাকে, নতুন সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব অনুযায়ী সেরূপ কোন সন্দেহের অবকাশ থাকল না। এটা নিঃসন্দেহ যে, নবিজী আল্লার নির্দেশেই সুরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ শরীফ পড়েননি এবং এর ফলেই কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মুযেযার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, যদি প্রতি সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ শরীফ থাকত তবে সুরা নমলের ৩০ আয়াতের বিসমিল্লাহ শরিফসহ এ আয়াতের সংখ্যা হতো ১১৫ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। আবার সুরা নমলের আয়াতে বিসমিল্লাহ শরীফ না থাকলে কোরআনে اسم শব্দের সংখ্যা ১৯ না হয়ে ১৮ হতো। অতীতে কোরআনের কোন শব্দের রদবদল হয়নি এ সংখ্যাতত্ত্ব সে কথাই প্রমাণ করে। আর এ হিসেব প্রকাশের পর ভবিষ্যতে কারো পক্ষে কোরআনের কোন শব্দের রদবদল করা সম্ভব হবে না। মনে হয় কোরআনকে অবিকৃত রাখার জন্য এটাও অন্যতম ব্যবস্থা।

চারঃ সংখ্যা হিসেবে ১৯ এর গুরুত্ব লক্ষ্য করার মত। এই সংখ্যার প্রথম 'এক' আর শেষ 'নয়' অর্থ্যাৎ অঙ্কের প্রথম ও শেষ রাশি। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় আবার তিনি প্রথম ও শেষ اول ، و اخ । এ ছাড়া ১৯ একটি মূল সংখ্যা (Prime number) যা অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য নয়। অর্থাৎ এর কোন অংশী নাই বা বিভাগ নেই। আর আল্লাহ ও হলেন লা-শরীক। আবার ১৯ এর রাশি দুটোর যোগফল ১০ (১+৯+) = ১০ যার মূল্যহীন শূন্য বাদ দিলে রয়ে যায় এক, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।

পাঁচঃ- পবিত্র কোরআনে ১৯ সংখ্যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সুরা আল মুদ্দাসসির (২৯ পারা, ৭৪ নম্বর সুরা) এর ৩০ নং আয়াতে এ ১৯ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। এর পূর্ববর্তী আয়াত (৭৪ঃ২৪-২৫)

www.pathagar.com

কোরআনকে মানুষের রচনা বলার প্রতিবাদে আল্লাহ ৭৪ঃ৩০ আয়াতে ১৯-এর উল্লেখ করেছেন এবং ৭৪ঃ২৬-৩১ আয়াতে এরূপ অবিশ্বাসীদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়ার ধমক দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ এরশাদ করেছেনঃ

(কাফের) বলল-ইহা (কোরআন) শুধু লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু এবং এটা তো কেবল মানব রচিত বাণী। আমি তাকে (কাফেরকে) 'সাকারে' নিক্ষেপ করব। তুমি কি জান 'সাকার' কী ? 'সাকার' তাকে জীবিত অবস্থায়ও রাখবে না, আবার মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দেবে না। সে গাত্র চর্ম দগ্ধ করবে আর তার উপর (সাকরের পাহাড়ই) থাকবে উনিশ।

২৯ পারা ৭৪ঃ৩১ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

আমি ফেরেশতা ছাড়া কাউকে দোজখের প্রহরী নিযুক্ত করিনি। কাফেরদের পরীক্ষা স্বরূপই আমি তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি। যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। বিশ্বাসীদের বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা (মোনাফেকগন) ও কাফেরগণ বলবে, "আল্লাহ এ অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চাচ্ছেন ? এ ভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন" তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনই জানেন। জাহান্নামের এ বর্ণনাতেই মানুষের জন্য সাবধান বাণী।

এ আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, যারা এই কোরআনকে মানব রচিত বলবে এবং আল্লার নাজিল করা কিতাব মনে করবে না, তাদেরকে আল্লাহ সাকার নামক দোজখে কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তদুপুরি থাকল উনিশ। এতে দোজখের পাহারারত ১৯ জন ফেরেস্তা ছাড়া আরও গভীর অর্থ রয়েছে মনে হয় এবং উনিশের সংখ্যা ভিত্তিক কোরআনী মোযেযাও বুঝান যেতে পারে। এ মোযেযা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কোরআন মানব রচিত নয়। আর এ প্রমাণের জন্য উনিশ ভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ন ও অর্থ বহ মনে হয়। এ ছাড়া ৭৪ঃ৩১ আয়াতে রয়েছে ماذا اراد الله بهذا مثلا [অর্থাৎ আল্লাহ এরূপ (উনিশের) উদাহরন দ্বারা কি বুঝাতে যাচ্ছেন? এর মানে হল যে, কাফেরগণ এ উনিশের উল্লেখ কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্ব হবে মাত্র। কিন্তু এতে মুমিনদের ঈমান

www.pathagar.com

আর দৃঢ় হবে। উনিশের এ নতুন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার মনে হয় যে, কোরআনের এ ১৯ ভিত্তিক সংখ্যাতাত্ত্বিক মোযেযা কাফেরদেরকে আরও বিভ্রান্ত করবে আর মুমিনদেরকে দেবে কোরআনের প্রতি আরও গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

ছয়ঃ- যদি কোরআনের আয়াতসমূহের ক্রমানুসারে নাজিলের দিকে লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যায় যে, সর্বপ্রথম 'আল-আলাক সুরার (৯৬) প্রথম কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়। এ সুরা কোরআনের শেষ দিকে থেকে উনিশতম (১৯ম) এবং এ সুরার আয়াতের সংখ্যাও উনিশ। দ্বিতীয়বার নাযেল হল সুরা আল-কালামের (৬৮) কয়েকটি আয়াত, তৃতীয়বার নাযেল হল সুরা আল মুয্যাম্মিল (৭৩) এর প্রথম কয়েকটি আয়াত এবং চতুর্থবার নাযেল হল সুরা আল মুদ্দাসসিরের (৭৪) এর প্রথম থেকে ৩০ নং আয়াত যার শেষ শব্দ হল تسعة عشر বা উনিশ। এরপর কোরআনের সর্বপ্রথম পরিপূর্ন সুরা আল-ফাতিহা নাজিল হয়। যার প্রথম আয়াতই হল ১৯টি অক্ষরযুক্ত 'বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম'। এ আয়াতের অক্ষর সংখ্যা উনিশ হওয়ায় মনে হয় সুরা আল মুদ্দাসসিরে উনিশ সংখ্যার উল্লেখ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হয় কোরআনকে অবিকৃত রাখার জন্য এ সংখ্যা তাত্ত্বিক ভিত্তিও অন্যতম ব্যবস্থা। এখন যে কেউ কোরআনে কোন নতুন শব্দ যোগ করলে বা বাদ দিলে তা ধরে ফেলা সহজ হবে।

সাতঃ কোরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, কতগুলো সুরার প্রথমে এক বা ততোধিক হরফ দিয়ে শুরু হয়েছে। আর এ হরফ বা হরফ সমষ্টিকে পূর্ণ আয়াত ধরা হয়। এ হরফ সমষ্টিকে বলা হয় حروف مقطعة বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ। এধরনের হরফের আয়াত কোরআনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং অন্য কোন গ্রন্থে এরূপ হরফের ব্যবহার দেখা যায় না। নবীজীও এ হরফগুলোর কোন অর্থ বলে যাননি। যদিও এগুলো কোরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পাঠ করা হয়। কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোযেযার আলোচনায় এ সমস্ত বিচ্ছিন্ন হরফের নতুন তাৎপর্য পাওয়া যাচ্ছে যদিও এগুলোর অর্থ আমাদের বোধগম্য নয়, কারণ আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে এমনিভাবে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেণ। এবার এ সকল হরফের বিশেষ তাৎপর্যসমূহ আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের সংখ্যা তাত্ত্বিক মোযেযা - ৩
(কোরআনের মত অখন্ড মোযেযা এবং হাফিজ অন্য কোন প্রচলিত ধর্ম-শাস্ত্রের নাই)

কুরআনের মোট ২৯টি সূরার প্রথমে আলিফ, লাম, মিম, সয়াদ, রা, কাফ, হা ইত্যাদি মোট ১৪টি হরফ ১৪ রকমে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব হরফকে বলা হয় 'হরফে মুকাত্তায়াত'। এতদিন এতকাল যাবত এসব হরফের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। একান্ত হালে এসে মিসরীয় বাহাই বিজ্ঞানী ডঃ রশীদ খলিফা কম্পিউটার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কুরআনের প্রতিটি সূরার সূচনায় 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম' বাক্যটি রয়েছে এবং ওই বাক্যটি আরবী ১৯টি হরফ দ্বারা গঠিত। যে ছুরার শুরুতে যে কয়টি করে রহস্যময় হরফ রয়েছে, ওই ছুরার মধ্যে যতগুলি ওই হরফ রয়েছে, তা একত্র করে নিয়ে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌র' এই ১৯ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মিলে যাবে। যেমন, ছুরা বাকারার (২নং ছুরার) শুরু হয়েছে আলিফ, লাম ও মিম হরফ দিয়ে। এখন এই ছুরা বাকারায় যতগুলি আলিফ হরফ, লাম হরফ ও মিম হরফ আছে, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সবগুলির সংখ্যা আলাদা আলাদাভাবে ১৯ দ্বারা ভাগ করলে মিলে যায়। কুরআনের এই বৃহত্তম সূরাটির মধ্যে কোন রুকু বা অনুচ্ছেদ, আয়াত কিংবা বাণীর মধ্যে এমন কি কোন শব্দের বা হরফের মধ্যেও যদি কোন রদবদল সাধিত হত, তাহলে সংশ্লিষ্ট কোন হরফের সংখ্যা ১৯ দ্বারা ভাগ করলে মিলত না—এবং তখন গড়বড় ধরা পড়তই।

কুরআনের কোন আয়াতে এমন কি কোন শব্দেও যে মানুষের কোন হস্তক্ষেপ ঘটে নাই, তার আর একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে— ছুরা আরাফ। কোরআনের এই ৭নং ছুরা আরাফের ৬৯ আয়াতে রয়েছে একটি আরবী শব্দ ঃ 'বাসতাতা'। এটি 'বাসাতা' শব্দ থেকে গৃহীত আরবী ভাষায় সাধারণত এই 'বাসতাতা' লিখিত হয় 'ছিন' হরফ দিয়ে। কিন্তু কুরআনের এই 'বাসতাতা' শব্দযুক্ত আয়াত যখন নাজিল

www.pathagar.com

হয়, ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ) তখন শেষ নবীকে (দঃ) বলে দিয়েছিলেন, যাঁরা ওহী-লেখক্, তাঁরা যেন এই আয়াতটি লিখতে 'বাসতাতা' শব্দটিকে 'ছিন' হরফ দিয়ে না লিখে 'সয়াদ' হরফ দিয়ে লিখেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কম-বেশি ৪২ জন সাহাবী মোহাম্মদের (দঃ) উপরে নাযেলকৃত ওহী লিখে নিতেন। এইসব সাহাবী 'কাতিব ওহী' বা 'ওহী-লেখক' নামে পরিচিত ছিলেন।

যাহোক, সেই থেকে কুরআনে ছুরা আরাফের 'বাসতাতা' শব্দটি 'সয়াদ' হরফ দিয়ে লিখিত হয়ে আসা হচ্ছে—যদিও আরবি ভাষায় 'সয়াদ' হরফে 'বাসতাতা' বানান অশুদ্ধ। কিন্তু ৭ম শতাব্দীতে বসে একজন 'নিরক্ষর নবী' কেন আরবী ভাষার একটা চালু শব্দকে 'অশুদ্ধ বানানে' লিখবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন,—এবং গত প্রায় দেড় হাজার বছরেও কোন আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিত কুরআন প্রকাশ কিংবা তরজমা করতে গিয়ে ওই 'বাসতাতা' শব্দটি 'শুদ্ধ' করেন নাই, তার মাজেজা বা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—একান্ত হালে এসে, কুরআনের এই কম্পিউটার নিরীক্ষায়। যেমন, কুরআনের মোট তিনটি ছুরার শুরুতে 'সয়াদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ ৭নং ছুরা আরাফে, ১৯নং ছুরা মরিয়মে এবং ৩৮নং ছুরা 'সয়াদে'। কম্পিউটার গণনায় দেখা গেছে যে, এই তিনটি ছুরা লিখতে গিয়ে 'সয়াদ' ব্যবহৃত হয়েছে মোট ১৫২ বার। উপরোক্ত 'অশুদ্ধ বানানে' লিখিত 'বাসতাতা' শব্দটির 'সয়াদ' হরফটিও রয়েছে এই হিসাবের মধ্যে। কম্পিউটার গণনায় আরো দেখা গেছে, এই তিন ছুরার 'সয়াদ' শব্দের ১৫২ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা ভাগ করলে মিলে যায় ঃ (১৫২ ÷ ১৯=৮)।

গত প্রায় দেড় হাজার বছরে কুরআন যদি কোন মানুষের ইচ্ছামত লিখিত হত, কোন বিদ্বান, পণ্ডিত ও ভাষাবিদের দ্বারা বিন্দুমাত্র পরিশোধিত বা পরিমার্জিত হত, তাহলে নিরক্ষর নবীর (দঃ) উপরে নাজিল হওয়া কুরআনের ৬৬৬৬টি আয়াতের মধ্যে 'বাসাতা' শব্দটির 'ভুল' বানান 'শুদ্ধ' করা হত সবার আগে। —নয় কি? এভাবে

www.pathagar.com

মানুষের হস্তক্ষেপে কুরআনের কোন ভুল বানান শুদ্ধ করা হলে কার কিছু বলারও থাকত না। কিন্তু সর্বাধুনিক কম্পিউটার-নিরীক্ষায় তাহলে কি দেখা যেত? দেখা যেত যে, 'সয়াদ' হরফ দিয়ে শুরু তিনটি ছুরায় 'সয়াদ' হরফটি ব্যবহৃত হয়েছে মোট ১৫১ বার এবং তা 'বিসমিল্লাহর' ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয়! আর তাহলে অন্য কেউ নয়, স্বয়ং কম্পিউটারই ঘোষণা করত যে, কুরআনে মানুষের হস্তক্ষেপ ঘটেছে। কিন্তু কুরআনের সেই বক্তব্য আজও বিস্ময়করভাবে অটুট রয়েছে যে, "আমরাই কুরআন নাজিল করিয়াছি এবং আমরাই ইহার হেফাজত বা সংরক্ষণ করিব।" (১৫ ঃ ৯)-আল্লাহর এই ঘোষণা কম্পিউটার গণনায়ও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শেষ নবীর (দঃ) আমলে জনৈক ব্যক্তি কুরআনের ওহী হিসাবে নাজিল হওয়ার ব্যাপারে অর্থাৎ কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলে ছুরা মোদ্দাছছেরের কিছু আয়াত নাযিল হয়। উক্ত ছুরায় কুরআন যে মানুষের রচনা নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ্‌র বাণী সে কথা ব্যক্ত করে ৩০নং আয়াতে বলা হয় ঃ "উহার উপরে রহিয়াছে ঊনিশ!" কুরআনের অবিকৃত এবং আদি ও অকৃত্রিম রূপের সংরক্ষণকারী যে এই ১৯ সংখ্যাটি, সে কথাই এখানে বলা হয়েছে।

আল্লামা ইউসুফ আলীর মত কুরআনের জগদ্বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারও এই 'ঊনিশ' সংখ্যার রহস্য অনুধাবন করতে না পেরে তাঁর 'দি হোলি কোরআনের' টীকায় প্রশ্ন তুলেছেন ঃ "হু আর দি নাইনটিন? এ্যাণ্ড হোয়াই দিস নাম্বার?" - প্রাচীন যুগের তফসিরকারগণ এই ঊনিশ সংখ্যাকে— ঊনিশজন ফিরিশতা বলে মনে করতেন— যাঁরা কুরআন সংরক্ষণে নিয়োজিত। [এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুনঃ 'সত্য মুক্তি মানবতা', ২য় সংস্করণ, প্রকাশনা, আইবিআই এবং 'ছোটদের বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫।

www.pathagar.com

হারফুল মুকাত্তাআতের মোযেযা - ৪

কোরআনের মত অখন্ড মোযেযা এবং হাফিজ অন্য কোন ধর্ম-শাস্ত্রের নাই

কোরআনের মোট ২৯টি সুরার প্রথমে এসব বিচ্ছিন্ন অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। এধরনের হরফের মোট সংখ্যা হল ১৪টি। যেমনঃ ا،ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، هـ، ى আলিফ, হা, রা, সিন, সাদ, ত্বা,আইন, ক্বাপ, কাফ, লাম, মীম, নুন, হা এবং ইয়া। আবার এ ১৪টি হরফ এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে মোট ১৪ প্রকার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ ق، ن، ص، طه، يس، طس، حم، الم، الر، طسم، عسق، المر، المص، كهيعص. যে ২৯টি সুরার প্রথমে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে-তাদের সুরা নম্বর হল, ২,৩,৭,১০,১১, ১২, ১৩, ১৪,১৫, ১৯ ২০, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১,৩২, ৩৬, ৩৮,৪০,৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৫০, এবং ৬৮।

সুতরাং ২৯ টি সুরায় ১৪টি হরফ ১৪ প্রকারে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ তিনটি সংখ্যার সমষ্টি ৫৭ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (২৯+১৪+১৪=৫৭= (১৯ স ৩)।

ক) এক অক্ষর বিশিষ্ট সুরাগুলোর আলোচনা] ঃ

(i) ق (কাফ)-সুরা ক্বাফ(৫০) এর প্রথমে এই ক্বাফ অক্ষর একক ভাবে এবং সুরা আশশুরায় (৪২) حم (১) عسق (২) এর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে حم একটি আয়াত ও عسق আর একটি আয়াত,অর্থাৎ حم ও عسق দুটি পৃথক হরফ সমষ্টি। সুরা ক্বাফে এ ক্বাফ অক্ষরের মোট সংখ্যা ৫৭ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যে কেউ কয়েক মিনিটে ইহা গুনে দেখতে পারেন। এমনিভাবে সুরা আশ শুরায়, ক্বাফ অক্ষরের সংখ্যা ৫৭ (১৯ স ৩)= ৫৭ অথচ এ সুরা সুরার ক্বাফ এর দ্বিগুনের চেয়েও বেশী দীর্ঘ। এ দুই ক্বাফ সম্বলিত সুরায় মোট ক্বাফের সংখ্যা ১১৪ যা কোরআনের মোট সুরার সংখ্যার সমান ও ১৯

www.pathagar.com

দিয়ে বিভাজ্য। যদি ক্বাফ হরফটি কোআনের প্রতীক হয়ে থাকে তবে দুই সুরায় এ হরফের মোট সংখ্যা সমগ্র কোরআনের সুরার সংখ্যার সমান হওয়া বেশ তাৎপর্যপূনঃ বলা যায়।

এখন এ দুই সুরায় ৫৭টি করে ক্বাফ হরফ থাকার পেছেনে কোন মহাপরিকল্পনা রয়েছে, না এটাও ঘটনাচক্র! সুরা ক্বাফ এ ত্রয়োদশ আয়াতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এখানে হযরত লুত (আঃ) এর জাতিকে قوم لوط না বলে اخوان لوط বলা হয়েছে। সমগ্র কোরআনে হযরত লুত(আঃ) এর জাতীর উল্লেখ করা হয়েছে মোট ১২ বার ৭ঃ৮০; ১১ঃ৭০, ৭৪:৮৯; ২২ঃ৪৩;২৬ঃ১৬০;২৭ঃ৫৪,৫৬; ২৯ঃ২৮;৩৮ঃ১৩ঃ;৫০ঃ১৩ এবং ৫৪ঃ৩৩ আয়াতসমূহে এবং একমাত্র ৫০ঃ১৩ আয়াত ছাড়া বাকী ১১টি আয়াত قوم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এক আয়াতে اخوان বলা হয়েছে। এ ব্যতিক্রম না হলে ক্বাফে একটি ক্বাফ বেশী হতো এবং এ ১৯ ভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্ব ব্যর্থ হতো। যদিও "ক্বাওম" ও এখওয়ান দুটি শব্দই সমার্থ বোধক তবুও আরবী অক্ষরের বেলায় এতে ق হরফের সংখ্যায় তারতম্য হয়। সুতরাং ব্যতিক্রম না হলে দুটি ق ওয়ালা সুরার মোট ক্বাফ এর সংখ্যা কোরআনের মোট সুরার সংখ্যা (১১৪) এর সমান হতো না। এবং তা ১৯ দিয়ে বিভাজ্যও হতো না। মনে হয় এ ১৯ ভিত্তিক হিসেব বজায় রাখার জন্যই এ আয়াতে قوم না বলে اخوان বলা হয়েছে; যদিও সমগ্র কোরআনে আরও এগার বার একই বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে قوم শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। ইহাকে নিছক ঘটনাচক্র বলা নিশ্চয়ই কোন যুক্তি নয়।

(ii) হরফ ن নুন - সুরা আল কালাম (৬৮) এর প্রথমে এ হরফটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ সুরায় গবেষণাকারী কমপিউটারের সাহায্যে গুনে নুন হরফের সংখ্যা পেয়েছেন ১৩৩ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯ স ৭= ১৩৩)। (লেখক এ সূরায় "নূন"হরফের সংখ্যা ১৩২ পেয়েছেন যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। এ বিষয় আরো গবেষন্নার প্রয়োজন)।

(iii) হরফ ص (সাদ) কোরআনের তিনটি সুরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন অক্ষর

www.pathagar.com

ص রয়েছে; সুরা আল আরাফ (৭) এ المص। অক্ষর সমষ্টির অংশ হিসেবে' সুরা মরিয়ম (১৯) كهيعص অক্ষর সমষ্টির অংশ হিসেবে এবং সুরা সাদ (৩৮) শুধু ص অক্ষর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ তিনটি সুরায় সাদ অক্ষরের সংখ্যা যথাক্রমে ৯৮, ২৬ এবং ২৮ যার যোগফল ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (৯৮+২৬+২৮)= ১৫২= ১৯ স ৮)।

সুরা আরাফের (৭) ৬৯ নং আয়াতে بصطة বলে একটা শব্দ রয়েছে যা ص দিয়ে লিখবার হুকুম দিয়েছেন স্বয়ং মহানবী (সঃ)। যদিও আরবী ভাষায় এ শব্দটি লিখার নিয়ম س এর সাহায্যে(بسطة)। হযরত জিবরাঈলের নির্দেশে মহানবী এ শব্দটি কোরআনে ص দিয়ে লিখে س এর মত উচ্চরণ করতে বলে গেছেন।

সেই থেকে এ শব্দটি কোরআন শরীফে ص দিয়ে লিখে তার উপরে ছোট্র করে س লিখে রাখা হয়। بصطة এবং কারী সাহেবরা এ صকে سএর মত উচ্চারণ করতে শিক্ষা দেন। যদি এ শব্দটি ص দিয়ে লেখা না হতো তাহলে ص চিহ্নিত সুরা তিনটিতে মোট সাদ অক্ষরের সংখ্যা হত ১৫১ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়! এতে কি মনে হয় না যে, এ ১৯ ভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্ব বজায় রাখার জন্যই আল্লাহ এ ধরনের বিশেষ বানানে এ শব্দটি লিখতে হুকুম দিয়েছেন? কোরআনকে অবিকৃত রাখার পরিকল্পনায় এ ১৯ ভিত্তিক মোজেযা বেশ তাৎপর্য পূর্ন মনে হয়।

(খ) দুই হরফ বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমষ্টিঃ

(ধ) طه এ হরফ দুটি একসঙ্গে কেবলমাত্র সুরা طه (২০) এর শুরুতে একটি আয়াত হিসেবে ব্যবহৃত। এ সুরায় ط সংখ্যা ২৮ আর ه এর সংখ্যা ৩১৪ যার যোগফল ৩৪২ (২৮+৩১৪=৩৪২= (১৯ স ১৮) যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

এ ছাড়া আরও তিনটি সুরা-আশ শুয়ারা (২৬) আন–নমল (২৭) ও আল কাসাস (২৮) এ ط অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। যথক্রমে طس ও طسمও طسم রূপে। সুতরাং মোট চারটি সুরাতে ط অক্ষর ব্যবহৃত

হয়েছে। সূরা ২০. ২৬, ২৭, এবং ২৮, আর এ চার সুরায় ط হরফ রয়েছে যথাক্রমে ২৮,৩৩,২৭ এবং ১৯ বার যার যোগফল ১০৭ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়।

আবার هـ অক্ষর সুরা طه (২০) ছাড়া সুরা মরিয়মে (১৯) ও ব্যবহৃত হয়েছে كهيعص হিসেবে। এই দুই সূরায় মোট ه অক্ষর যথাক্রমে ৩১৪ ও ১৬৮ বার রয়েছে যার যোগফল '৪৮২ বার। এখন طهসহ সকল সুরার সর্বমোট ط এবং هـ সহ সুরা দ্বয়ের সকল هـ হরফের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৭+৪৮২= ৫৮৯ (১৯ স ৩১) যা দিয়ে বিভাজ্য।

(ii) طس এ অক্ষর দুটি কেবল সুরা নমলের (২৭) শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে ط যুক্ত চারটি সুরায় মোট ط হরফের সংখ্যা ১০৭ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। এবার যত সুরায় س ব্যবহৃত হয়েছে - সুরা ২৬, ২৭, ২৮, ৩৬ এবং ৪২ - এ ৫টি সুরায়-এগুলোতে মোট س এর সংখ্যা যথাক্রমে ৯৩,৯৩,১০০, ৪৮ এবং ৫৩ বার, যার যোগফল ৩৮৭ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। কিন্তু طও هـ হরফের মত সকল ط ও س এর সংখ্যার যোগফল ৪৯৪ (১০৭+৩৮৭=৪৯৪ =(১৯ স ২৬) ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

(iii) يس এ দুটি অক্ষল কেবল সুরা ইয়াসিনের (৩৬) শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সুরায় মোট ى হরফের সংখ্যা ২৩৭ এবং س হরফের সংখ্যা মাত্র ৪৮ এবং এ দুটো সংখ্যাই পৃথক পৃথকভাবে ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। কিন্তু এদের যোগফল (২৩৭ +৪৮ = ২৮৫= (১৯ স ১৫) ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

উপরে বর্ণিত طه এর মত এখানেও অনুরুপ সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজেযা লক্ষ্য করা যায়। ى হরফ সুরা ইয়াসিন (৩৬) ছাড়া সুরা মরিয়মে (১৯) রয়েছে অক্ষর সমষ্টি كهيعص এর অংশ হিসেবে। এ দুটি সুরায় ىহরফের সংখ্যা যথাক্রমে ২৩৭ এবং ৩৪৫ যা আলাদাভাবে ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয় এদের যোগফল ৫৮২ (২৩৭+৩৪৫= ৫৮২)-ও ১৯ দিয়ে

www.pathagar.com

বিভাজ্য নয়। কিন্তু যে পাঁচটি সুরায় س রয়েছে তাদের মোট সংখ্যা ৩৮৭ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। এখন যে সকল সুরার শুরুতে ى ও س রয়েছে তাদের সকল ى ও س এর সংখ্যা একত্রে দাঁড়ায় ৯৬৯ (৫৮২+৩৮৭= ১৯ স ৫১) যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

(iv) حم এ অক্ষর দুটি সাতটি সুরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে (৪০ থেকে ৪৬) এবং এগুলোতে মোট ح রয়েছে ৩০৪ বার এবং م রয়েছে ১৮৬২ বার। طٰهٰ এবং يٰسٓ এর মত এখানেও ওদের যোগফল ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (৩০৪ +১৮৬২ = ২১৬৬= ১৯ স ১১৪)। তবে এ সাতটি সুরার মোট ح ও م হরফের সংখ্যা পৃথক পৃথকভাবেও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (৩০৪=১৯ স ১৬) এবং ১৮৬২ = ১৯ স ৯৮)।

এছাড়া আরও লক্ষণীয় যে, এ সাতটি সুরার মোট حم অক্ষরের সংখ্যা উনিশের ১১৪ গুণ। আর সমগ্র কোরআনে সুরার সংখ্যা মোট ১১৪ এবং বিসমিল্লাহ শরীফের সংখ্যাও মোট ১১৪।

(গ) তিন অক্ষর বিশিষ্ট বিভিন্ন অক্ষর সমষ্টিঃ

(ধ) طسم দুটি সুরায় এ তিন অক্ষর সমষ্টি طسم ব্যবহৃত হয়েছে-সুরা আশ-শুয়ারা (২৬) ও সুরা আলকাসাস (২৮)। এ-দুটি সুরায় (মীম) অক্ষরের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮৯ এবং ৪৬১ যা আলাদাভাবে ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। কিন্তু এদের যোগফল ৯৫০ (৪৮৯+৪৬১=৯৫০ = ১৯ স ৫০) ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। আগেই দেখানো হয়েছে যে মোট চারটি সুরায় ط ব্যবহৃত হয়েছে, (সুরা-২০, ২৬, ২৭, এবং ২৮) তাদের একটিতে طٰهٰ(২০) হিসেবে, একটিতে طٰسٓ(২৭) হিসেবে এবং দুটিতে طسم(২৬, ২৮) হিসেবে। এ চারটি সুরায় মোট ط হরফের সংখ্যা যথাক্রমে ২৮, ৩৩, ২৭ ও ১৯ এবং এদের যোগফল ১০৭, ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। এবার যে, পাঁচটি সুরায়(২৬,২৭,২৮,৩৬,৪২) س ব্যবহৃত হয়েছে। তার একটিতে طٰسٓ(২৭) হিসেবে, দু'টিতে طسم (২৬ এবং ২৮) হিসেবে একটিতে يٰسٓ (৩৬) হিসেবে এবং একটিতে عسق (৪২)

www.pathagar.com

হিসেবে। এসব সুরায় মোট س হরফের সংখ্যা যথাক্রমে ৯৩,৯৩,১০০,৪৮ এবং ৪৩ বার রয়েছে যার প্রত্যেকটি আলাদাভাবে এবং এদের যোগফল ৩৮৭ উনিশ দিয়ে বিভাজ্য নয়।

আবার م হরফ বিভিন্ন অক্ষর সমষ্টির অংশ হিসেবে মোট ১৭টি সুরায় রয়েছে এবং সব কয়টিতে মোট م এর সংখ্যা ৮৬৮৩ বার যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য ৮৬৮৩= (১৯ স ৪৫৭)। এখন সকল طس ও مঅক্ষর যুক্ত সুরাগুলোতে এ তিনটি হরফের সংখ্যার যোগফল ৯১৭৭(১০৭+৩৮৭+৮৬৮৩= ৯১৭৭= ১৯ স ৭৮৩) ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

(ii) الم। এ তিনটি অক্ষর সমষ্টি মোট ৮টি সুরার প্রথমে রয়েছে(সুরা ২,৩,৭,১৩,২৯,৩০,৩১,৩২) এবং এসব কয়টি সুরায় মোট আলিফ রয়েছে ১২৩১২ বর, লাম রয়েছে ৮৪৯৩ বার এবং মীম রয়েছে ৫৮৭১ বার যার লাম ও মীম এর সংখ্যা আলাদাভাবে ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (৮৪৯৩= ১৯ স ৪৪৭, ৫৮৭৯ = ১৯ স ৩০৯)।

কিন্তু আলিফ হরফ এ ৮টি সুরা ব্যতীত আরও ৭টি সুরাতেও ব্যবহৃত হয়েছে ৫টি সুরায় الـــر। হিসেবে, একটি সুরায় (৭) المص।হিসেবেএবং একটি সুরায় (১৩) المر। হিসেবে। এসমস্ত সুরায় মোট আলিফের সংখ্যা ১৭৪৯৯ (১৯ স ৯২১) যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মোট ১৭টি সুরার প্রথমে মীম (م) হরফ ব্যবহৃত হয়েছে যার মোট মীমের সংখ্যা ৮৬৮৩ (১৯ স ৪৫৭) যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এমনিভাবে মোট লামের সংখ্যা (মোট ১৫টি সুরায়) হল ১১৭৮০ (১৯ স ৬২০) এবং এসংখ্যাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। আবার পূর্ব বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী এ তিনটি হরফের যোগফলও অবশ্যই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (৩৭৯৬২ = ১৯ স ১৯৯৮)।

(iii) الر।–এ তিনটি অক্ষর সমষ্টি মোট ৫টি সুরায় (১০,১১,১২,১৪ ও ১৫)। পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী শুধু এ ৫টি সুরার অক্ষর তিনটি

www.pathagar.com

সংখ্যার যোগফল যদিও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়, কিন্তু সুরা রাদের (১৩) যা الـمـر দিয়ে শুরু রা (ر) হরফের সংখ্যা এ সঙ্গে যোগ দিলে طسم ، يس، طه এর মত এখানেও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। এ ৫টি সুরার ا، ل، م হরফ এয়ের সংখ্যা ৯৫৭২ ও সুরা রাদের ر হরফের সংখ্যা ১৩৭ এবং এদের যোগফল ৯৭০৯ (৯৫৭২+১৩৭= ৯৭০৯ =১৯ স ৫১১)। উনিশের গুনফল।

(১) عسق এ তিনটি হরফ সমষ্টি একমাত্র ৪২ নম্বর সুরা আশ-শুরার প্রথমে ব্যাবহারিত হয়েছে । এ সূরায় এ তিনটি হরফের মোট সংখ্যা মাত্র ২০৯ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯ X ১১)=২০৯। এ ছাড়া আর একটি মাত্র সুরায় (১৯) ع হরফ ব্যবহৃত হয়েছে-সুরা মরিয়মের كهيعص অক্ষর সমষ্টির অংশ হিসেবে। ১৯ ও ৪২ এ দুই সুরায় মোট ع হরফের সংখ্যা ২২১ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে পাঁচটি সুরায় س ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মোট س এর সংখ্যা ৩৮৭ (যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়) আর যে দুটি সুরার প্রথমে ق হরফ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মোট ق এর সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ এর গুনফল। এখন যেসব সুরায় ق، ع، س হরফ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের সকল ق،س، ع হরফের সংখ্যার যোগফল (২২১+৩৮৭+ ১১৪= ৭২২= (১৯ স ৩৮) যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

(ঘ) চার অক্ষর বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন অক্ষর যুক্ত ছুরা।

(i) الـمـص চারটি অক্ষর মাত্র সুরা আল-আরাফ (৭) এর প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সুরার এ চারটি অক্ষরের সংখ্যা যথাক্রমে ২৫৭২,১৫২৩,১১৬৫ এবং ৯৮ যার প্রত্যেকটি আলাদা ভাবে ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয় কিন্তু তাদের যোগফল ৫৩৫৮ (১৯ স ২৮২) ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

(ii) الـمـر এ চারটি অক্ষর এক সঙ্গে কেবল সুরা আর-রাদের (১৩) শুরুতে রয়েছে । এতে চারটি অক্ষরের সংখ্যা যথাক্রমে - আলিফ

www.pathagar.com

৬২৫ বার, লাম ৪৭৯ বার, মীম ২৬০ বার এবং সা ১৩৭ বার, যার প্রত্যেকটি আলাদাভাবে ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। কিন্তু الـمـص। এর মত এদেরও যোগফল ১৫০১ (১৯ স ৭৯) ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

(ঙ) পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমষ্টি যুক্ত ছুরাঃ

كهيعص এ পাঁচটি অক্ষর সমষ্টি একমাত্র সুরা মরিয়ম (১৯) এর শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়া আর কোন সুরায় পাঁচটি বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমষ্টির ব্যবহার নেই। এ পাঁচটি হরফ এ সুরায় যথাক্রমে ১৩৭, ১৬৮, ৩৪৫, ১২২ ও ২৬ বার রয়েছে যার প্রত্যেকটি আলাদাভাবে ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। কিন্তু এদের যোগফল ৭৯৮ (১৯ স ৪২) দিয়ে বিভাজ্য।

এখন বুঝা যাচ্ছে যে বিচ্ছিন্ন অক্ষর যুক্ত সুরাগুলোতে সেই সব অক্ষরের সংখ্যার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই কোন লেখকের নিজস্ব হিসেব অনুযায়ী রচিত হতে পারে না। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই পবিত্র কোরআনের রচয়িতা স্বয়ং মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা এবং সে জন্যই এরূপে অলৌকিক মোজিযা সম্ভব হয়েছে।

সুতরাং কোরআনের প্রথম আয়াত বিসমিল্লাহ শরীফে ১৯টি অক্ষরের সঙ্গে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন গানিতিক সম্পর্ক খুবই বিস্ময়কর এবং কোরআন যে নবীজীর শেষ্ঠতম মোজেযা তারও একটি অকাট্য প্রমাণ।

বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর অর্থ না জানলেও তাদের নতুন বিশেষত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। কোরআন যুগে যুগে এমনিভাবে মানুষকে তার অলৌকিকত্বের আরও অনেক পরিচয় দেবে তা আশা করা অযৌক্তিক নয়।

এ ছাড়া আরও একটি বিষয় খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কেরাআনের কতগুলো শব্দ লেখার পদ্ধতি বা বানন মহানবীর নির্দেশিত কোরেশী কায়দায় চালূ বলে সেসব শব্দ সাধারণ আরবী সাহিত্যের বানান থেকে আলাদা। আজ চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত এ শব্দগুলো কোরআনে একই ভাবে লেখা হচ্ছে এবং এর কোন রূপ ব্যতিক্রম না-জায়েজ বলে স্বীকৃত। উদহারণ স্বরূপ

www.pathagar.com

সালাত হায়াত ও জাকাত ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত সাহিত্যিক বানানে না লিখে কোরআনে যেভাবে লিখা হয় তাতে তাদের উচ্চারণ হয়, সালাওয়াত, হায়াওয়াত, ও যাকাওয়াত। অবশ্য কোরআনে এভাবে লেখা হলেও উচ্চারণ সালাত, হায়াত, ও যাকাতই করতে হয়। এখন যদি নবির নির্দেশ অমান্য করে সাহিত্যিক বানানে কোরআন লেখার অনুমতি থাকতো তবে এ গানিতিক হিসাব যা আমরা উপরে আলোচনা করলাম তা সম্ভব হত না।

এ বিষয়ে আরও একটি উদাহারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোরআনে বিসমিল্লাহ শব্দ লেখা হল (بسم الله) ب হরফের পর س হরফ লেখে কিন্তু প্রকৃত শব্দটি হল باسم অর্থাৎ ب হরফের পর اسم দিয়ে লেখা, কিন্তু নবীজীর নির্দেশ এই শব্দটি بسم লেখা হচ্ছে। তা না হলে বিসমিল্লাহ শরীফের অক্ষর সংখ্যা উনিশ না হয়ে বিশ হতো আর এ গাণিতিক মোজেযার মূল কাঠামোই ভেঙ্গে পড়তো।

সুতরাং এ সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজেযা থেকে বুঝা যায় যে, যুগে যুগে আল-কোরআন এমনিভাবে মানুষকে তার অলৌকিকত্বের আরও অনেক পরিচয় দেবে তাতে কোন সন্দেহে নেই।

ক

মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি সাহেবের "Index to the words of the glorious Quran এবং ডঃ মুহাম্মদ গুলাম মুয়াজ্জম সাহেবের কুরআনে বিজ্ঞান নামক গ্রন্থদ্বয় হতে আমি যে অংশটুকু উদ্ধৃত করেছি, তা মুলত পবিত্র কুরআনের ১৯ সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা মুলক অত্যন্ত দুরূহ ও অধ্যবসায়ের কাজ। এটা পবিত্র কুরআন সমন্ধে গবেষক ও চিন্তাশীলদের সরল পথের দিশারী হিসেবে কাজ করবে। তাঁদের এই উচ্চ প্রশংসনীয় শ্রম সাধ্য কাজের জন্য আল্লাহ গাফুরর রাহমানুর রাহিমের দরবারে তাঁদের উভয় জাহানের কামিয়াবি কামনা করছি। আমিন।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক

মুযেযা - ৫

(কোরআনের মত অখন্ড মোযেযা এবং হাফিজ অন্য কোন প্রচলিত ধর্ম-শাস্ত্রের নাই)

(হযরত সোলেমানের (আঃ) অনুগত

ধর্ম প্রাণ হুদহুদ পাখির (Hoopoe) মারফত সাবারের অহঙ্কারিনী রানী বিলকিসের কাছে প্রেরিত পত্রে শাশ্বত সর্বজনীন উনিশ (১৯) বর্ন বিশিষ্ট পবিত্র বিছমিল্লাহ শরিফের উল্লেখ দেখা যায়। পবিত্র কুরআনুল হাকিমের ভাষা এরূপ "(২৯)সে বলেছিল (বিলকিস রাণী) হে পারিষদ বা প্রধানগণ নিশ্চয় আমার কাছে এক সম্মানিত পত্র প্রেরিত (হুদহুদ পাখি দ্বারা ফেলা) হয়েছে। (৩০) নিশ্চয় এটা হযরত সোলেমান হতে এসেছে এবং নিশ্চয় এটা সর্বপ্রদাতা করুনাময় আল্লাহর নামে শুরু হয়েছে। (৩১) যেন তোমরা আমার (সোলেমানের)সামনে অহঙ্কার না কর এবং আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর।"

১৯ পারা , ২৭ ছুরা নমল ২৯,৩০ ও ৩১ আয়াত

ক্ষুদ্র জ্ঞানী মানবিক জ্ঞানে উক্ত (৩০) আয়াতের বিছমিল্লাহ শরীফের ১৯ বর্ণ নিয়ে এ-যাবৎ যা সম্ভব হয়েছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে, কুরআনে বিজ্ঞান নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১০৩ ডঃ মোঃ গোলাম মুয়াযযাম)। এবং এ পবিত্র বিছমিল্লাহ শরীফের ১৯ (উনিশ) এর মোযেযার রহস্য কেয়ামত পর্যন্ত আরো কত কি উন্মোচিত হবে তা একমাত্র সর্বজ্ঞ আলেমুল গায়েবই জানেন।

ছুরা মোদ্দাছছেরের ৩০ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত ১৯ সংখ্যার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তফছির কারকের অনেকেই দোজখের ১৯জন ফেরেস্তা বলেই মনে করেছেন। আবার কোন কোন তফছিরকারক ছুরা মোদ্দাছছেরের ৩০ নম্বর আয়াতের 'উনিশ' 'কেন' প্রশ্ন রেখে গেছেন এবং পবিত্র কুরআনের ইংরেজী অনুবাদক জগদ্বিখ্যাত স্বনামধন্য আল্লামা ইউছুফ আলিও। যা হউক, আমার মতে ...

www.pathagar.com

ছুরা মোদ্দাছেছিরের ৩০ নং আয়াতে দোজখের উনিশ জন ফেরেস্তার কথা শুনে অলীদ বিন মুগীরা, আবুজেহেল প্রভৃতি পাপিষ্ঠরা বলে "আমরা অতলোক দোজখে থাকতে উনিশ জন পাহারাদার আমাদের কি করতে পারবে।" আমরা কয়েকজন মিলে এক একজন দোজখের পাহারাদার ফেরেস্তাকে দোজখে ফেলে আমরা নিরাপদে বেহেস্তে চলে যাব। উনিশজন পাহারাদার আমাদের কি করবে? আমরা একশ লোকেও ১৯ জন ফেরেস্তার সাথে পারব না? জাহান্নামীদের উপহাস বিদ্রূপের জবাবে আল্লাহ বলেন "হে অবিশ্বাসী ভ্রান্ত জিন ও মানুষ তোমরা মনে রেখো যে, দোজখের পাহাদার ফেরেস্তারা তোমাদের মত দুর্বল শক্তিহীন নয়। এক জন ফেরেস্তার কাছে লক্ষ কোটি জিন-এনছানও অতি নগণ্য। এক একজন ফেরেস্তার শক্তি সমস্ত জীন ও এনছানের সমবেত শক্তি অপেক্ষাও অনেকগুণ বেশী। ফেরেস্তাদের শক্তির পরিমান সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া জিন ও এনছানের কেউ অবগত নয়। কাফেরদের উপহাস বিদ্রূপে সন্দিহান হয়ে, যাতে আল্লাহর মোমেন মুছালমানরা বিপথগামী পথভ্রষ্ট না হয়, সে জন্যই আল্লাহ রহমানুর রহীম এসব বিষয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ পবিত্র কুরআনুল করিম পুর্নাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে নাযিল করেছেন।

এসব কথাগুলো পবিত্র কুরআনুল করিমে এভাবে বিবৃত হয়েছে, "(১৬) মোটেই না। অবশ্য সে (অলীদবিন মুগীরারা) আমার আল্লাহর নিদর্শনবলীর (আয়াতাবলীর) বিপরীতাচরন করতেছে, (১৭) অদূরেই আমি তাকে তিরস্কার ও লাঞ্চনায় উঠায়ে নেব। (১৮) অবশ্য সে চিন্তা করেছে এবং বুঝতে পেরেছে, (১৯) অতএব সে ধ্বংস হবে। এটা সে কিভাবে বুঝতে পারবে। (২০) তার পর সে ধ্বংস হবে-এটাকি ভাবে বুঝতে পারবে? (২১) তার পরে সে লক্ষ্য করেছিল, (২২) তারপর সে উপহাস করেছিল ও বিদ্রূপ করেছিল। (২৩) তারপর সে ফিরে গিয়েছিল ও অহংকার করেছিল। (২৪) তারপর সে বলেছিল—এটা অনুকরণ করা যাদু ছাড়া নয়। (২৫) এটা (কোরআন) ত মানুষের কথা মাত্র। (২৬) অদূরেই আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব?

www.pathagar.com

(২৭) এবং তুমি কি জান যে ছাকার নামক জাঁহান্নাম কি? (২৮) ওটা অবশিষ্ট রাখেনা এবং ত্যাগও করে না। (২৯) ওটা মানুষকে ঝলসায়ে দেয়। (৩০) তার (কোরআনের) উপর উনিশ (১৯) জন রয়েছে। (৩১) এবং আমি ফেরেস্তাদেরকে ছাড়া কাউকেই জাহান্নামের পাহারাদার করি নাই; এবং আমি কাফিরদের পরীক্ষার জন্য ছাড়া ওদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করি নাই। এহেতু যে যাদেরকে কেতাব দেওয়া হয়েছে, তারা যেন নিশ্চিত হয় এবং যারা ইমান এনেছে তাদের ইমান বৃদ্ধি পায়; এবং যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছে তারা এবং ইমানদারেরা যেন সন্দেহ না করে, এবং যাদের অন্তর সমূহে রোগ আছে তারা এবং কাফিরেরা যেন বলে যে, এ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ কি ইচ্ছা করেছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখায়ে থাকেন; এবং তোমার রবের সেনাদন সমন্ধে তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না; এটা মানুষের ও জিন-এনছানের জন্য সদুপদেশ ছাড়া নয়"।

২৯ পারা ৭৪ সুরা মুদ্দাচ্ছের ১৬-৩১ আয়াত ।

উক্ত পবিত্র আয়াত গুলো হতে আমরা প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর আমাদের দুনিয়া-আখেরাতের চলার পথ পরীক্ষা করে নিতে পারি।

(ক) নিদর্শনাদি বা পবিত্র কুরআনের প্রতিকুলে গিয়ে অলীদ বিন মুগীরার পরিনাম কি হয়েছিল এবং কেন?

(খ) আমরা যারা কেতাবের অনুসারী আমাদের অবস্থান বর্তমানে কোথায়?

(গ) অসংখ্য ফেরেস্তা থাকতে তার উপর 'উনিশ' এই উনিশ কেন এবং তার উপর অর্থ কি?

ক

অলীদ বিন মুগীরা তখনকার আইয়ামে জাহেলিয়াত জমনার

www.pathagar.com

প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্যতম ছিল। সে রছুলুল্লাহর (সঃ) কাছে পবিত্র নিদর্শনাদি (কুরআনের আয়াত শরিফ) শুনে (শাশ্বত সত্য আল্লাহর বানী) বুঝতে পেরেও আবু জেহেলের কুমন্ত্রণা ও কুপ্ররোচানা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে, তার ধন-জন গর্বে মোহান্ধ হয়ে, পবিত্র কুরআনের আয়াতাবলীকে (নিদর্শনাবলীকে) উপহাস বিদ্রূপ করে সদম্ভে ফিরে যায় এবং রছুলুল্লাহকে (সঃ) যাদুকর (নাউযুবিল্লাহ) বলে অভিহিত করে। সে পবিত্র আয়াতাবলীর বিরুদ্ধে প্ররোচনার আশ্রয় নিয়েছিল। মুলতঃ সে পবিত্র আয়াত শরিফের প্রতিকুলে অবমাননাকর আচার আচরণ ও কার্যকলাপের ফলে তার পরিণাম স্থল সহায় সম্বলহীন যন্ত্রণাদায়ক আধ পোড়া-আধা মরা অবস্থায় অনন্তকাল অবস্থান করবে সেই ভীষন বিভীষিকাময়! 'সাকার' নামক জাহান্নামে। এই জ্বালা পোড়াদায়ক ভয়ঙ্কর শাস্তির সূচনা ঘটে পবিত্র শাশ্বত সত্য কুরআনের আয়াত বা নিদর্শনাবলীর প্রতি অবজ্ঞার কারনে। এত অলিদ বিন-মুগিরার পারিণাম। আমাদের অবস্থান বর্তমানে কোথায়? তা হতে কি আমাদের পথ-নির্দেশ পেতে পারি না?

খ

এই পাপিষ্ঠ নরাধম অলীদ বিন মুগীরার পরিণতির প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন হচ্ছে—আজ আমরা যারা পবিত্র আয়াত বা নিদর্শনাবলীর তথা পবিত্র কুরআনের অনুসারী তারা পবিত্র কুরআনের হুকুম আহকামের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বিরোধী সুদ, ঘুষ, জুয়া, বেপর্দা, লিভটুগেদার (যার জন্মস্থান সহশিক্ষা বা ধর্মনিরপেক্ষ 'Secular' শিক্ষা) প্রভৃতির নীরব বা সহায়ক ভূমিকা পালন করছি কিনা? এই যদি অবস্থা হয় তবে আমাদের শরীর, কাপড়, যায়গা পাক কিনা? হউক এসবের দাতা, না হয় গ্রহীতা; আর আমাদের কলেমা নামাজ জেহাদ রোজা, যাকাত ও হজ্জের অবস্থা কি? কবে কখন এবং কার আমল হতে 'জেহাদ ফি ছাবিলিল্লাহ' ষষ্টবেনা হতে নির্বাসিত হলো এবং কেন? অলীদ বিন মুগীরার ঘটনা হতে আমাদের কি কিছু ছবক নেয়া কর্তব্য নয়?

দ্বীন ইছলামের পঞ্চবেনার মধ্যে হাজার দিক, দর্শন ও আদর্শ রয়েছে। তম্মধ্যে, অন্যতম প্রধান আদর্শ হচ্ছে— পবিত্র কালেমায়

www.pathagar.com

আল্লাহতে অখন্ড ইমানী জেহাদের সুশিক্ষা দেয়; নামাজে জেহাদের জন্য একতার শিক্ষা দেয়; রোজায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে জেহাদে সবর ও ধৈর্যের শিক্ষা দেয়; জাকাতে জেহাদে সম্পদ ত্যাগের শিক্ষা দেয়; হজ্জে জেহাদের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। পঞ্চবেনা পালনের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে দৈনিক পাঁচ বার জেহাদের জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণই দেয়া হয়। জেহাদ ছাড়া সুদ, ঘুষ, চুরি, রাহাজানি, মদ, জুয়া তথা-অনইছলামী কাজ-কারবার-আচার- ব্যবহার বন্ধ করা বা করানো সম্ভব নয়। পঞ্চবেনা ইছলামের খোলস। সামাজিক পঞ্চবেনা পালনে পূর্ণ কামিয়াবী সন্দেহাতীত নয়। যে পঞ্চবেনা, জেহাদ ও খেলাফতের অন্তরায়, সে পঞ্চবেনা অন্য কিছু হলেও দ্বীন-ইছলামের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কামিয়াবীর জন্য নয় এবং একেই বলে ধর্ম নিরপেক্ষতা বা সেকিউলারিষ্ট।

গ

পবিত্র কুরআনের ছুরা মোদ্দাছছেরের ১৬ (ষোল) নং আয়াত হতে ২৯(উনত্রিশ)নং আয়াতের সারমর্মে এটাই বুঝা যায় যে, নিদর্শনাবলী বলতে সুস্পষ্টত পবিত্র কুরআনকেই বুঝানো হচ্ছে। উল্লেখিত ছুরার ৩০(ত্রিশ) নং আয়াত তার উপর 'উনিশ'। মহা গূঢ় রহস্যাবৃত শাশ্বত সর্বজনীন এই উনিশ দ্বারা কি বুঝাচ্ছে?

এখানে (আলাইহা)-র 'আলা' মানি উপর এবং 'হা' মানি তার (কুরআনের)। এই একই 'হার' দু'টি অর্থ রয়েছে। যথা—

১। সাবধান! সতর্ক করা, ধর, গ্রহণ কর এবং ২। সম্বন্ধ পদে তার বা তাহার এবং একই 'হা' কর্মপদের তাকে বা তাহাকেও বুঝায়। (এই 'হা' ধর অর্থে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যেও ব্যবহৃত হয়)।

এটা সর্বনামের নামপুরুষ এক বচনে সম্বন্ধ বা কর্মপদের স্ত্রী লিংগ। একই বানানে 'যমিরের' অন্য অর্থ—গোপনিয়তা, গোপন রহস্য বা বিবেকও হয়।

www.pathagar.com

যা হউক আল্লাহর কুরআনের হেফাজতকারী যেমন তিনি তেমনি এর গোপন রহস্যও তাঁর হাতে। উক্ত 'হা' যমিরটির অর্থাবলীর প্রতি গভীর ভাবে প্রণিধান পূর্বক চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, এই 'হার' মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে এমন একটি ব্যঞ্জনা রয়েছে যার মধ্যে ধমক বা সাবধানতার আলামত স্পষ্ট হচ্ছে।

এই 'হা'র অর্থ (আমার মতে) সাবধান হয়ে সতর্কতার সাথে ইমান আন তার (পবিত্র কুরআনের)উপর। যেহেতু তার (কুরআনের) উপর অবশ্যই উনিশ সংখ্যাটি আছে।

সুতরাং 'হা' সাবধানে সতর্কভাবে তার (কুরআনের) আদেশ নির্দেশ ও কথা মান। কারণ এই কুরআনের নির্ভেজাল, নিঃসন্দেহ এবং খাটিত্ব ও আসলত্ব প্রমানের জন্য একক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে রয়েছে এই উনিশ বা উনিশ দ্বারা বিভাজ্যতা।

ছুরা নমলের যে রুকুতে বিছমিল্লাহ শরিফ রয়েছে তাতে সুলাইমান (আঃ) রানী বিলকিছকে অহংকার না করে আত্ম সমর্পনের আহবান ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এই রুকুর শির নামে বলা যায়, হযরত সোলাইমান ও সাবারের রানীর অহংকার প্রসঙ্গ প্রবল এবং পরের রুকুর শিরনামে বলা যায়, সোলাইমানের নিকট সাবার রানীর আত্ম সমর্পনের কথা। বিছমিল্লাহ শরিফ যে রুকুতে এবং বিছমিল্লাহ শরিফের পরের রুকু উভয় রুকুরই সার কথা অহংকার ও আত্ম সমর্পনের উপদেশ সম্বলিত ব্যাপার। এর আগে বা পরে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট কোন প্রসঙ্গ নাই। যদিও বিছমিল্লাহ শরিফে ১৯টি হরফ বা বর্ণ আছে।

আমার গবেষণায় ছুরা মোদ্দাছছেরের ৩০ নং বাক্যের (আয়াতের) ভাব ব্যঞ্জনা এবং এই আয়াতের পূর্বাপর যে প্রসঙ্গে অলীদ বিন মুগীরা ও আবুজেহেল কর্তৃক কুরআনের প্রতি অবমাননা ও ধৃষ্টতা পুর্ন আচরণ করার জন্য আল্লাহ তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়েই বলেছেন, "তার (আল-কুরআন) এর উপর ঊনিশ (১৯) যা দ্বারা আল-কুরআনের শাশ্বত সত্য যথানিয়ম বিভাজ্যতা নির্দিষ্ট হচ্ছে।

www.pathagar.com

তাছাড়া ছুরা মোদ্দাছছেরের যে রুকুতে ১৯ সংখ্যাটির উল্লেখ রয়েছে, সে রুকু পুরাটাই কুরআনের মোযেযা প্রসঙ্গে অবতারিত এবং এ রুকুর শিরনাম দেয়া যায়, হযরত রছুলে করিমের প্রতি দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত ওহী বা কুরআনের প্রতি আনুগত্য ও আত্ম সমর্পনের জন্য ধমক জনিত আদেশ এবং এ রুকুর পরের রুকুর ভাব ব্যঞ্জনাও আল্লাহর আদেশ নির্দেশ, হুকুম-আহকাম অমান্যকারীর প্রতি কঠোর আজাবের সতর্কবাণী এবং এক আল্লাহর সৎকাজ করে, পরকালে বিশ্বাস করে এবং মোশরেক নয় যারা তাদের প্রতি সুসংবাদ। এরুকুর শিরনাম হতে পারে মোশরেক কাফেরদের অন্তিম পরিণাম।

পবিত্র কুরআনকে যথা নিয়ম বিভাজ্যতার জন্য ছুরা মোদ্দাছছেরের ১৯ই নির্দিষ্ট হচ্ছে। ছুরা নমলের বিছমিল্লাহর ১৯ নয়। যদিও উভয়ের সংখ্যা এক।

একই ছুরা মোদ্দাছছেরের ত্রিশ আয়াত এই উনিশই নির্দিষ্ট হচ্ছে। বলা হচ্ছে অবিশ্বাসীদের পরীক্ষার জন্যই দোজখের ফেরেস্তাদের সংখ্যা নির্ধারিত ও নির্বাচিত করা হয়েছে। আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআনের মোযেযা রক্ষার্থে এই উনিশ সংখ্যাটি নির্বাচিত করেছেন। যাতে করে অবিশ্বাসীরা কুরআনের বাণী বিশ্বাস করে।

কারণ হিসেবে আল্লাহ বলেছেন— অবিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এবং বিশ্বাসীরা যেন তাদের কেতাবকে (আলকুরআন) নিঃসন্দেহ নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের ইমানকে বাড়ায়ে নেয় এবং যাদের অন্তর সমূহে রোগ, সন্দেহ আছে তারা এবং অবিশ্বাসীরা যেন বলে যে, এই উদাহারণ বা নিদর্শন দ্বারা আল্লাহ কি ইচ্ছা করেছেন?এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন এবং ফেরেস্তার শক্তি সামর্থ্য ও সংখ্যা সমন্ধে একমাত্র আলেমুল গায়েব আল্লাহই জানেন।

www.pathagar.com

এই আয়াতের মর্মার্থেও সংখ্যা তাত্ত্বিক উনিশ দ্বারা বিভাজ্য পবিত্র কুরআনের একক মোযেযা রক্ষার্থেই এই উনিশ নির্দিষ্ট হচ্ছে।

অধিকন্ত সুরা নমলের ৩০ আয়াতে উল্লেখিত বিছমিল্লাহ ছোলেমানের (আঃ) জমনার ঘটনা। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে দুর্দান্ত প্রতাপশালিনী রাণী বিলকিছের অহংকার ও দাম্ভিকতা এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যতার ব্যাপার। রানী বিলকিস ও ছোলেমানের (আঃ) জমনার ঘটনা আল্লাহ ওহী দ্বারা রছুলুল্লাহকে (সঃ) জানায়েছেন। কিন্তু ঘটনাটা রছুলুল্লাহর জমানার নয়। ছোলেমানের (আঃ) জমানায় আল্লাহর এবং কুরআনের অবাধ্য আবু জেহেল ও অলীদ বিন মুগীরা ছিলনা। কাজেই বিছমিল্লাহর উনিশ সংখ্যক হরফ বা বর্ন পবিত্র কুরআনের ১৯ দ্বারা বিভাজ্যতার সংগে মোটেই সম্পর্কিত নয়।

সুতরাং, আমার গবেষণায় ছুরা মোদ্দাছছেরের ৩০ নং আয়াতে নাযিল কৃত ওহীর ১৯ই যথা নিয়ম পবিত্র কুরআনের সংখ্যা তাত্ত্বিক বিভাজ্যতার একক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত মোযেযা নির্দিষ্ট হচ্ছে। পবিত্র কুরআনের এই ৫ম মুযেযা গ্রন্থকার নিজের রচনা।

তাই, বিশেষ করে যাঁরা এব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেন তাঁদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমার রচিত এই ৫ম মোযেযায় কোন ভুল ত্রুটি থাকলে তা আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংযোজনের জন্য ইনশাল্লাহ্ সচেষ্ট থাকব। গ্রন্থকার।

তারপরও, সম্মানিত চিন্তাশীল ওলামায়ে কেরাম ও মুফতিগনের প্রতি আমার দেয়া সংখ্যাতাত্ত্বিক ১৯ এর মুযেযা সম্বন্ধে মতামতের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। আমিন।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায় ঃ বিশ্বনবী ও খাতমে নবুয়াত
"বেদ ও পুরাণে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)"

ভূমিকা

ঐতিহাসিক বিষয়ে গবেষণা করার প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্খা ও অভিলাষ নিজের অন্তরে সর্বদা পোষণ করি। বেদ, বাইবেল, এবং বোদ্ধ-গ্রন্থে যে অন্তিম ঋষির আগমণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে তাহা মোহাম্মদ সাহেবই প্রমাণিত হন। অতঃপর আমার অন্তরে এই প্রেরণা জাগ্রত হয় যে, সত্য প্রকাশিত করা আবশ্যক, যদিও উহা কোন মানুষের নিকট অপ্রিয় লাগে। মোহম্মদ সাহেবের পূর্ব যুগে ভারত এবং আরববাসীগণের একই ধর্ম ছিল। ইহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান, কিন্তু উহা উদ্ধৃত করার ইহা উপযুক্ত স্থান নহে। আমি ধর্মীয় সংকীর্ণতার পক্ষপাতী নহি। যদি কোন স্থানে কোন সত্য কথা থাকে, তাহাকে অস্বীকার করার দুঃসাহস করতে পারি না। বেদসমূহে দ্বাদশ পত্নীধারী এক উষ্ট্রারোহী ব্যক্তির আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, যাঁহার নাম নরাশংস হইবে। সায়ন নরাশংস এর অর্থ করিয়াছেন যে, যিনি মানুষ কর্তৃক প্রশংসিত হন। কিন্তু আমার বিশ্লেষণ অনুসারে আমি সায়নের সহিত একমত নই। কারণ আমার মতে নরাশংস শব্দ এমন নর অর্থাৎ ব্যক্তিকে সূচিত করে; যাঁর নামের অর্থ হবে 'প্রশংসিত'। মোহম্মদ আরবী শব্দের অর্থ 'প্রশংসিত।' অতএব মোহাম্মদ এবং নরাশংস একার্থ বোধক শব্দ। আলোচ্য গ্রন্থে আমি যথাসাধ্য সত্য উদঘাটন করার প্রয়াস করিয়াছি।

মাধব মাস

শুক্ল পক্ষ, দ্বাদশী তিথি, বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়

সন ২০২৩

অনুবাদকের নিবেদন

পবিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্মসংস্থাপনাথায় সম্ভবামি যুগে যুগে। গীতা॥

www.pathagar.com

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা একক ও অদ্বিতীয়-একমেবাদ্বিতীয়াম। একমাত্র তিনিই প্রশংসার অধিকারী, একমাত্র তিনিই উপাসনা আরাধনার যোগ্য। তিনি বিশ্ব জগতের প্রভু; সারা বিশ্বের মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য, সত্যপথের সন্ধান দানের জন্য যুগে যুগে তিনি দূত প্রেরণ করিয়াছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। কিন্তু ভারতের কিছু মুর্খ ব্যক্তি ধারণা করে যে, প্রভুর দূত, ঋষি, মহাপুরুষগণ কেবলমাত্র ভারতবাসী হইবেন। অথচ আর্যরা ছিলেন ভারত বহির্ভূত ভিন্ন দেশের মানুষ; বেদ হলো অভারতীয় আর্যগণের ধর্মগ্রন্থ। বরং প্রকৃত সত্য কথা এই যে, পৃথিবীতে যখনই অনাচার, অধর্ম প্রবল হইয়া উঠে এবং পূর্বের ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হইয়া যায়, তখনই প্রভু নূতন দূত প্রেরণ করেন এবং নূতন ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। যাহারা হটকারিতা বশতঃ প্রভুর সেই দূতকে অস্বীকার করে এবং নূতন ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ না করিয়া কুসংস্কারে অন্ধভাবে লিপ্ত থাকে, তাহারা ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে যাহারা সেই দূতকে বিশ্বাস করিয়া নূতন ধর্মগ্রন্থের অনুসরণ করে, তাহারা সৎপথ লাভ করে।

পৃথিবীর মধ্যে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থ সমূহ পর্যালোচনা করিলে দৃষ্টিগোচর হইবে যে, উহাদের মধ্যে কোনটি হাজার বর্ষ, কোনটি কয়েক শত বর্ষ অবলুপ্ত, অপহৃত এবং মানব দৃষ্টির অন্তরালে অজ্ঞাত ছিল। আর্যগণ বেদকে অনার্যদের জন্য পাঠ করা, এমন কি শ্রবণ করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। বাইবেল শত্রুগণের আক্রমণে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের প্রামাণ্যতা সম্পর্কে স্ব স্ব ধর্মাবলম্বীগণ পর্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কোরান এমন এক ধর্মগ্রন্থ, যাহা একদিনের জন্যও মানব দৃষ্টির অগোচর হয় নাই। পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, নষ্ট হইলে, উহার পুনরুদ্ধার সম্ভব নহে। কিন্তু ত্রিশ খণ্ডের বিরাট কোরানের লক্ষ লক্ষ কণ্ঠস্থকারী বিদ্যমান, যাহার ফলে উহা আজ চৌদ্দশত বৎসর ব্যাপী অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় বিরাজমান। কোরানের এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে বিশ্বের কোন ধর্মগ্রন্থই সক্ষম নহে। সত্যই কোরান নিজেকে মহাপ্রভুর সত্য শাশ্বত ধর্মগ্রন্থরূপে দাবি করিতে পারে।

www.pathagar.com

ভারত তথা বিশ্ব, কল্কি অবতার বা শেষ মহাপুরুষের আগমণ সম্পর্কে উৎকর্ণ আছে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বিভিন্নভাবে উহার উল্লেখ আছে এবং সেই মহাপুরুষের বিভিন্ন পরিচয়গত লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। আমাদের বেদ পুরাণের বহু স্থানে উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মুসলমানগণ বলেন যে, সেই কল্কি যুগের শেষ মহাপুরুষ হইতেছেন- হযরত মোহাম্মদ। ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণায় বেদ ও পূরাণে উহাকে চার ভাগে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ নরাশংস অর্থাৎ প্রশংসিত মানুষ; ইহা মোহাম্মদ শব্দের অর্থরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অন্তিম ঋষি হিসাবে; কোরানেও হযরত মোহাম্মদকে শেষ নবিরূপে ঘোষণা করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ কল্কি অবতার রূপে; অর্থাৎ তিনি শেষ যুগের মহাপুরুষ হইবেন। হযরত মোহাম্মদও বর্তমান কল্কি যুগেই আগমণ করিয়াছেন। চতুর্থতঃ মোহাম্মদ নাম সহকারে বেদে উল্লেখ আছে। সুতরাং চতুর্বিধ দৃষ্টিকোণ দিয়া হযরত মোহাম্মদই চিহ্নিত হইতেছেন।

এই প্রসঙ্গে বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয় গবেষণামূলক তিনটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ঃ

(১) নরাশংস আওর অন্তিমঋষি

(২) কল্কি অবতার আওর মোহাম্মদ সাহেব

(৩) বেদ ও পুরাণ কি দৃষ্টিমে ধর্মীয় একতা কি জ্যোতি।

আমি উক্ত তিনটি গ্রন্থকে বাংলায় অনুবাদ করিয়া সমষ্টিগত হিসাবে-'বেদ ও পুরাণে হযরত মোহাম্মদ' নাম রাখিলাম।

আমার বিশেষ অনুরোধে প্রকাশক মহাশয় গ্রন্থটি সযত্নে মুদ্রিত করতঃ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি ইহা দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং ইহাকেই আমি আমার আসল পাণ্ডুলিপিরূপে গণ্য করিতেছি। সর্বসত্ত্ব প্রকাশকের অনুকুলে ত্যাগ করিলাম।

সত্য জ্ঞানের উন্মেষ হউক, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব সম্প্রীতি গড়িয়া উঠুক এবং ঈশ্বর সকলকে সত্যোপলব্ধি ও বিনা সঙ্কোচে সত্য গ্রহণ করার সৎ সাহস দান করুন এই শুভ কামনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি।

শ্রী অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়

www.pathagar.com

'নরাশংস' শব্দের অর্থ

'নরাশংস' শব্দ 'নর' এবং 'আশংস' এই দুই শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। নরের অর্থ মানুষ এবং আশংস শব্দের অর্থ প্রশংসিত। ইহা স্মরণীয় থাকে যে, 'আশংস' লৌকিক ভাষার কোন শব্দ নহে, বরং শুদ্ধ বৈদিক শব্দ। কতিপয় ব্যক্তি নরাশংসের অর্থ 'মানুষের প্রশংসা' বলেন। অন্যান্যদের মতে নরাশংসের অর্থ হচ্ছে-মানুষের দ্বারা প্রশংসিত। প্রথম অর্থ ষষ্টি তৎপুরুষ সমাস হইতে উদ্ভুত এবং দ্বিতীয় অর্থ তৃতীয় তৎপুরুষ সমাস হইতে উৎপন্ন। এখানে বিচার্য্য যে, নরাশংস শব্দের প্রকৃত অর্থ কি হইবে? প্রকৃত পক্ষে এখানে তৃতীয় বা ষষ্টি তৎপুরুষ সমাস হইতে উৎপন্ন দুইটি অর্থের কোনটিই নহে। বরং 'নরাশংস' শব্দ দ্বারা বিশেষ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। বেদের নরাশংস বিষয়ক অধ্যায়ে যে ব্যক্তির প্রশংসা গীত হইয়াছে, 'নরাশংস' শব্দ দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে।

অতএব নরাশংস শব্দ কর্ম্ম কারক-সমাস। উহা 'নরশ্চাসৌ আশংসঃ' সন্ধি বিচ্ছেদে গঠিত, যার অর্থ হচ্ছে-প্রশংসিত মানুষ। সুতরাং নরাশংস শব্দ কোন দেবতার উপর প্রযোজ্য হইবে না। নরাশংস শব্দ স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করে যে, "প্রশংসিত" যাঁর বিশেষণ হইবে, তিনি অবশ্যই মানুষ জাতির অন্তর্ভূক্ত হইবেন। যদি কেহ 'নর' শব্দটি দেববাচক বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আমি উহার সমাধানে স্পষ্ট করিয়া দিতেছি যে, নর শব্দ দেবতার পর্য্যায় বাচ্য নহে এবং দেবতাগণের অন্তর্গত কোন বিশেষ জাতি বাচকও নহে।

নরাশংসের ব্যাপকতা

লৌকিক সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের কোন স্থানে নরাশংস বিষয়ের কোন উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। একমাত্র বৈদিক গ্রন্থ সমূহের বিভিন্ন মন্ত্রে নরাশংস বিষয়ের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া সংহিতা গ্রন্থাবলীতে নরাশংসের বিষয়-যুক্ত পর্য্যাপ্ত পরিমানে মন্ত্র লিখিত হইয়াছে। অথর্ববেদ সংহিতার বিংশতি কাণ্ডের একশত সাতাইশ-তম সুক্তে নরাশংসের প্রশস্তি উপলক্ষে চৌদ্দটি মন্ত্র নিবদ্ধ আছে। সকল বেদের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে ঋগ্বেদ।

www.pathagar.com

ঋগ্বেদের অসংখ্য স্থানে নরাশংসের উল্লেখ আছে। এমন কি ঋগ্বেদের আটটি মন্ত্রই 'নরাশংস' শব্দ দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রথম (মন্ডল) অধ্যায়ে,

(১) ত্রয়োদশ সুক্ত, তৃতীয় মন্ত্র;

(২) অষ্টাদশ সুক্ত, নবম মন্ত্র;

(৩) একশত ছয় সুক্ত, চতুর্থ মন্ত্র সমূহে নরাশংসের বর্ণনা আছে। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে-

(৪) তৃতীয় সুক্ত, দ্বিতীয় মন্ত্র; পঞ্চম অধ্যায়ে-

(৫) পঞ্চম সুক্ত, দ্বিতীয় মন্ত্র; সপ্তম অধ্যায়ে-

(৬) দ্বিতীয় সুক্ত, দ্বিতীয় মন্ত্র; দশম অধ্যায়ে-

(৭) চৌষট্টিতম সুক্ত, তৃতীয় মন্ত্র এবং

(৮) একশত বিরাশিতম সুক্ত, দ্বিতীয় মন্ত্র সমূহে নরাশংসের প্রশস্তি গীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সামবেদ সংহিতার তেরশত উনপঞ্চাশতম মন্ত্রে এবং বাজসনেয়ী সংহিতার উনত্রিশ অধ্যায়ে সতাশতম মন্ত্রেও নরাশংসের বিষয় পরিদৃষ্ট হয়। অনন্তর তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও (৩/৬/৩/১) নরাশংসের প্রশংসা উল্লেখিত আছে। অধিকন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম কাণ্ডে দর্শপৌর্ণ মাসেষ্টি বিষয়ক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত পঞ্চ প্রয়াগ সমূহে "নরাশংস-প্রয়াগ ভাগ" উল্লেখিত হইয়াছে। এইভাবে ইহা স্পষ্ট হয় যে, নরাশংসের বিষয় কেবল মাত্র একটি বেদে নহে, বরং ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব বেদ সমূহের সর্বত্র পরিব্যপ্ত হইয়া আছে।

নরাশংসের কাল নির্ণয়

কোন গ্রন্থে যখন কোন ব্যক্তি বিশেষের আগমণের বর্ণনা করা হয়, তখন নিশ্চয় গ্রন্থ-রচনা তাঁর আগমণ কালের পূর্বেই হইয়া থাকে। অন্যথায় গ্রন্থে তাঁর আগমণ-সম্ভাবনার বর্ণনা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ ধারণা করেন যে, নরাশংসের স্থিতি কাল বেদ অবতরণের পূর্বেই গত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে তাঁর ধারণা অথর্ব বেদের বিংশতি কাণ্ডের অন্তর্গত একশত সাতাশ সুক্ত, প্রথম মন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিস্থী। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নরাশংস বেদ

www.pathagar.com

অবতরণের পূর্বকালে ছিলেন না, বরং বেদ অবতরণের পরবর্তী যুগের মানুষ হইবেন। ব্রহ্ম বাক্যে-ঘোষণা করা হইয়াছে যে,- "হে বিশ্ব-মানব শুনো; এখানে নরাশংসের প্রশংসা করা হইবে"। এই ব্রহ্ম বাক্য অথর্ব বেদে আছে। অথর্ব বেদ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সাম বেদ বেদত্রয়ের অনেক পরবর্তী যুগের বেদগ্রন্থ। সুতরাং নরাশংসের আগমন কাল, অথর্ব বেদেরও পরবর্তী কোন যুগে হওয়া নির্দিষ্ট হইল। নরাশংসের বাহন উষ্ট্র হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, যে-যুগে উষ্ট্র সওয়ারির বাহনরূপে ব্যবহৃত হইবে, সেই যুগে নরাশংস আবির্ভূত হইবেন।

নরাশংসের স্থান নির্দ্ধারণ

নরাশংসের আবির্ভাব-স্থান সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে বাহ্য প্রমাণ নাই। কিন্তু স্থান-নির্দ্ধারণ ব্যতীত তাঁর উৎপত্তি-স্থান নির্ণয় সম্ভব নয়। সুতরাং নরাশংসের স্থান সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করা একান্ত আবশ্যক। এখানে নরাশংসের স্থান নির্ণয় করিতেছি। বেদে নরাশংসের একটি পরিচয় লক্ষণ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি উষ্ট্রের উপর আরোহন করিবেন। কোন ব্যক্তি যে দেশে, যে যুগে বা পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে সেই দেশ ও যুগের ভাষা, বেশভূষা এবং বাহনের উল্লেখ করা হয়। নরাশংসের উষ্ট্রারোহী হওয়ার কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিবেন, সে স্থানে উষ্ট্রের প্রাচুর্য্য থাকিবে। সাধারণতঃ মরুভূমিতেই উষ্ট্রের প্রচুরতা বিদ্যমান। এইভাবে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, নরাশংস এমন মরুভূমিতে আবির্ভূত হইবেন, যে স্থানে উষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে।

নরাশংসের গুণাবলী ও মহত্ব

বেদসমূহে যত মন্ত্র বিদ্যমান, তন্মধ্যে অধিকাংশ পরমেশ্বরের গুণাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করে। কিছু সংখ্যক মন্ত্রে অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ আছে। নরাশংসের মতই ইহা দ্বারাই স্পষ্ট হয় যে, বেদে তাঁর প্রশস্তি-গাথা গীত হইয়াছে, এমন কি ঋগ্বেদ-যুগে যজ্ঞ করার সময়ও নরাশংসের স্তুতি নিবেদন করা হইত। স্তুতি গীত

www.pathagar.com

হওয়ার সময় তাঁকে "প্রিয়" (Beloved) বলিয়া সম্বোধন করা হইত। নরাশংসের মধুর ভাষণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ঋগ্বেদে তাঁকে সাক্ষাৎ "মধুজিহ্ব" বিশেষণে বিভূষিত করা হইয়াছে।

১। **পরোক্ষ-জ্ঞান ঃ**— 'মধুজিহ্ব' অর্থাৎ মধুরভাষী অপেক্ষা তার বিশেষ উচ্চ গুণ ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, তিনি পরোক্ষ জ্ঞান বা ওহী (২৭ পারা ৫৩ নজম, ৩ ও ৪ আয়াত) প্রাপ্ত হইবেন। পরোক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তিকে "কবি" (ঈশ্বরের দূত) বলা হয়। কবির সাধারণ প্রতিভা থাকে। চন্দ্র, সূর্য্য তথা দেবতাগণও যে স্থানে পৌঁছাইতে অক্ষম, যিনি সে স্থানেও উপনীত হন এবং যিনি আধ্যাত্মিক সম্রাট হন, তাঁকে 'কবি' বলা হয়। 'ক' এর অর্থ ঈশ্বর। 'ক' অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁর সম্বন্ধ এবং ঈশ্বরকে যিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত হন, তিনিই 'কবি'। অভিধানে কবি শব্দের অনেক অর্থ আছে—যথা, প্রতিভাবান, চতুর, বুদ্ধিমান, বিচারক প্রশংসনীয় এবং সন্তঋষি ইত্যাদি। ঋগ্বেদে নরাশংসকে 'কবি' বলা হইয়াছে।

২। **সুন্দর কান্তি ঃ**—ঋগ্বেদে নরাশংসের পরিচয়-লক্ষণ ও মহত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহাকে "স্বর্চি" বলা হইয়াছে। স্বর্চি শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ হইতেছে—'শোভনা অর্চিয়স্য সঃ' অর্থাৎ সুন্দর দীপ্তি ও কান্তি দ্বারা যুক্ত। 'অর্চি' শব্দের অর্থ দীপ্তি এবং 'সু' শব্দের অর্থ হইতেছে সুন্দর। 'স্বর্চি' শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি এরূপ সুন্দর কান্তিময় ব্যক্তি হইবেন, যাঁর মুখমণ্ডল হইতে জ্যোতি রশ্মি উদ্ভাসিত হইবে। ঋগ্বেদে যে স্থানে নরাশংসকে 'স্বর্চি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে ইহাও স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার মহত্ব-প্রভায় সকল গৃহ আলোকিত হইবে। অর্থাৎ এমন কোন গৃহ থাকিবে না, যেখানে তাঁহার প্রশংসা উচ্চারিত হইবে না। ইহার ফলে নরাশংস নামের (আভিধানিক) অর্থের দিক দিয়াও সামঞ্জস্য পূর্ণ হইবে। কারণ নরাশংস শব্দের অর্থ ইতেছে—এমন ব্যক্তি যিনি প্রশংসিত হন তথা প্রশংসিত মানুষ। নরাশংস সম্পর্কে 'প্রতিধামান্যঞ্জন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'অঞ্জন' শব্দটি 'অঞ্জ' ধাতুতে 'শতৃ' প্রত্যয়ের সংযোগে গঠিত হইয়াছে। 'অঞ্জ'র অর্থ প্রকাশিত হওয়া এবং প্রতিধামান্যি'র অর্থ প্রত্যেক গৃহে গৃহে। যদি কেহ ইহা ধারণা করেন

www.pathagar.com

যে, অগ্নিও 'অঞ্জ' ধাতু হইতে উৎপন্ন—যাহা প্রকাশক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্জ্বলনকারী।

অতএব নরাশংসের ক্ষেত্রে 'অঞ্জ' ধাতু হইতে উদ্ভূত 'অঞ্জন' শব্দ ব্যবহার করায় ইহা অনুমান করা যায় যে, তিনি প্রত্যেক গৃহকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিবেন। কিন্তু এরূপ অনুমান করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ প্রত্যেক শব্দ যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তদোপযুক্ত অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যদি শব্দের অর্থ গ্রহণ করার বিষয়ে প্রয়োগ ক্ষেত্রের সামঞ্জস্যতা ও উপযুক্ততা বিবেচনা করা না হয়, তাহা হইলে বিরাট বিভ্রম ও অনর্থ সৃষ্টি করিবে। যেমন ভজনের সময় কথিত "সৈন্ধব লতায়ো" বাক্যে 'সৈন্ধব' শব্দের অর্থ ঘোড়া গ্রহণ না করিয়া 'লবণ' অর্থ গ্রহণ-যোগ্য হওয়া উচিৎ।

তদ্রূপ যাত্রাভিনয়ের সময় ব্যবহৃত "সৈন্ধব" শব্দ দ্বারা লবণ অর্থ না হইয়া 'ঘোড়া' গ্রহণ করা বিধেয়। ক্ষেত্র বিশেষে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রযোজ্য হইবে। তদ্রূপ পার্থিবক্ষেত্রে 'প্রকাশ' দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত করা বুঝায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে 'প্রকাশ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' এবং 'অন্ধকার' শব্দের অর্থ 'অজ্ঞানতা' নির্দেশ করে। নরাশংসের আধ্যাত্মিকতাকে 'কবি' শব্দ দ্বারা সুচিত করা হইয়াছে। সুতরাং (অঞ্জন) 'প্রকাশ' শব্দ দ্বারা 'জ্ঞান' অর্থ নির্দ্দেশিত হইবে। 'গৃহে গৃহে প্রকাশিত করণ' এর তাৎপর্য্য হইতেছে, নরাশংস গৃহে গৃহে (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান প্রকাশিত ও প্রসারিত করিবেন।

অতএব ঋগ্বেদে তাঁহাকে 'জ্ঞানের প্রসারক' বিশেষণে বিভূষিত করা হইয়াছে।

৩। পাপ সমূহের নিবারক ঃ—নরাশংসকে "মানুষকে সকল পাপ হইতে নিবৃত্তকারী" বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তির মধ্যে যে গুণ নিহিত থাকে, তাঁকে সেই গুণই অন্যকে প্রদান করিতে বলা হয়। মন্ত্র সমূহের পাঠকারী....কুস্ত-আঙ্গিরস, ঋষি নরাশংসের নিকট অনুনয় করেন, তিনি যেন আবির্ভূত হইয়া মানুষকে সকল পাপ হইতে নিবৃত্ত ও বিরত করেন। উক্ত মন্ত্র হইতে উহা সূচিত হয় যে, প্রাচীনকালে ঋষিগণের অন্তরে নরাশংসের প্রতি প্রভূত অনুরাগ চিল। তাঁহারা একান্ত অভিলাষ পোষণ করিতেন যে, নরাশংস আগমণ করিয়া মানুষকে পাপ হইতে নিবারিত করিবেন। যদি কেহ উক্ত মন্ত্র সম্পর্কে

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করেন যে "বিশ্বস্মাত্রো অংহসো নিষ্পিপর্তন" এর অর্থ হইতেছে—সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন। সুতরাং 'মানুষকে সকল পাপ হইতে নিবৃত্ত করার' অর্থ কেন করা হয়? ইহার উত্তর এই যে, বেদসমূহে যে সকল মন্ত্র লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা মানুষের প্রার্থনার সময় পঠিত মন্ত্র অর্থাৎ পাঠ-মন্ত্র। উক্ত মন্ত্রসমূহ ব্যক্তিগত কল্যাণের উদ্দেশ্যে ঋষিগণ নিজেরা সংকলন করেন না। বরং উহা ঐশ্বরিক গ্রন্থ, কোন মানব বেদসমূহ তৈরী করিতে পারে না। কেবলমাত্র মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর কর্তৃক ঋষিগণের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং 'নো অল্হংসো নিষ্পিপর্তন' এর অর্থ মানব জাতিকে সকল পাপ হইতে নিবারিত করা নির্দ্ধারিত হইবে।

নরাশংসের প্রয়াগযোগঃ —

যাহারা সন্তান ও ধনলাভ করিতে অভিলাষ করে, তাহাদের জন্য নরাশংস প্রয়াগযোগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নরাশংস প্রয়াগের অর্থ এই যে, জনসাধারণের মধ্যে নরাশংসের জন্য যে প্রয়াগ প্রশংসিত, সেই যোগ-যজ্ঞ পালন করা। উহার পদ্ধতি এই যে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে "এ যজামহে নরাশংসো অগ্ন আজ্য বেতু ৩ বৌ ৩ ষটঃ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। পঠিত মন্ত্র সমূহে নরাশংসকে প্রশংসিত, কীর্তিমান এবং শান্তি প্রেমী প্রভৃতি গুণে বিভূষিত করা হইয়াছে।

নরাশংসের স্বরূপ ঃ —যিনি প্রশংসিত হন, তাঁহার মধ্যেই এমন মহত্ব ও গুণাবলী নিহিত থাকে, যার কারণে তাঁহার প্রশংসা করা হয়। যদি কেহ আত্ম-রক্ষা বা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে দুষ্টব্যক্তির প্রশংসা করে। তথাপি দুষ্ট ব্যক্তি স্বাভাবিক ক্ষেত্রে কোনক্রমেই প্রশংসার পাত্র নয়! তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, দুষ্ট ব্যক্তির দুষ্টতার যত প্রশংসাই করা হউক না কেন, উহা কম। এসব ক্ষেত্রে প্রশংসা শব্দ নিন্দার অর্থ ব্যঞ্জক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে কোন ব্যক্তি প্রশংসিত হওয়ার জন্য আট গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। অষ্টগুণাবলী হইতেছে— প্রজ্ঞা, কুলীনতা, ইন্দ্রিয় দমন, শ্রুতিজ্ঞান, পরাক্রম, অল্পভাষিতা, যথাশক্তি দানশীলতা এবং কৃতজ্ঞতা। সেইব্যক্তি মানবের অন্তরে স্থান লাভ করেন, যিনি মানব-বিদ্বেষী নহেন, উদার,ধর্ম্মানুরাগী, সদাচারি, নিন্দিত কর্ম্ম বর্জ্জনকারী ও ঈশ্বরে

www.pathagar.com

বিশ্বাসী হন। অধিকন্ত যিনি ক্রোধ, ইর্ষা, দর্প, লজ্জা, জড়তা এবং আত্ম-অহংকার হইতে পবিত্র হন। নরাশংসকে চিনিবার জন্য অথর্ববেদে কতিপয় নিশ্চিত পরিচয়-লক্ষণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

১। বাহন হিসাবে উষ্ট্রকে ব্যবহার কারী ঃ—

অথর্ববেদে নরাশংসের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করার মধ্যে বলা হইয়াছে যে, তিনি উষ্ট্রের উপর আরোহন করিবেন।

২। দ্বাদশ পত্নিধারী ঃ—

নরাশংসের নিকট দ্বাদশ পত্নী থাকিবে। অথর্ববেদের যে মন্ত্রে উষ্ট্রের আরোহনকারী সম্পর্কে বলা হইয়াছে, সেই মন্ত্রে দ্বাদশ পত্নির উল্লেখ আছে।

৩। একশত নিস্ক (স্বর্ণ) দ্বারা অলঙ্কৃত ও যুক্তঃ —

নিস্ক অর্থ স্বর্ণমুদ্রা। মানুষের বিপদের সময় স্বর্ণ অনেক উপকারে আসে। তদ্রূপ নরাশংসকে ঈশ্বরের তরফ হইতে একশত নিস্ক (স্বর্ণ মুদ্রা) প্রদান করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪। দশ মালাধারী ঃ —

মালাসমূহ গলার হার হিসাবে থাকে। "গলার হার" বলিতে অত্যাধিক প্রিয়জন ব্যক্তিকে বুঝায়। অথর্ববেদে বিংশতি কাণ্ডের একশত সাতাশতমসুক্ত, তৃতীয় মন্ত্রে উল্লেখিত আছে যে, নরাশংসকে ঈশ্বর দশটি মালা প্রদান করিবেন।

৫। তিনশত অর্বন দ্বারা যুক্ত ঃ —

অথর্ব বেদের উপরুক্ত মন্ত্রে নরাশংস তিনশত অর্বন প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

৬। দশ হাজার গাভী দ্বারা যুক্ত ঃ —

ঈশ্বরের নিকট হইতে নরাশংসকে দশ হাজার গাভী প্রদান করা হইবে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমি প্রমাণ করিব যে, বেদের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী উক্ত নরাশংস আবির্ভূত হইয়াছে কি না? যদি তিনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কে?

www.pathagar.com

নামগত সিদ্ধতা

১। **নামগত সিদ্ধতা** (৪ পারা ৩ এমরান, ১৪৪ আয়াত দ্রঃ) ঃ— নরাশংস সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থের দৃষ্টিকোন দিয়া ইহা স্পষ্ট হয় যে, নরাশংসের বুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্বিত নামধারী কোন ব্যক্তি নিশেষকে নির্দ্দিষ্ট করে; যিনি 'নর' অর্থাৎ মানুষ এবং 'আশংস' অর্থাৎ প্রশংসিত হইবেন। সুতরাং উপরোক্ত কারণ ও লক্ষণ দ্বারা এমন ব্যক্তি প্রমাণিত করা উচিত, যিনি একাধিকক্রমে মানুষ এবং প্রশংসিত হইবেন। এই দিক দিয়া "মহম্মদ" শব্দ 'হামদ'—প্রশংসা ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যার পূর্ণ অর্থ হইতেছে—"প্রশংসিত"। অনন্তর মহম্মদ সাহেব একজন মানুষ ছিলেন।

অতএব তাঁর মধ্যে 'নরত্ব' এবং 'অশংসত্ব' দুই গুণই বিদ্যমান। এইভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'নরাশংস' শব্দ আরবিতে 'মহম্মদ' শব্দ দ্বারা অভিহিত ব্যক্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যদ্রূপ 'জল' শব্দ যে পদার্থকে চিহ্নিত করে;Water, আব ও Wasser শব্দসমূহও সেই একই পদার্থকে নির্দ্দেশ করে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, জল সংস্কৃত শব্দ, Water ইংরাজী শব্দ, আব পার্শী শব্দ এবং Wasser জার্মাণ শব্দ; কিন্তু সকল শব্দ একই পদার্থকে অভিব্যক্ত করে। তদ্রূপ 'নরাশংস' সংস্কৃত ভাষার শব্দ এবং 'মহম্মদ' আরবি ভাষার শব্দ; কিন্তু উভয় শব্দ একই ব্যক্তি বিশেষকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এক্ষণে নামগত সামঞ্জস্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর ইহা বিচার্য্য যে, নরাশংস সম্পর্কে অন্যান্য যে সকল বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা মহম্মদ সাহেবের উপর প্রযোজ্য হয় কিনা।

২। **কালগত সিদ্ধতা**—নরাশংসের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে ব্যক্ত হইয়াছে যে, সেই যুগে উষ্ট্রকে বাহনরূপে ব্যবহার করা হইবে। মহম্মদ সাহেবও এমন যুগে আবির্ভূত হন, যখন উষ্ট্রকে সওয়ারীর বাহন রূপে ব্যবহার করা হইত। স্বয়ং মহম্মদ সাহেব উষ্ট্রের উপর আরোহন করিতে আসক্ত ছিলেন। মহম্মদ সাহেব উষ্ট্রের উপর আরোহন করিয়া মক্কা হইতে মদিনা উপনীত হন।

www.pathagar.com

৩। **স্থানগত সামঞ্জস্যতা**—নরাশংসের জন্মস্থান বালুকাময় মরুভূমি হইবে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মহম্মদ সাহেব মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। মক্কা মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত একটি স্থান। অতএব নরাশংসের সহিত মহম্মদ সাহেবের জন্মস্থানগত সামঞ্জস্যতা প্রমাণিত হইল।

৪। **গুণগত সামঞ্জস্যতা**—(ক) ঋগ্বেদে নরাশংসের জন্য 'প্রিয়' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মহম্মদ সাহেবও সকল মানুষের প্রিয় ছিলেন।

(খ) নরাশংসের পরোক্ষজ্ঞান (ওহী, ঐশ্বরিক বাণী) প্রাপ্ত হইবেন বলা হইয়াছে। মহম্মদ সাহেবও পরোক্ষ জ্ঞান তথা ঐশ্বরিক বাণী লাভ করেন। এনায়েত আহমদ প্রণীত "আলকালামুল মুবিন" গ্রন্থে ইহার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ লিখিত আছে যে, ইরান ও রোমের মধ্যে সংঘর্ষিত যুদ্ধে রোমবাসীদের পরাজিত হওয়ার পরেই মহম্মদ সাহেব পরোক্ষ জ্ঞান-দর্শিতার ক্ষমতাবলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তিনি এক ফেরেস্তা দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, আগামী নয় বৎসরের মধ্যে রোমগন বিজয় লাভ করিবে। এই ভবিষ্যদ্বানী করার পর নয় বৎসরের মধ্যেই ৬২৭ খৃষ্টাব্দে নিনওয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করেন। উক্ত ভবিষ্যদ্বানী সম্বলিত কোরানের ত্রিশতম সুরা "রুম" অবতীর্ণ হয়। কোরানের সুরা রুমের দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রোমজাতি পরাজিত হইয়া গিয়াছে। আরবভূমির নিকটবর্তী স্থানে তাহারা পরাজিত হওয়ার পর নয়বর্ষের মধ্যেই বিজয় লাভ করিবে। পূর্ববর্ত্তী সকল বিষয় আল্লাহ তায়ালার আয়ত্তাধীন। (২১ পারা, ৩০ রুম ২, ৩, ৪ আয়াত)

উপরুক্ত ঘটনা মহম্মদ সাহেবের পরোক্ষ-জ্ঞান, ঐশ্বরিক বাণী লাভের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

(গ) বেদসমূহে নরাশংসকে কবি বলা হইয়াছে। কবির এক অর্থ—কবিতা সংযোজনকারী এবং কবির আর এক অর্থ—ঈশ্বর সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ব্যক্তি। মহম্মদ সাহেবকেও "শায়ের" বলা হইত। "শায়ের" আরবি শব্দ, যার অর্থ জ্ঞানী (২৩ পারা ৩৭ সাফফাত ৩৬ ও ৩৭ আয়াত)। মহম্মদ সাহেব যেহেতু ঋষি ছিলেন, সেহেতু তিনি

www.pathagar.com

ঈশ্বর সম্পর্কেও জ্ঞানী ছিলেন। ঈশ্বরের সংবাদ দানকারী হওয়ার কারণে তাঁহাকে "নবি" বলা হইয়া থাকে। 'নবি' আরবি শব্দ; 'নবা' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'নবা' অর্থ সংবাদ এবং 'নবি' শব্দের অর্থ হইতেছে সংবাদ দানকারী।

(ঘ) **ঋগ্বেদে নরাশংস সম্পর্কে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে,** তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও কান্তিবান হইবেন এবং তিনি প্রতি গৃহে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করিবেন। মহম্মদ সাহেবও অত্যন্ত সুন্দর ও কান্তিবান ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য ও কান্তি দেখিয়া প্রত্যেক মানুষ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাঁহার মানুষকে আকৃষ্ট করিবার শক্তি সম্বন্ধে রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মীথ স্বীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ "মহম্মদ এণ্ড মহাম্মেডানিজমে" উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহম্মদ সাহেবের বিরোধী ব্যক্তিগণও তাঁহার আকর্ষণ-শক্তি ও প্রভায় প্রভাবান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইত। মহম্মদ সাহেবের বিরোধীগণ সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে প্রবল হওয়া সত্ত্বেও তিনি গৃহে গৃহে জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রকাশিত করার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেন। ডঃ তারাচন্দ্র মহাশয় "ইনফ্লুয়েন্স অব ইসলাম অন ইণ্ডিয়ান কালচার" পুস্তকের ভূমিকায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, মহম্মদ সাহেবের নিকট ঐশ্বরিক বাণী অবতীর্ণ হইতে থাকে; ফলে তিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরের সংবাদদাতা দূত হইলেন এবং আরববাসিগণের ধর্ম্মীয় গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

(ঙ) **নরাশংস পাপসমূহ দুরীভূত ও নিবারিত করিবেন** বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিছু ব্যক্তি অধর্ম্ম-জনিত ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম ধারণা করিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। নরাশংস ঐরূপ অধার্মিক ব্যক্তির ভুল ধারণা ভাঙ্গিয়া পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবেন এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য অনুপ্রাণিত করিবেন। যাহারা পাপকার্যে লিপ্ত থাকে, তাহারা যদি কৃত পাপকর্মের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে পুনরায় পাপ কার্য্য জড়িত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মহম্মদ সাহেব কেবলমাত্র মানবজাতিকে পাপাচার হইতে নিবৃত্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। অধিকন্ত তিনি

www.pathagar.com

ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন, যাহাতে পূর্বকৃত পাপকর্মের কারণে মানুষকে নরকগামী না হইতে হয়। মোহম্মদ সাহেবের শিক্ষার প্রভাবে আজ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে মদ্যপান করা এবং সুদ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ আছে। তিনি অন্যের সম্পত্তির প্রতি লালসা না করিবার জন্য উপদেশ দেন। কোরাণে ধনসম্পদকে গুরুত্ব না দিয়া আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে (২৫ পারা ৪২ শুরা ৩৬ আয়াত)।

৫। পত্নীগত সামঞ্জস্যতা ঃ—অথর্ববেদে নরাশংসের দ্বাদশ পত্নী হইবে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মোহম্মদ সাহেবেরও দ্বাদশ পত্নী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে

প্রথমা পত্নীর নাম খাদিজা, যার পিতার নাম খোয়াইলাদ।

দ্বিতীয় পত্নীর নাম সওদা, যার পিতার নাম জময়হ ছিল।

তৃতীয় পত্নীর নাম ছিল আয়েশা, যার পিতার নাম ছিল আবুবকর।

চতুর্থ পত্নীল নাম হাফসাহ, যার পিতার নাম উমর।

পঞ্চম পত্নীর নাম জয়নব, যার পিতার নাম খোজায়মাহ।

ষষ্ঠ পত্নীর নাম উম্মে সালমাহ, যার পিতার নাম আবি উমাইয়াহ।

সপ্তম পত্নীর নাম জয়নব, যার পিতার নাম জাহাশ।

অষ্টম পত্নীর নাম জুয়াইবিয়াহ, যার পিতার নাম হারেস।

নবম পত্নীর নাম রায়হানা, যার পিতার নাম ইয়াজিদ।

দশম পত্নীর নাম উম্মে হাবিবাহ, যার পিতার নাম আবু সুফিয়ান।

একাদশ পত্নীর নাম সাফিয়াহ, যার পিতার নাম হুয়াই ছিল।

দ্বাদশ পত্নীর নাম ময়মুনাহ, যার পিতার নাম হারেস। এই ভাবে নরাশংসের দ্বাদশ পত্নীর বিষয়ে মোহম্মদ সাহেবের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। আজ পর্য্যন্ত মোহম্মদ সাহেব ব্যতীত অন্য কোন ধার্মিক ব্যক্তির দ্বাদশ পত্নী নাই। একমাত্র মোহম্মদ সাহেবেরই পত্নীর সংখ্যা দ্বাদশ ছিল। সুতারং পত্নীগত বিষয়ে নরাশংসের সহিত মোহম্মদ সাহেবের পূর্ণ সামঞ্জস্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

www.pathagar.com

অন্যান্য বিষয়ে সামঞ্জস্যতা—অথর্ব বেদে নরাশংসের কতিপয় পরিচয়-লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া কিছু অলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সেই সব লক্ষণ ও ঘটনাবলী মোহম্মদ সাহেবের সহিত পরিপূর্ণ ভাবে মিলিয়া যায়। যথা, অথর্ব বেদে নরাশংসকে ঈশ্বর কর্তৃক দশ হাজার গাভী প্রদান করার বিষয় উল্লেখ আছে। 'গাভী' অলঙ্কারিক শব্দ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। গাভী শব্দ দ্বারা সরল সদাচার ব্যক্তিদের সূচিত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ "নরপুঙ্গব" শব্দ সৎব্যক্তি বুঝাইতে প্রয়োগ করা হয়। 'পুঙ্গব' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ হইতেছে পুংক্ষু গৌঃ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূণ্যবান ব্যক্তি। মোহম্মদ সাহেবের শেষ জীবনে তাঁহার শিক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাঁহারা মোহম্মদ সাহেবের বিশেষ সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। মোহম্মদ সাহেব যখন মদিনা হইতে মক্কা বিজয় উদ্দেশ্যে বহির্গত হন, তখন তাঁহার সঙ্গে দশ হাজার সহযোগী শিষ্য ছিলেন। উক্ত দশ হাজার শিষ্যবৃন্দ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা কোন প্রকার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেন নাই এবং কাহারো উপর কোন প্রকার নির্য্যাতন উৎপীড়ন করেন নাই। এই সব কারণে তাঁহাদিগকে অথর্ব বেদে "গাভী" রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

বেদসমূহে নরাশংস তিন শত 'অর্বন' প্রাপ্ত-হইবেন বলিয়া কথিত আছে। 'অর্বন' অর্থ ঘোড়া। ইহাও অলঙ্কারিক অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঘোড়া অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অধিক উপযোগী। 'তিন শত অর্বন' বলার তাৎপর্য এই যে তিনশত হইতে চার শতের মধ্যে অর্বনের সংখ্যা হইবে। যদ্রূপ "সপ্তশতী" বলিতে এরূপ গ্রন্থ বুঝায়, যাহার মধ্যে সাত শত বা ততোধিক, তবে আটশত হইতে কম পদ্য সংগৃহীত আছে। তদ্রূপ "তিনশত অর্বন" বলিতে নিশ্চিতভাবে তিনশত বা ততোধিক, তবে চারশত হইতে কম সংখ্যক অর্বন নির্দ্দেশ করিবে। 'অর্বন' তথা ঘোড়া শব্দ দ্বারা বীর পুরুষকে বুঝায়। বদর নামক স্থানে যখন মক্কাবাসীদের সঙ্গে মোহম্মদ সাহেবের যুদ্ধ হয়, তখন তাঁহার সঙ্গে তিনশত বীর যোদ্ধা শিষ্য যোগদান করেন।

www.pathagar.com

খোলাফায়ে রাশিদা

অথর্ববেদে নরাশংসকে দশটি মালা প্রদান করা হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। 'দশ মালা' দ্বারা এমন দশ ব্যক্তির প্রতি সংকেত করা হইয়াছে, যাঁহারা নরাশংসের গলার হার স্বরূপ অতি প্রিয় হইবেন। মোহম্মদ সাহেবেরও এমন দশশিষ্য ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার উপর সমর্পিত প্রাণ ছিলেন। দশজন শিষ্য মোহম্মদ সাহেবের চতুর্দ্দিকে সর্বদা আবেষ্টন করিয়া থাকিতেন। এইজন্য তাঁহারা মোহম্মদ সাহেবের গলার হার স্বরূপ ছিলেন। উক্ত বিশিষ্ট দশ শিষ্যের নাম—আবুবকর, উমর, উসমান, আলি, তালহা, জুবায়ের, আবুএসহাক, সয়িদ, আবু মহম্মদ আবদুর রহমান এবং আবু উবায়দাহ।

১। আবুবকর—তিনি আবু কাহাফার পুত্র ছিলেন। তিনি মোহম্মদ সাহেবের প্রথম খলিফা ছিলেন।

২। উমর—তিনি খাত্তাবের পুত্র। তিনি মোহম্মদ সাহেবের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন।

৩। উসমান—তিনি আফফানের পুত্র ছিলেন। তিনি মোহম্মদ সাহেবের তৃতীয় খলিফা ছিলেন।

৪। আলি—তিনি তালিবের পুত্র এবং চতুর্থ খলিফা ছিলেন।

৫। তালহা—প্রসিদ্ধ বীর ও যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ।

৬। জুবায়ের—তাঁহার পিতার নাম আব্বাস। তিনিও বীর পুরুষ এবং যোদ্ধা ছিলেন।

৭। আবু এসহাক—তাঁহার পিতার নাম আবু অক্কাস। তিনি অত্যন্ত সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন।

৮। সায়ীদ—তিনি জায়েদের পুত্র ছিলেন।

৯। আবু মোহম্মদ আব্দুর রহমান—তাঁহার পিতার নাম আওফ ছিল।

১০। আবু উবাইদাহ—তাঁহার পিতার নাম জাররাহ।

উপরোক্ত দশ ব্যক্তি সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে মোহম্মদ সাহেবের সাহায্য

www.pathagar.com

করিতেন এবং শত্রু আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। উক্ত দশটি মালাস্বরূপ দশজন ব্যক্তিকে "আশারা মুবাশ শারাহ" বলা হইত—যার অর্থ "স্বর্গীয় সুসংবাদপ্রাপ্ত দশব্যক্তি"।

একশত নিষ্ক

অথর্ববেদে নরাশংসকে 'একশত নিষ্ক' প্রদান করার বিষয় উল্লেখ আছে। নিষ্ক অর্থ স্বর্ণমুদ্রা। 'স্বর্ণমুদ্রা' শব্দ দ্বারা রত্নবৎ শ্রেষ্ঠ মহৎ ব্যক্তিগণকে সুচিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা ধর্মপ্রচার করেন এবং উহা সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা করেন, তাঁহারা ধর্মক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রা স্বরূপ। ইহার কারণ এই যে, স্বর্ণ অতি মুল্যবান ধাতু। অনুরূপভাবে মূলধর্মের সংরক্ষণ তথা গুরুর প্রদত্ত শিক্ষাসমূহ সংরক্ষণ করার গুরুত্ব ও মহত্ব অত্যধিক মূল্যবান। মোহম্মদ সাহেব মানবজাতির উদ্দেশ্যে যে সকল মহৎ শিক্ষা প্রদান করিতেন, উহা একশত ব্যক্তি সংরক্ষণ করিতেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট প্রচারিত করিতেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট প্রচারিত করিতে যত্নবান হইতেন। তাঁহারা আরবি ভাষায় "আসহাবে সুফফা" নামে পরিচিত ছিলেন।

অতএব বেদসমূহে বর্ণিত যে নরাশংস আবির্ভূত হইবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, একমাত্র মোহম্মদ সাহেবই তিনি; ইহা স্বতঃ সিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়।

মহাপুরুষ মুসার পঞ্চম পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ—মুসার উপর "ব্যবস্থা-বিবরণ" নামক যে ধর্মপুস্তক অবতীর্ণ হয়, উহাতে "ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, মুসার অনুরূপ তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের মধ্য হইতে একজন ঋষি-নবি আবির্ভূত হইবেন। তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় বাণী প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং তিনি ঈশ্বরীয় আদেশাবলী মানবজাতির নিকট প্রকাশ করিবেন (Old and New testament, Denteronomy- 18-18)। উপরুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা আবির্ভূত ঋষি সম্পর্কে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় অবগত হওয়া যায়।

(ক) মুসার অনুরূপ হইবেন।

www.pathagar.com

(খ) মুসার ভ্রাতৃবর্গের মধ্য হইতে হইবেন।

(গ) ঈশ্বরীয় বাণী প্রাপ্ত হইয়া প্রচারিত করিবেন।

(ক) মুসার অনুরূপ কে এবং কেন?—এক্ষনে দেখিতে হইবে যে, কে এমন মহাপুরুষ আগমন করিয়াছেন, যিনি মুসার অনুরূপ ছিলেন।

কতিপয় খৃষ্টান মনে করেন যে, উপরুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যিশু ছিলেন। কিন্তু উহা প্রমাণিত করার পথে নিম্নলিখিত প্রতিবন্ধক বিদ্যমান।

অসামঞ্জস্যতা

১। **প্রথম অসামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা ধর্মপ্রচারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার কারণে মিশর সম্রাট ফেরাউনের পক্ষীয় এক ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলেন। ইহার তাৎপর্য এইযে, ধর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি কারীগণকে প্রতিহত করা মুসার অভিষ্ট লক্ষ ছিল। পক্ষান্তরে ইসা যিশু কোন ধর্মশত্রুকে দমন করেন নাই, পরন্ত তিনি স্বয়ং ধর্মশত্রুগণ কর্তৃক শূলীবিদ্ধ হন।

[শূলবিদ্ধ নয়। ঈসা (আঃ) এর উর্ধলোকে উত্তোলন]

যখন আল্লাহ বলেন- হে ঈসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার কাছে গ্রহণ করব ও তোমাকে উঠায়ে আনব এবং অবিশ্বাসী কাফিরগণ হতে তোমাকে পবিত্র করব এবং যারা অবিশ্বাস করছে তাদের উপর তোমার অনুসরণকারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত উন্নত করব; তারপর আমারই কাছে তোমাদের আগমন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে বিষয় মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করব। এবং

"এরপর যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, বস্তুত তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি দেব; এবং তাদের জন্যে কেউই সাহায্যকারী নাই। ৩ পারা, ৩ ছুরা আল-ইমরান, ৫৫ ও ৫৬ আয়াত।

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমেরমত; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করছেন, তারপর বল্লেন, হও, ফলে তা হয়ে গেল। ৩ পারা, ৩ ছুরা আলইমরান, ৫৯ আয়াত। এবং

"আমি তোমার কাছে নিজ্ঞানময় বিবরণ ও নিদর্শনাবলী হতে এটা পাঠ করছি। ৩ পারা, ৩ ছুরা আল-ইমরান, ৫৮ আয়াত।

www.pathagar.com

"এবং তাদের একথা বলার কারণে যে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর রাছুল মরিয়ামের ছেলে ঈসা মসিহকে হত্যা করেছি।' কিন্তু তারা তাকে হত্যা করতে পারে নাই এবং শূলেও দিতে পারে নাই, বরং তাদের দৃষ্টি ভ্রম হয়েছিল; আর যারা এতে মতবিরোধ করে তারা এ বিষয় নিশ্চয় সন্দেহের ভেতর আছে, অনুমান করা ছাড়া এ বিষয়ে তাদের আর কোন জ্ঞান নাই। বস্তুত এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করতে পারে নাই। বরং আল্লাহ তাকে তার নিজের দিকে উঠায়ে নিয়েছেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, বিজ্ঞান ময়।"

৬ পারা, ৪ ছুরা নিছা, ১৫৭ ও ১৫৮ আয়াত

পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের উল্লেখিত আয়াতাবলী হতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (াঃ) কে আল্লাহর দিকে উঠায়ে নেয়া হয়েছে। তাঁকে কেউ হত্যা বা শূলে বিদ্ধ করতে পারে নাই। আল্লাহ বলেন, মানুষের আদি উৎস আদম যে ভাবে মাটি দ্বারা 'নাই' হতে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে 'কুন' 'হও' আদেশ দ্বারা মরিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) এর সৃষ্টি হয়েছে এবং ঠিক একইভাবে বিশ্ব স্রষ্টা বিজ্ঞান আধার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর নির্বাচিত ও প্রেরিত রাছুল ঈসা (আঃ) তার কাছে উঠায়ে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কি চমৎকার ভাবে আদম (আঃ) এর সৃষ্টির উপমা দ্বারা সন্দেহাতীত প্রমান উপস্থাপন করেছেন যে, আদম (আঃ) এর মত ঈসা (আঃ) জন্ম হয় এবং আছমানে আল্লাহর দিকে উঠায়ে নিরাপদে রেখেছেন।

সাধনা বলে কোন নাবী হয় না। নাবী-রাছুলগণ স্বয়ং আল্লাহর নির্বাচিত ও প্রেরিত। তাঁদের নিরাপত্তা ও জ্ঞান আল্লাহর আদেশক্রমে ফেরেস্তার তত্ত্বাবধানে হয়। যদি কেউ মনে করেন, আল্লাহর নির্বাচনে ও জ্ঞান দানে ভুল করেন, তবে তাঁর নিজের সৃষ্টিতেই কি ভুল ছিল? নাউজুবিল্লাহ....।

ঈসা (আঃ) ও মরিয়ামকে নিয়ে ইয়াহুদী ও নাছারাদের মধ্যে ঘোরতর মত বিরোধ রয়েছে। ইয়াহুদী জাতির অবিশ্বাস, নাবী হত্যা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ এখানে নেই।

www.pathagar.com

কোন রাছুলের অপমৃত্যু স্বীকার করা পুরাতন নিয়ম- তওরাত বিরোধী (২য় বিবরণ ২১-২৩)। কারণ আল্লাহর অভিশপ্ত ব্যক্তিই বৈধ্যকাষ্টে লটকানো হয়ে থাকে। তওরাত-২য় বিবরণ ২১-২৩)। কিন্তু নাবীদ্রোহী ইয়াহুদীদের দৃঢ় প্রত্যয় যে, যিশুকে ধর্মদ্রোহীতা ও প্রতারনার জন্য শূলবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। হজরত ঈসা (আঃ) এর শিক্ষা ও জীবনী সম্বন্ধে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে এবং খৃষ্টান ও মুছালমানদের মধ্যে মতের মোটেও মিল নাই।

খৃষ্টানেরা হজরত ঈসা (আঃ) এর শিক্ষাকে এরূপ বিকৃত ও ভ্রান্ত করে ফেলেছে যে, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যেও গুরুতর মতভেধ মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে খৃষ্টানগণ ঈসা (আঃ) শিক্ষা বলে যা প্রচার করছেন, তা অবিশ্বাস, কুবিশ্বাস, মূর্তি পূজা-পৌত্তলিকতা ও স্বেচ্ছা চারিতার নামান্তর মাত্র। তাকে কোনভাবে একজন রাছুলের শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্য নয়। পবিত্র কুরআন মাজিদে ঐ সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। (খৃষ্টান ধর্মে মূর্তি পূজা। এ গ্রন্থের ৩য় খন্ড, খৃষ্ট ধর্মে প্রতিমা পূজা দ্রষ্টব্য)

এবং ঐ স্ত্রীলোক - নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল, তারপর আমি তার মধ্যে নিজ আত্মা ফুৎকার করেছিলাম এবং তাকে এবং তার ছেলেকে বিশ্ব জগতের জন্য নিদর্শন করেছি।

১৭ পারা ২১ ছুরা আম্বিয়া ৯১ আয়াত।

সুতরাং আল্লাহর নির্বাচিত নবীকে অন্যকোন মানুষ শূলবিদ্ধ করে হত্যা করার ত দূরের কথা, এরূপ ক্ষমতা কোন সৃষ্ট জগতেরই নাই। আমিন। [গ্রন্তকার]]

২। **দ্বিতীয় অসামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসার জাতি তাঁহার ঋষি ও নবি হওয়ার পূর্বে মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু যিশুর জাতি তাঁহার ঋষি হওয়ার পূর্বযুগে মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল না।

৩। **তৃতীয় অসামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা যেরূপ তাঁহার জীবিতকালের মধ্যেই ধর্মশত্রুগণকে পরাভূত করিয়া বিজয় লাভ করেন। কিন্তু সেরূপ ধর্মশত্রুগণকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন নাই। পরন্তু তিনি স্বয়ং ধর্মশত্রুগণ কর্তৃক পরাজিত ও শূলীবিদ্ধ হন।

www.pathagar.com

৪। **চতুর্থ অসামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসাকে তাঁহার অনুচর বর্গ প্রবঞ্চিত করে নাই। কিন্তু যিশুকে তাঁহার এক অনুচর ধোকা দিয়া প্রবঞ্চিত করে।

৫। **পঞ্চম অসামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা পিতা মাতার ঔরষে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার স্ত্রী সন্তানাদি ছিল। পক্ষান্তরে যিশুখ্রীষ্ট বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার কোন স্ত্রী ও সন্তানাদি ছিল না। (New Testament, Saint Mathew-1, 18)

৬। **ষষ্ঠ অসামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা তাঁহার অনুগামী ও শিষ্য বৃন্দকে অত্যাচারী ফেরাউনের নির্য্যাতন হইতে যুক্ত করিয়া শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশ ত্যাগ করতঃ অন্য দেশে গমন করেন। পক্ষান্তরে যিশুখ্রীষ্ট স্বীয় শিষ্যবৃন্দকে রোমক সম্রাটের নিপীড়ন হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই এবং স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশেও গমন করেন নাই।

৭। **সপ্তম অসামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা প্যালেষ্টাইন অধিকার করিতে স্বীয় শিষ্যবৃন্দকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দেন এবং তাঁহারা প্যালেষ্টাইন অধিকার করে। পক্ষান্তরে যিশুখ্রীষ্ট স্বীয় শিষ্যগণকে কখনো যুদ্ধ করার আদেশ দেন নাই।

৮। **অষ্টম অসামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা ঈশ্বরের নিকট হইতে নূতন বিধান প্রাপ্ত হন। মুসার প্রাপ্ত ভিধানের নাম 'লেবিটিকস'। পরন্ত যীশুখ্রীষ্ট কোন নূতন বিধান ও ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন নাই। বরং তিনি স্বয়ং স্পষ্টভাবে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি কোন নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে আগমন করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র পূর্ব্বতন ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছেন। (New Testament, Saint Mathew-5, 17)

৯। **নবম অসামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসার সমগ্র জাতি বনি ইসরাইলগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের দূত ও নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। পক্ষান্তরে যিশু খ্রীষ্টকে তাঁহার জাতির সকলে স্বীকার করে নাই, কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় বারোজন ব্যক্তি স্বীকার করে। তম্মধ্যে একজন শিষ্য তাঁহাকে ধোকা দিয়া শত্রুদ্বারা গ্রেপ্তার করাইয়া দেয়।

www.pathagar.com

ইহা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তাহার অনুগামী শিষ্যগণও তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত না।

১০। **দশম অসামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা দীর্ঘায়ু জীবন লাভ করেন এবং স্বাভাবিক ভাবে পরলোক গমণ করেন। পক্ষান্তরে যিশু খ্রীষ্ট অল্পায়ু জীবন লাভ করেন এবং শূলীবিদ্ধ অবস্থায় অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। [শূলবিদ্ধ নয় অন্তর্ধান। আল্লাহ উঠায়ে নিয়েছেন।] গ্রন্থকার। (এ ব্যাপারে একটু আগে কুরআনের ভাষায় উত্তর দিয়েছি)।

১১। **একাদশ অসামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসার অন্তর্ধানের পর তাঁহার আদিষ্ট খলিফা প্যালেষ্টাইন এবং সিরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। পক্ষান্তরে যিশু খ্রীস্টের জীবনে এরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই।

অতএব উপরোক্ত একাদশটি কারণে প্রমাণিত হইতেছে, মুসা যে ঋষির বিষয়ে ববিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন। তাহার সহিত যিশু খ্রীষ্টের কোন সামঞ্জস্যতা নাই, বরং প্রতি ক্ষেত্রেই যিশু খ্রীষ্ট তাহার বিপরীত।

এক্ষণে বিচার্য্য যে, মহম্মদ সাহেব মুসার অনুরূপ ছিলেন কিনা? অনন্তর তাহার সঙ্গে উক্ত বিষয়ে মুসার সহিত সামঞ্জস্যতা আছে কিনা?

১। **প্রথম সামঞ্জস্যতা** এই যে, মহম্মদ সাহেব ধর্মপ্রচার বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ধর্ম শত্রুদের দমন করার ক্ষেত্রে মুসার অনুরূপ শক্তি প্রয়োগকারী ছিলেন।

২। **দ্বিতীয় সামঞ্জস্যতা এই** যে, মুসার জন্মের পূর্ব্বে যদ্রূপ তাঁহার জাতি মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। অনুরূপ মহম্মদ সাহেবের জন্মের পূর্বে তাঁহার জাতিও মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল।

৩। **তৃতীয় সামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা যদ্রূপ তাঁহার ধর্ম শত্রুদের পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন। তদ্রূপ মহম্মদ সাহেবও ধর্ম শত্রুদের পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করেন।

৪। **চতুর্থ সামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা যদ্রূপ তাঁহার কোন অনুগামী শিষ্য দ্বারা প্রবঞ্চিত হন নাই। তদ্রূপ মহম্মদ সাহেবও তাঁহার কোন শিষ্য দ্বারা প্রবঞ্চিত হন নাই।

www.pathagar.com

৫। **পঞ্চম সামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা পিতা-মাতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানাদি ছিল। তদ্রূপ মহম্মদ সাহেব পিতা মাতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু খ্রীষ্টের ন্যায় কুমারী নারীর গর্ভে বিনা পিতায় জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অধিকন্ত মুসার ন্যায় মহম্মদ সাহেবের পত্নি ও সন্তানাদি ছিলেন, খ্রীষ্টের ন্যায় তিনি অবিবাহিত ছিলেন না।

৬। **ষষ্ঠ সামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা যদ্রূপ তাঁহার শিষ্যবর্গকে ফেরাউনের নির্য্যাতন হইতে যুক্ত করেন। তদনুরূপ মোহম্মদ সাহেব তাঁহার শিষ্যবর্গকে শত্রুদের কবল হইতে মুক্ত করেন।

৭। **সপ্তম সামঞ্জস্যতা** এই যে, যদ্রূপ মুসার আজ্ঞানুযায়ী তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার খলিফার নির্দ্দেশে শিষ্যবর্গ প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়া দেশ অধিকার করেন। তদ্রূপ মোহম্মদ সাহেবের অন্তর্ধানের পর তাঁহার অজ্ঞানুযায়ী খলিফা উমরের নির্দ্দেশে মোহম্মদ সাহেবের শিষ্যগণ প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া অধিকার করিয়া নেন।

৮। **অষ্টম সামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা যদ্রূপ ঈশ্বরের নিকট হইতে বিধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্রূপ মহম্মদ সাহেবও ঈশ্বরের নিকট হইতে বিধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন্।

৯। **নবম সামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা যদ্রূপ তাঁহার জাতির নেতা ছিলেন। তদ্রূপ মহম্মদ সাহেবও তাঁহার জাতির নেতা ছিলেন।

১০। **দশম সামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা সাংসারিক জীবন যাপন করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যুতে পরলোক গমন করেন। তদ্রূপ মোহম্মদ সাহেবও সাংসারিক জীবন যাপন করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যুতে পরলোক গমন করেন।

১১। **একাদশ সামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা তাঁহার শিষ্যবর্গকে লইয়া মাতৃ ভূমি ত্যাগ করতঃ অন্যত্র হিজরত করেন। মোহাম্মদ সাহেবও তাঁহার শিষ্যবর্গ লইয়া নিজ মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করতঃ মদিনা হিজরত করেন।

১২। **দ্বাদশ সামঞ্জস্যতা** এই যে, মুসা তাহার অনুগামী শিষ্যবৃন্দকে ধর্ম-শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আদেশ দেন। তদ্রূপ মোহম্মদ সাহেবও শিষ্যবর্গসহ ধর্মশত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করেন।

www.pathagar.com

অতএব পূর্বোক্ত যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসার অনুরূপ একমাত্র মহম্মদ সাহেব ছিলেন। ইশামসিহ অর্থাৎ যিশুখ্রীষ্ট কোনক্রমেই নহে।

২। মুসার ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে হওয়ার বিষয় ঃ—মুসার উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অন্তিম ঋষি, যিনি সর্বশেষে আগমন করিবেন, তিনি মুসার ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে হইবেন। ইহা মুসার পঞ্চম গ্রন্থে উল্লেখ আছে। মুসার ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে হওয়ার তাৎপর্য এই যে, তিনি মুসার সন্তান-সন্ততি তথা বংশধরের মধ্যে কোন ব্যক্তি হইবেন না। তিনি সম্পর্কের দিক দিয়া মুসার ভ্রাতৃস্বরূপের বংশ পরম্পরার মধ্য হইতে হইবেন। বাইবেল ওল্ড টেষ্টামেন্টের অন্তর্গত ডিউটেরোনামীর উক্তি অনুযায়ী ইহা স্পষ্ট হয় যে, ইসরাইলের মধ্যে মুসার অনুরূপ ভবিষ্যতে এমন কোন ঋষি নবি হইবে না, যিনি ঈশ্বরের সম্মুখে কথোপকথন করিতে পারিবেন। (Old Testament, Deuteronomy, Chapter-34, Verse-10) এই সম্পর্কে ব্যক্ত বাইবেল ভাষ্যে অতীতকাল (Past Tense) ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু উহা ভবিষ্যত কালের দ্যোতক। এরূপ ব্যবহার বৈদিক সংস্কৃতে পরিদৃষ্ট হয় যে, "লুড লড লিট" সুত্র হইতে উৎপন্ন অতীতকাল শব্দ হইতে ভবিষ্যত কাল নির্দ্দেশ করা যায়। অনুরূপভাবে কোরানেও বহু ভবিষ্যত কালের ঘটনাকে অতীতকাল দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে উক্ত স্থানে ভবিষ্যত কালীন ঘটনাকে ভূতকাল ব্যক্ত করা হইয়াছে।

অন্তিম ঋষি কে?

অন্তিম ঋষি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন গুণবাচক নাম ব্যবহৃত। এতে অনেকের সন্দেহ হতে পারে যে, যেহেতু বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীতে বিভিন্ন নাম ব্যক্ত। সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তি অবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা। কারণ একজন ব্যক্তি হলে সর্বক্ষেত্রে একই নাম ব্যবহৃত হত। কিন্তু এই সংশয় সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে সাধারণতঃ বিভিন্ন উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। অনেক সময় উক্ত উপাধি সমূহ তাঁর নামের স্থান অধিকার করে লয়। উদাহরণ স্বরূপ

www.pathagar.com

"বিষ্ণু"র প্রতি দৃষ্টিপাত করুণ। বিষ্ণু পীতভূষণ পরিধানকারী হওয়ার কারণে তাঁর এক নাম "পীতাম্বর"। তিনি লক্ষ্মীর পতি হওয়ায় তাঁর এক নাম "লক্ষ্মীপতি"। তিনি চক্র ধারণ করেন, সুতরাং তাঁর অন্য নাম "চক্রী"। অনুরূপভাবে "শঙ্করজী" ত্রিশূল ধারণ করেন বলে তাঁর নাম "ত্রিশূলী"। তিনি ষাঁড়ের উপর আরোহন করতেন বলে তাঁকে বৃষভবাহনঃ নামেও অভিহিত করা হয়। অনুরূপভাবে "সরস্বতী" কে দেখুন। তিনি বীণা বাজান বলে তাঁর সরস্বতী নাম ছাড়া আর একটি নাম হতেছে "বীণাবাদিনী"। তিনি যেহেতু জ্ঞান ও বিদ্যার সরোবর স্বরূপ, সেহেতু তাঁর নাম "সরস্বতী"। এমন কেউ যদি বিষ্ণু, পীতাম্বর, লক্ষ্মীপতি এবং চক্রীকে চারজন ব্যক্তি বলেন অথবা শঙ্করজী, ত্রিশূল এবং বৃষভবাহনকে তিন ব্যক্তি ধারনা করেন অথবা সরস্বতী ও বীণাবাদিনীকে দুইজন নারী হিসেবে চিহ্নিত করেন, তা হলে তিনি নিশ্চয় ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকবেন। অনুরূপভাবে অন্তিম ঋষি সম্পর্কে অনেকস্থলে ভাষাগত পার্থক্যের জন্য ভিন্ন নাম হয়েছে, আবার অনেকস্থলে গুণবাচক নাম ব্যক্ত হয়েছে।

কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীতে অন্তিম ঋষি সম্পর্কে কেবলমাত্র "সে" বা "তিনি" ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বিচার্য্য যে, 'তিনি' সম্পর্কে কি কি ববিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তারপর ভবিষ্যদ্বাণীতে অভিব্যক্ত বিষয়সমূহ যে ব্যক্তির সঙ্গে মিলে যাবে, সেই ব্যক্তিই চিহ্নিত হবে।

উপসংহার

ধর্ম্মীয় গ্রন্থসমূহের অন্তঃরূপ পর্য্যবেক্ষন করিবার পর ইহা স্পষ্ট হয় যে, সকল ধর্ম্মের মূলে কোন বৈষম্য নাই। প্রকৃত বিভেদ ও অসামঞ্জস্য এই যে, মানুষ ধর্ম্মের মূল সত্তাকে পরিত্যাগ করে নিজের মনগড়া ধর্ম্মকে অনুসরণ করে। মানব-কল্যাণের জন্য প্রেরিত ঋষি বা অবতারগণকেই ঈশ্বর বলে মেনেছে। এক ঈশ্বরের আরাধনা ত্যাগ করে অন্যান্য অসংখ্য দেবদেবীর পূজায় লিপ্ত হয়। গল্প ও কাহিনী শ্রবন ও পাঠ করাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলে মনে করেছে। (ফলে ভারতীয় সমাজে একদিকে মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে এবং অন্যদিকে কবর-পূজা প্রচলিত হয়েছে)।

www.pathagar.com

একদিকে রাসের স্মারকরূপে দশহরা পালন করা হয় এবং অন্যদিকে মহরম পালন করা হয়। অথচ দশহরাদি পালন করার জন্য কোন শ্রুত বা কোন স্মার্ত গ্রন্থে নির্দ্দেশ নাই। অনুরূপভাবে ইসলামী ধর্ম্মগ্রন্থেও মহরম পালন করার কোন বিধান নাই। মদ্যপান, চুরিকরা, সুদ গ্রহণ করা, জুয়া-খেলা এবং ব্যভিচার উভয় ধর্ম্মেই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। গীতা এবং বেদ একেশ্বরবাদের প্রস্তাবনা করিয়াছে। অনুরূপভাবে কোরাণে তৌহিদ অর্থাৎ একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বেদের ঋষি, পুরাণের অবতার এবং বৌদ্ধগ্রন্থের বুদ্ধ, তাঁহারা হলেন কোরানের নবি বা রসুল। বেদে "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তিঃ—অর্থাৎ 'এক ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় নাই; এই মন্ত্র পঠিত হয়। ইসলামে-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ = অর্থাৎ 'এক আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই' এই কলেমা পঠিত হয়। বৈদিক ধর্মের 'সন্ধ্যা' ইসলামে নামাজের রূপ নিয়েছে, বৈদিক ব্রত ইসলামের রোজা এবং তীর্থযাত্রার আরবী প্রতিশব্দ হজ্ব হইয়াছে। স্বর্গ ও নরককে ইসলামে জান্নাৎ ও দোজখ নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। আস্তিককে 'মুসলমান' নাস্তিককে 'কাফির' এবং ঐশ্বরিক বিষয়কে 'ইসলাম' বলা হয়। মূল এক, কেবলমাত্র ভাষাগত বিভিন্নতার কারণে হিন্দু মুসলিমগণের মধ্যে এক ভ্রান্তিময় বৈষম্য বিরাজ করিতেছে। মানুষ যদি সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া এক অন্যের ধর্ম জ্ঞাত হওয়ার যত্ন করে, তা হলে পারস্পরিক সকল দ্বন্দ্ব রূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

বর্তমানে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে এক অনৈক্যভাব চলিতেছে একমাত্র এই কারণে যে, মুসলমানগণ গোমাংস ভক্ষণ করেন। অথচ 'হিন্দুগণের অবগত হওয়া উচিৎ যে, এই ভারতবর্ষেই পূর্বে গবাময়ন সত্র তথা গোসব যজ্ঞ পালন করা হইত। উক্ত যজ্ঞে গো-বধ করা হইত। কলিযুগে গবাময়ন সত্র তথা গোসব যজ্ঞ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সেহেতু হিন্দুগণ বর্ত্তমানে গো-হত্যা করেন না। হিন্দু ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, তাঁহারা কেবলমাত্র "গো-হত্যা" বন্ধের শ্লোগান যেন না দেন, বরং "মহিষ-হত্যা" বন্ধের এবং "ছাগল-হত্যা" বন্ধের শ্লোগানও যেন দেন। কারণ উহারাও দুগ্ধবতী জন্ত। সুতরাং যে সব হিন্দুগণ ছাগল এবং ষাঁড় হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে,

www.pathagar.com

তাদের বিরুদ্ধেও শ্লোগান উচ্চারিত করা উচিৎ। অন্য পক্ষে মুসলমানগণের ইহা অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, গো-মাংস ভক্ষণ করা মুসলিম হওয়ার জন্য কোন যোগ্যতা (Qualification) নহে। অধিকন্তু তাঁহারা মোহম্মদ সাহেবের একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত অনুগামী। সুতরাং মোহম্মদ সাহেবের আজ্ঞা পালন করা উচিৎ। তিনি গাভী সম্পর্কে বলেন যে, গাভী-দুগ্ধ পান করা স্বাস্থ্যকর, উহার ঘৃত ঔষধস্বরূপ এবং উহার মাংস ব্যাধিজনক। বাবা আলীমদাস 'সনাতন ধর্ম' গ্রন্থেও ইহা সমর্থন করিয়া বলেন যে, গো-মাংস ভক্ষণ করা উচিৎ নহে। অন্যান্য ঋষি, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের ঋষিগণ গো-দুগ্ধ ও ঘৃত ব্যবহার করাকে সমর্থন করিয়াছেন এবং গো-মাংস হইতে বিরত থাকার উপদেশ দিয়াছেন। প্রথমতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রীয় দৃষ্টি কোন দিয়া গো-মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করা হইত। উহা অতিরঞ্জিত হইতে হইতে সিদ্ধান্তের রূপ নেয় এবং পরে উহা ধর্মীয় রূপ ধারন করে।। বর্ত্তমান যুগের চিকিৎসকগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, গো-মাংসে টি. বি. ব্যাধির যত অধিক জীবাণু পরিদৃষ্ট হয়, অন্য কোন মাংসে দেখা যায় না। অতএব মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাহাদের ধর্ম্মের দিক দিয়া গো-মাংস ভক্ষণ করা অপরিহার্য্য নহে। তাঁহারা গো-মাংস ভক্ষণ না করিয়াও মোহম্মদ সাহেবের সত্য-অনুগামী হইতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা যেন গো-মাংস ভক্ষণ করা পরিহার করেন। অনন্তর তাঁহারা যেন গো-হত্যা করিয়া সামাজিক অব্যবস্থা, পারস্পরিক কলহ দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করিয়া ইসলাম-পরিপন্থী কাজ না করেন। কারণ ইসলামের মূল উদ্দেশ্য ইতেছে—শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। ভারতীয় ভাষায় ইসলাম ধর্মের প্রচার করা এবং হিন্দী ও সংস্কৃত শিক্ষা করা তাঁহাদের উচিৎ। মুসলমানগণ ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া উহার অন্নজল দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন। সুতরাং ভারতবাসীর কল্যাণ করা তাঁহাদের উচিৎ। মুসলমানগণ ভারতীয় ভাষায় ইসলামের প্রসার করুক। নিজেদের নাম ভারতীয় রাখুন। কারণ যে ব্যক্তি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করে, সেখানকার ভাষাও সে নিজের অধিগত করে। ভারতীয় নাম রাখার কারণে কোন মুসলমান

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবেন না। আরবীতে নাম রাখা ইসলামের কোন সিদ্ধান্ত নহে। তবে আরবীতে নাম রাখার একান্ত অভিলাষ হয়, তাহা হইলে নিজের একটি হিন্দি বা সংস্কৃত নামও রাখিবেন। সমাজে শান্তি সংহতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এমন প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিৎ, যাহা ধর্মের বিপরীত না হয়। যাহা হোক মোহম্মদ সাহেবের চরিত্র অতি পবিত্র ও উজ্জ্বল ছিল। সুতরাং তাঁহার আচরণ গ্রহণ করা প্রত্যেকের পক্ষেই কল্যাণকর।

কল্কি অবতার এবং মোহম্মদ সাহেব
(২২ পারা, ৩৩ আহযাব, ৪০ আয়াত দ্রঃ)
উপক্রমণিকা

আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। ইসলামী সংস্কৃতিতে নবি রসুল বা পয়গম্বরগণের যে স্থান, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে অবতারগণের সেই স্থান। মুসলমানগণ মোহাম্মদ সাহেবকে সর্বশেষ নবি বা মহাপুরুষ বলে স্বীকার করেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে উহাকে কলিযুগের শেষ অবতার বলা হইয়াছে। বিদেশে কেবল মাত্র নবি আগমন করেন এবং ভারতে কেবলমাত্র অবতার আগমণ করেন, এমন হইতে পারে না। কারণ সমগ্র বিশ্ব একই পরমেশ্বরের, উহাতে কোনরূপ বৈষম্য থাকিতে পারে না। পয়গম্বর কেবল মাত্র আরবে আবির্ভূত হইবেন, ভারতে হইবেন না; ইহা ন্যায়-বিচার সম্মত নহে। অনুরূপ অবতার কেবল মাত্র ভারতে আবির্ভূত হইবেন, অন্য কোন দেশে হইবেন না; ইহাও ন্যায় বিচার সম্মত নহে। সেইজন্য মোহাম্মদ সাহেবকে যখন সর্বশেষ পয়গম্বর বা মহাপুরুষ বলিয়া অবগত হইলাম। তখন আমার অন্তরে পুরাণে উল্লেখিত কল্কি অবতার রচিত বিষয়ক অধ্যায় সমূহ পড়িবার বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী ইতিপূর্বেই কলি-যুগের কিছু অংশ বিগত হইয়াছে। কলি-যুগে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে এবং যে সকল ঘটনা ঘটিবে, আমি উহার সমুদয় বিষয় মোহাম্মদ সাহেবের জীবনাবলীর সহিত সযত্নে তুলনা করি। ফলে উহা সম্যকভাবে মিলিয়া গিয়াছে।

www.pathagar.com

ইহার মধ্যে আলোচিত বিষয়সমূহ আমার ব্যক্তিগত মতামত নহে, বরং উহা বেদ ও পুরাণ হইতে প্রমাণিত বিষয় অথবা ঈশ্বর প্রদত্ত আমার আধ্যাত্মিক প্রেরণা হইতে উদ্ভুত বিষয়।

অবতার শব্দের অর্থ

'অবতার' শব্দ 'অব' এর 'তৃ' ধাতুতে ঘঅ প্রত্যয় যোগ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। অবতার শব্দের অর্থ—"পৃথিবীতে আগমন।" 'ঈশ্বরের অবতার' বলিতে বুঝায় যে, নিখিল বিশ্বে ঐশী প্রত্যাদেশ প্রচারকারী মহামানবের পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করা। পরমেশ্বর সর্বব্যাপী। সুতরাং তাঁহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ বলিয়া মনে করা প্রকারান্তরে তাঁহার অসীমতাকে অস্বীকার করা। কোথাও তাঁহার তেজঃ সমুজ্জলে প্রস্ফুটিত এবং কোথাও তাঁহার প্রভা অব্যক্ত। যদ্রূপ তুষারাচ্ছাদিত সূর্য্য-কিরণ মন্দিভূত পরিলক্ষিত হয় কিন্তু উহার কারণে সূর্য্যের প্রকৃত তেজঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। তিনি সপ্তলোকের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ লোক অধিষ্ঠিত আছেন। সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র তথা তারকারাজি কিছুই বিদ্যমান নাই। সেখানে ঈশ্বরের বিকাশ ও জ্যোতি এত প্রচণ্ড ও প্রখর যে, চন্দ্র সূর্য্য সেখানে নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। সূর্য্যের প্রকাশে যদ্রূপ সমগ্র নভোমণ্ডল বিকশিত হয়; তদ্রূপ পরমপিতা 'পরমেশ্বরের' বিভায় সমগ্র সৃষ্ট-জগৎ বিকশিত হয়। তাঁহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ প্রভুর প্রিয়পাত্র কোন মহাত্মা মানবের কল্যানার্থে বিশ্বে অবতীর্ণ হন অথবা বিশ্ব মানবের মধ্যে সর্ব্বাধিক নির্মল হৃদয় ও সচ্চরিত্রবান ব্যক্তির হৃদয়ে ঐশী জ্ঞান পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। অনন্তর তিনি ঐশী তেজঃ প্রত্যক্ষ করেন, ফলে শিক্ষালাভ ও গ্রন্থ অধ্যয়ন ব্যতীত তাঁহার অন্তরে সর্ব্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রবিষ্ট হয়। "ঈশ্বরের অবতার" শব্দে 'এর' সম্বন্ধ কারক। অতএব অর্থ স্পষ্ট হইতেছে, ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির অবতীর্ণ হওয়া। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত ব্যক্তি কে? যে তাঁহার ভক্ত, সেই তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। ঋগ্বেদ উক্ত ব্যক্তিকে "কীরি" নামকরণ করা হইয়াছে। "কীরি, শব্দের বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরের প্রশংসাকারী। উহার আরবী প্রতিশব্দ হইতেছে—আহমদ। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রশংসাকারীকে আহমদ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। বরং ঈশ্বরের বিশেষ এক প্রশংসাকারী ব্যক্তির উপর

www.pathagar.com

"কীরি" তথা 'আহমদ' শব্দ নির্দ্দেশিত ও প্রযোজ্য হইয়াছে। অতএব যে শব্দ যে ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হয়, সেই শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকেই নির্দ্দেশ করা হয়, অন্য কোন ব্যক্তিকে নহে। 'আদম' মহাপুরুষ ঈশ্বরের প্রশংসাকারী ছিলেন, তথাপি তাঁহার নাম 'আহমদ' হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে "কীরি" বলা হইবে না। এখানে সকল মহামানব তথা অবতারের বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বরং কেবলমাত্র অন্তিম অবতারের বর্ণনা দেওয়াই আমার মূখ্য উদ্দেশ্য। তথাপি এতটুকু পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, সংস্কৃত ভাষার 'অবতার' ইংরাজি ভাষার 'প্রফেট' (Prophet) এবং আরবী ভাষার 'নবি' শব্দগুলি সমার্থ-বোধক এবং একই অর্থের দ্যোতক। পূরাকালে প্রত্যেক দেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অবতার তথা নবি এসেছেন। কারণ সেই যুগে একজন অবতারের পক্ষে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্তিম অবতারের বিষয় ভিন্নতর। কারণ তাঁহার আগমন সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য এবং তাঁহার ধর্ম, নিখিল বিশ্ব-মানবের জন্য নির্দ্দেশিত। এক্ষণে আমি অবতার কি কি বৈশিষ্ট্যে আগমন করেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি—

অন্তিম অবতারের বৈশিষ্ট্য

(২১ পারা, ৩৩ আহাযাব, ২১ আয়াত দ্রঃ)

১। **অশ্বরোহণ**-পূরাণের মধ্যে যে সকল স্থানে অন্তিম অবতারের বর্ণনা করা হইয়াছে, প্রত্যেক স্থানে তাঁহার বাহন অশ্ব বলিয়া উল্লেখিত আছে। সেই অশ্ব অতি বেগবান হইবে। উক্ত অশ্বকে 'দেব দত্ত' বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে। দেবদত্ত অর্থাৎ দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত।

২। **খড়্গ ধারণ**—অন্তিম অবতাররে দ্বিতীয় বিশেষণ হইতেছে—তিনি খড়্গধারী হইবেন। তিনি দুষ্কৃতি পরায়ণ ব্যক্তিগণকে তলোয়ার দ্বারা সংহার করিবেন; বন্দুক, রাইফেল, কামান তথা আনবিক অস্ত্রাদি দ্বারা নহে। এক্ষণে স্মরণীয় যে, বর্তমান যুগ আনবিক যুগ, তলোয়ারের যুগ নহে। অবতারগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী বেশ-ভূষা এবং অস্ত্রাদি ব্যবহার করেন। তাঁহারা যে জাতির মধ্যে আগমন করেন, তদনুরূপ বেশ-ভূষা পরিধাণ করেন।

www.pathagar.com

৩। **অষ্টৈশ্বর্যগুণান্বিত**—অন্তিম অবতারের মধ্যে অষ্ট সিদ্ধি তথা সদগুণাবলী বিদ্যমান থাকিবে বলিয়া পূরাণে লিপিবদ্ধ আছে।

৪। **জগৎপতি**—পতি শব্দ 'পা' (রক্ষা করেন) ধাতুতে "উতি" প্রত্যয় যোগ করয়া উৎপন্ন হইয়াছে। জগত বলিতে বিশ্ব, পৃথিবী বুঝায়। অতএব জগৎপতির অর্থ হইতেছে—বিশ্বের রক্ষা কর্তা।

৫। **অসাধুদমন**—অন্তিম অবতারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি দুষ্ট ও দুষ্কৃতি পরায়ণ ব্যক্তিগণকে দমন করিবেন।

৬। **চার ভ্রাতার সহযোগিতা লাভ করা**—ভ্রাতা শব্দ দ্বারা 'সহযোগী' নির্দেশ করিতেছে। অন্তিম অবতারের চারজন প্রধান সহযোগী হবেন। যাঁহারা প্রতি ক্ষেত্রে অন্তিম অবতারের সঙ্গে সহায়তা করিবেন।

৭। **দেবতাগণ কর্তৃক সহায়তা প্রদান**—ধর্মের প্রসার এবং দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের দমন করার পথে অন্তিম অবতারকে সহায়তা করার জন্য আকাশ হইতে দেবতাগণ অবতীর্ণ হইবেন।

৮। **কলির বিনাশকারী**-যে অর্থে শয়তান শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থে 'কলি' শব্দ প্রযুক্ত হয়। অন্তিম অবতারের দ্বারা কলি অর্থাৎ শয়তানগণ পরাজিত ও পরাভূত হইবে।

৯। **অপ্রতিম দ্যুতি**—অন্তিম অবতারের দেহ এত কান্তিময় হইবে যে, উহার বর্ণনা সম্ভব নহে। অধিকন্ত তাঁহার ন্যায় কান্তিময় কোন অবতার হয় নাই।

১০। **রাজার বেশে গুপ্ত দস্যুদের বিনাশ করণ**—ভাগবত পুরাণে অন্তিম ঋষি সম্পর্কে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি রাজার বেশে গুপ্ত দস্যুগণকে সংহার করিবেন।

১১। **শরীর হইতে সুগন্ধি বহির্গত হওয়া**—অন্তিম ঋষির শরীর হইতে সুগন্ধি নির্গত হইবে। উহার সৌরভে মানুষের মন নির্মল ও পবিত্র হইয়া যাইবে।

১২। **বৃহৎ সমাজের উপদেষ্টা হওয়া**—অন্তিম ঋষি অত্যন্ত বৃহৎ সমাজের কল্যাণকারী হইবেন। তিনি ধর্মচ্যুত অত্যাচারীগণকে দমন করিয়া তাহাদিগকে ধর্মীয় সরল পথে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

www.pathagar.com

১৩। **মাধব মাসের দ্বাদশী শুক্ল পক্ষে জন্ম গ্রহণ**—অন্তিম ঋষি মাধব মাসের (বৈশাখ মাস) শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তিথিতে জন্ম গ্রহণ করিবেন। ইহা কল্কি পুরাণে উল্লেখিত আছে।

১৪। **শম্ভল শহরের প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্ম**—অন্তিম ঋষি শম্ভল স্থানের প্রসিদ্ধ পুরোহিতের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন। পিতার নাম হইবে বিষ্ণুযশা এবং মাতার নাম হইবে সুমতি।

স্থান নিরূপণ

ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, অন্তিম অবতারের জন্ম 'শম্ভল' নামক স্থানে হইবে। তবে কোন স্থানের পরিপূর্ণ বর্ণনা ব্যতীত কেবলমাত্র নামের দ্বারা স্থান নির্ণয় করা যায় না। প্রথমতঃ ইহা দেখিতে হইবে যে, 'শম্ভল' কোন নাম, না, কোন স্থানের বিশেষণ।

শম্ভল কোন গ্রামের নাম হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে উক্তগ্রামের অবস্থিতি কোথায়, তাহাও বলা হইত। কিন্তু পুরাণের মধ্যে কোন স্থানেই শম্ভল গ্রামের অবস্থিতি সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নাই। ভারতে যদি কোন শম্ভল নামক গ্রাম থাকিত, তাহা হইলে প্রায় ১৪০০ বর্ষ পূর্বেই উক্ত গ্রাম হইতে কোন উদ্ধার কর্ত্তা অবতার জন্ম গ্রহণ করিতেন। অন্তিম অবতার হওয়া কোন খেলার কথা নয় যে, অবতার হবেন, কিন্তু পৃথিবীতে কোন পরিবর্তন আনিবেন না। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শম্ভল শব্দকে বিশেষণ শব্দ স্বীকার করিয়া তাহার বুৎপত্তিগত অর্থ নির্গত করা আবশ্যক।

১। **'শম্ভল শব্দ শন্'** (শান্ত করণ) ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শম্ভল অর্থাৎ "যে স্থানে শান্তি লাভ হয়।"

২। **সম্ উপসর্গপূর্বক** 'বৃ' ধাতুকে অপ্ প্রত্যয় যোগ করিয়া 'সংবর' হইয়াছে। "অবযোরভেদ" এবং "রলযোরভেদ" এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শম্ভল নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শম্ভল' এর অর্থ-যাহা নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করে অথবা যাহার দ্বারা অন্যকে নির্বাচিত করা হয়।

৩। **নির্ঘন্ডের** (১।১২।৮৮) উদক নামা অধ্যায়ে "শম্ভর" শব্দ লিখিত আছে। 'র' এবং 'ল' এর মধ্যে মূল গত কোন পার্থক্য নাই। সেই হেতু "শম্ভল" এর অন্য একটি অর্থ হইতেছে-জলের সমীপবর্ত্তী স্থান।

www.pathagar.com

কেহ মনে করিতে পারেন যে, যদি শম্ভল শব্দের অর্থ জল নিষ্কাষণ বুঝায়। তাহা হইলে জলের সমীপবর্ত্তী স্থান বা গ্রাম অর্থ কেন করা হইতেছে। ইহার উত্তরে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এখানে স্থান-নিরূপণ প্রসঙ্গে আলোচনা হইতেছে। সেই জন্য কেবল 'জল' অর্থ হইতে পারে না, বরং জলের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান নির্দ্দেশ করিবে। যেরূপ "গঙ্গায় ঘোষ" শব্দ দ্বারা "গঙ্গার জলের উপর ঘোষ" অর্থ করা হয় না, বরং গঙ্গার সমীপর্বতী কোন গ্রামে ঘোষ বলিয়া অর্থ করা হয়। তদ্রূপ 'শম্ভল' শব্দ দ্বারা জলের সমীপবর্ত্তী স্থান বা গ্রাম বুঝাইতেছে। "গঙ্গায় ঘোষ" বাক্যের মধ্যে যে প্রকার লক্ষণ বিদ্যমান, এখানেও তদ্রূপ বাক্যধারার লক্ষণাদি বর্তমান আছে।

সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, অন্তিম ঋষির জন্ম-ভূমি জলের পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা হইবে এবং আকর্ষণীয় ও শান্তি দায়ক হইবে। অবতারগণের জন্মভূমিও পবিত্র হইয়া থাকে। অতএব অন্তিম ঋষির জন্ম ভূমিও পবিত্র এবং হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি হইতে নির্মল হইবে। অনন্তর উক্ত স্তান, ধার্মিক ব্যক্তিদের তীর্থস্থান হইবে।

'শম্ভল' শব্দের অভিধানিক অর্থ হইতেছে—শান্তির স্থান। অতএব অন্তিম ঋষির স্থান, শান্তিদায়ক এবং হিংসা বিদ্বেষ হইতে পবিত্র হইবে।

এখানে একটি সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য যে, কেহ যেন এই ভ্রান্তিতে পতিত না হন যে, অন্তিম ঋষি একমাত্র ভারত-বাসী হইবেন এবং তাঁহার মাতৃভাষা কেবল হিন্দী বা সংস্কৃত হইবে। কারণ বেশ-ভূষা এবং ভাষা দেশকাল-পাত্র অনুসারে হইয়া থাকে। যদি সমস্ত অবতারের বেশ ভূষা ও ভাষা এক হওয়া বাধ্যতামূলক হইত; তাহা হইলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবতারগণের বেশভূষা ও ভাষা এক হইত। কিন্তু ইহা হয় নাই, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রীতি নীতি-ভাষা অনুযায়ী সেই দেশের অবতারগণের বেশ ভূষা ও ভাষা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইহা চিন্তা করা যে, একমাত্র ভারতেই সমস্ত অবতারগণ আসিবেন। এইরূপ চিন্তা মূর্খ ও মূঢ় ব্যক্তিগণের চিন্তা ধারা। এই কথা কি কেহ বলিতে পারেন যে, ঈশ্বর একমাত্র ভারতকে

www.pathagar.com

সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্য কোন দেশ করেন নাই? অথবা ঈশ্বর পক্ষপাত দূষ্ট ভাবে একমাত্র ভারতকেই ভালবাসেন অন্য কোন দেশকে ভালবাসেন না?

অতএব অন্তিম ঋষি ভারত বহির্ভূত পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে পারেন এবং দেশ-কাল-অনুযায়ী তাঁহার ভাষা ও বেশভূষা হইবে।

এক্ষণে ঐতিহাসিক বিচারে ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে তেরো চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে ভারতে এমন কোন ঋষি আবির্ভূত হন নাই, যাঁহার মধ্যে অন্তিম ঋষির গুণাবলী সমূহ বিদ্যমান ছিল।

যত পুরাণ আছে প্রত্যেকটিতেই কল্কি অবতারের জন্মভূমি "সম্ভল" বলা হইয়াছে। সম্ভল এবং শম্ভর একই অর্থ বোধক। আমি "অন্তিম" অবতারের সিদ্ধিঃ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে স্থান নিরুপণ সম্পর্কে আলোচনা করিব।

অন্তিম অবতারের সিদ্ধি

মৌলিক তথ্য ও প্রমাণের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কল্কি অবতার অশ্বারোহী এবং খড়গধারী হইবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে অশ্ব এবং তরবারীর যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ আধুনিক যুগ জেট বিমান এবং আনবিক অস্ত্রের যুগ। সুতরাং কল্কি অবতার আবির্ভূত হইবার যুগ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আজ হইতে কোন পূর্ব-যুগে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব আসুন, আমরা মোহম্মদ সাহেব এবং কল্কি অবতারের তুলনামূলক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি।

(১) **অশ্বারোহন ও খড়গধারণ ঃ**—ভাগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঊনিশতম শ্লোকে উল্লেখিত আছে যে, কল্কি অবতার দেবতা প্রদত্ত অশ্বে আরোহন করিবেন এবং তরবারি দ্বারা দুষ্টের দমন করিবেন। এই দিক দিয়া দেখা যায় যে, মোহম্মদ সাহেবও ঈশ্বরের নিকট হইতে 'বোরাক' নামক একটি ঐশ্বী অশ্ব লাভ করেন; যাহার উপর আরোহন করিয়া তিনি 'মেরাজ' তীর্থ যাত্রা করেন। এতদ্ব্যতীত মোহম্মদ সাহেব ঘোড়া ভালবাসিতেন; তাঁহার আরো সাতটি ঘোড়া বিদ্যমান ছিল। আনাস বলেন যে, আমি মোহম্মদ সাহেবকে অশ্বে আরোহণ করিয়া গলায় তরবারী ঝুলান অবস্থায় দেখিয়াছি। মোহম্মদ সাহেবের মোট নয়টি তরবারী ছিল। (ক) বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত

www.pathagar.com

তলোয়ার সমূহ (খ) জুলফিকার নামক তলোয়ার এবং (গ) কলঙ্গ নামক তলোয়ার।

(২) **জগদ্‌গুরু**—ভাগবত পুরাণে কল্কি অবতারকে 'জগৎপতি বলা হইয়াছে। যিনি উপদেশাবলী দ্বারা নিপতিত পৃথিবীকে উদ্ধার ও রক্ষা করেন, তাঁহাকে জগৎপতি বলা হয়। তিনি নির্দিষ্ট কোন জাতির গুরু নহেন, তিনি হলেন সমগ্র বিশ্বের গুরু। এই দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখা যায় যে, কোরানে মোহম্মদ সাহেবকে সমগ্র বিশ্বে ঘোষণা করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, হে মোহম্মদ, আপনি সমগ্র পৃথিবীর জন্য নবি স্বরূপ আগমণ করিয়াছেন, ইহা ঘোষণা করিয়া দিন (৯ পারা ৭ আরাফ ১৫৮ আয়াত)। কোরাণে অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, মহিমান্বিত প্রভু, যিনি স্বীয় বান্দার উপর পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহাতে তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য পাপ হইতে সতর্ককারী হন (১৮ পারা ২৫ ফোরকান ১ম আয়াত)।

অতএব এইভাবে মোহম্মদ সাহেব জগদগুরু রূপে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন।

(৩) **অসাধু দমন ঃ**—কল্কি অবতার সম্পর্কে উক্ত আছে যে, তিনি পাপাচারীদিগকে দমন করিবেন। ইহা একমাত্র মোহম্মদ সাহেবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। কোরাণেও অত্যাচারী পাপিষ্ঠ দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ "আল্লাহ এক" এই কথা বলার জন্য একেশ্বরবাদীগণের উপর তাহারা অত্যাচার করিয়াছে, এমন কি তাহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। মোহম্মদ সাহেব লুণ্ঠণকারী এবং দুর্বৃত্তগণকে সংশোধন করিয়া সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; ঈশ্বরের পূজার সহিত দেবতার পূজার সংমিশ্রণকে রোধ করিয়াছেন এবং মূর্ত্তিপূজা বিলোপ করিয়াছেন। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হইতেছে—ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করার ধর্ম। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা স্বীকার করে না, তাহাকে যথার্থভাবেই নাস্তিক বা কাফের বলা হয়।

মোহম্মদ সাহেব এমন যুগে জন্মগ্রহণ করেন, যখন সমগ্র বিশ্বে অনাচার ও দুষ্টের শাসন চলিতেছিল। ইতিপূর্বে ইরানে কোবাদ নামক এক রাজা ঘোষণা করেছিলেন যে, ধন এবং নারীর উপর সকলের সমান অধিকার। কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য উহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না।

www.pathagar.com

ইহার পরিনামে সমগ্র দেশ ব্যভিচারের পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। একমাত্র মোহাম্মদ সাহেবই এমন ব্যক্তি- যাঁহার শিষ্যগণ উক্ত দেশ জয় করিয়া সফলতার সহিত ধর্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

(৪) স্থান সম্পর্কে সামঞ্জস্যতা ঃ- কল্কি অবতারের "শম্ভল" নামক স্থানে এক পুরোহিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া উক্ত আছে। ২ পুরোহিতের নাম "বিষ্ণুযশ" হইবে।

'শম্ভল' শব্দ শম্ ধাতুর সহিত 'বন' প্রত্যয় যোগ করিয়া হইয়াছে। অতএব শম্ভল শব্দের অর্থ হইবে-শান্তির ঘর। মক্কা শহরকে আরবী ভাষায় 'দারুল আমান' বলা হয়, যাহার অর্থ হইতেছে-শান্তির ঘর। অতএব মোহম্মদ সাহেব এবং কল্কি অবতারের মধ্যে জন্মস্থান - গত মিল প্রমাণিত হইল।

(৫) প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্ম -কল্কি অবতার প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্মলাভ করিবেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, মোহাম্মদ সাহেব মক্কায় অবস্থিত কাবার সর্ব প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

(৬) কল্কির মাতা- পিতাঃ-কল্কি পুরাণে লিখিত আছে যে, কল্কির মাতার নাম সুমতি (সৌম্যবতী) হইবে। ইহার অর্থ -শান্ত এবং মননশীল স্বভাব যুক্তা। পিতার নাম-বিষ্ণযশ অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসক। মোহাম্মদ সাহেবের মাতার নাম ছিল আমিনা অর্থাৎ শান্ত স্বাভাব যুক্ত। পিতার নাম ছিল-আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ তথা বিষ্ণুর দাস।

(৭) অন্তিম বা শেষ অবতার হওয়া—ভাগবত পুরানে কল্কি অবতারকে শেষ যুগে সর্ব্বশেষ অবতার রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে পবিত্র কোরাণ মোহম্মদ সাহেবকে সর্বশেষ নবি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সেহেতু মুসলমানগণ ভবিষ্যতে কোন নবি আসিবেন বলিয়া স্বীকার করেন না।

"বাচস্পত্যম" এবং **"শব্দ কল্পতরু" গ্রন্থে "কল্কি"** শব্দের অর্থ লিখিত আছে-ডালিম ফল ভক্ষণকারী; কলঙ্ক বিধৌতকারী। মোহম্মদ সাহেবও ডালিম এবং খেজুর ফল আহার করিতেন। অনন্তর তিনি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত অংশীবাদিতা এবং নাস্তিকতা বিদূরিত করেন।

www.pathagar.com

(৮) উত্তর দিক গমন এবং প্রত্যাবর্ত্তন—কল্কি পুরাণে উল্লেখিত আছে যে, কল্কি অবতার পর্বতের দিকে যাইবেন; তথায় পরশুরাম কর্তৃক জ্ঞান লাভ করিয়া উত্তর দিকে গমণ করিবেন এবং পুনরায় প্রত্যাগমন করিবেন। মোহম্মদ সাহেবও পর্বতে গমণ করেন; তথায় জিব্রাইল কর্তৃক জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার উপর কোরাণ অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। উহার কয়েক বৎসর পর তিনি উত্তর দিকে মদিনায় গমন করেন এবং পুনরায় মক্কা বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসেন।

(৯) শিব কর্তৃক কল্কিকে অশ্ব প্রদান—শিব কল্কি অবতারকে একটি অতি উত্তম অশ্ব প্রদান করিবেন বলিয়া উক্ত আছে। তদ্রূপ মোহম্মদ সাহেব ঈশ্বরের নিকট হইতে 'বোরাক' নামক এক অতি উত্তম অশ্ব লাভ করেন, যাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) চার সঙ্গীর সহিত কলি দমন - কল্কি পুরানে উল্লেখিত আছে যে, কল্কি অবতার তাঁহার চারজন সঙ্গীর সহিত কলি অর্থাৎ শয়তানকে নিবারিত করিবেন। তদ্রূপ মোহম্মদ সাহেবও তাঁহার চারজন সহচরগণের সহিত শয়তানকে নিবারিত করেন। চারজন সহচরগণের নাম হইতেছে—

(১) আবুবরক
(২) উমর
(৩) উসমান এবং
(৪) আলি।

পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা চারজন খলিফা হইয়া একেশ্বরবাদ এবং ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার করেন।

(১১) দেবতা কর্তৃক সহায়তা —কল্কি পুরাণে উল্লেখ আছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতাগণ কল্কি অবতারকে সাহায্য করিবেন। এইরূপ ঘটনা মোহম্মদ সাহেবের জীবনে 'বদর' নামক যুদ্ধে বাস্তবে পরিণত হয়। উক্ত যুদ্ধে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সাহায্য করেন। (৪ পারা, ৩ ইমরান, ১২৩-১২৫ আয়াত, এবং ৯ পারা, ৮ আনফাল, ৯ আয়াত দ্রঃ)

(১২) অনুপম কান্তিময় হওয়া ঃ—কল্কি অবতার সম্পর্কে

www.pathagar.com

উল্লেখ আছে যে তিনি অনুপম এবং অতুলনীয় কান্তির অধিকারী হইবেন। মোহম্মদ সাহেব সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর এবং কান্তিবান ছিলেন।

(১৩) জন্মতিথির বিষয় ঃ—কল্কি পুরাণে উল্লেখ আছে যে, কল্কি অবতার মাধব মাসে শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তারিখে জন্মগ্রহণ করিবেন।

এবার দেখুন যে, মোহাম্মদ সাহেবও রবিয়ল আওয়াল মাসে শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা ঐতিহাসিক প্রমাণিত।

(১৪) শরীর হইতে সুগন্ধ নির্গত হওয়া ঃ—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী কল্কি অবতারের শরীর হইতে সুগন্ধ বহির্গত হইবে, এমন কি বায়ু সুগন্ধিত হইয়া যাইবে।

মোহম্মদ সাহেবের দেহ হইতে প্রকাশিত সুগন্ধ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত করমর্দন করিত, তাহার হাতও সারাদিন সুগন্ধিময় হইয়া থাকিত। মোহম্মদ সাহেবের এক সেবক বলেন যে, যখন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন, তখন সমস্ত বাতাস মুখরিত হইয়া যাইত।

একদা উম্মে সালমা, মোহম্মদ সাহেবের দেহের ঘর্ম শিশিতে ভরিয়া রাখেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, উহাকে আমরা অন্য সুগন্ধিতে মিশ্রিত করিয়া থাকি। কারণ মোহম্মদ সাহেবের ঘর্ম সকল সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক সুগন্ধময়।

অষ্টগুণে গুণান্বিত

(১৫) অষ্ট গুণে গুণান্বিত ঃ—ভাগবত পুরাণের ১২শ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে কল্কি অবতারকে অষ্ট গুণে গুণান্বিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত অষ্ট গুণ অবতারকে অষ্ট গুণে গুণান্বিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত অষ্ট গুণ হইতেছে—প্রজ্ঞা, কুলীনতা, ইন্দ্রিয় দমন, শ্রুতি-জ্ঞান, পরাক্রম, অল্পভাষিতা, দান এবং কৃতজ্ঞতা।

(ক) প্রজ্ঞা-মোহম্মদ (সঃ) সাহেব অত্যন্ত উচ্চজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সকল বিষয়ে সঠিক বর্ণনা করিতেন, তাঁহার সকল ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হইত। ইহার বহু উদাহরণ ইনায়েত আহমদ প্রণীত

www.pathagar.com

আল কালামুল মুবিন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। রোম ইরানের মধ্যে যুদ্ধে রোমদিগের পরাজয়ের পর মোহম্মদ সাহেব পুনরায় রোমগণের জয়লাভের ভবিষ্যদ্বানী করেন, যাহা আজ সমগ্র বিশ্বের ঐতিহাসিকগণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরো অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসে লেখা আছে।

(খ) কুলীনতা—কল্কি প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন, যাহা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। মোহম্মদ সাহেব মক্কার প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পরিবার কাবা গৃহের সংরক্ষক ছিলেন। মোহম্মদ সাহেব ৫৭১ খৃঃ কোরেশ বংশের হাশিম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা বংশ পরম্পরায় বিশ্ব বিখ্যাত তীর্থস্থান কাবার সংরক্ষক ছিলেন।

(গ) ইন্দ্রিয় দমন—ভারতীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কল্কি ইন্দ্রিয় দমনকারী হইবেন। মোহাম্মদ সাহেব সম্পর্কেও বলা হইয়াছে যে, "তিনি দয়ালু, শান্ত, ইন্দ্রিয়-জীত এবং উদার ছিলেন।" ইন্দ্রিয় দমনের তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করা। ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কর্ম করে। সুতরাং প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয়ও বশীভূত হয়। যদি কেহ প্রশ্ন করেন—যে ব্যক্তি নয়বার দার পরিগ্রহ গ্রহণ করেন, তিনি কিভাবে ইন্দ্রিয়জীত হবেন? তাঁর স্মরণ করা উচিত যে, যোগীরাজ শ্রীকৃষ্ণের রাণীর সংখ্যা কি ছয়শতেরও অধিক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে যোগী ব্যক্তি সাংসারিক জীবন যাপন করিলেও নিষ্কাম আত্মার কারণে তাঁহারা মুক্তি ও নির্বান লাভ করেন। কমল যদ্রূপ জলে থাকা সত্বেও জলের স্পর্শ হইতে মুক্ত থাকে, তদ্রূপ যোগী ব্যক্তি (ঈশ্বর প্রাপ্ত ব্যক্তি) সাংসারিক জীবন যাপন করিলেও উহা হইতে বহু উর্দ্ধে থাকেন। অনুরূপ ভাবে মোহম্মদ সাহেব বার পত্নী গ্রহণ পূর্বক সাংসারিক জীবন যাপন করিলেও তিনি পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় দমনকারী মহাপুরুষ ছিলেন।

(ঘ) শ্রুত—কল্কি অবতারের ইহা চতুর্থ গুণ। "শ্রুত" এর অর্থ-ঈশ্বর কর্তৃক যে ব্যক্তিকে শ্রবন করান হয় এবং ঋষি তথা পয়গম্বর যাহা শ্রবন করেন। 'শ্রুত' শব্দ 'শ্রু' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও তথ্যমূলক গ্রন্থকে 'শ্রুতি' বলা হয়। মোহম্মদ সাহেবের উপর ফেরেস্তা দ্বারা ঈশ্বরীয় জ্ঞান অবতীর্ণ করা হইত।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক লেনপুল ইহা সমর্থন করিয়া বলেন যে, মোহাম্মদ সাহেবের উপর দেবদূত দ্বারা ঈশ্বরীয় বাণী অবতীর্ণ হইত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্যার উইলিয়াম মুয়রও মোহাম্মদ সাহেবকে ঈশ্বরের দূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং কল্কি অবতারের চতুর্থ গুণ দ্বারা মোহম্মদ সাহেব গুণান্বিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

(ঙ) পরাক্রমশালীতা—কল্কি অবতারের পঞ্চম গুণ অনুযায়ী তিনি পরাক্রমশালী হইবেন। মোহম্মদ সাহেবও শারীরিক শক্তিতে পরাক্রমশালী ছিলেন। একদা সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর কোরেশ বংশীয় রোকানা নামক ব্যক্তি। মোহম্মদ সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলে মোহম্মদ সাহেবকে মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু মল্লযুদ্ধে মোহম্মদ সাহেব উক্ত মহাবীর রোকানাকে দুইবার পরাস্ত ও পর্যদস্ত করিয়া দেন।

(চ) অল্প ভাষণ—অল্প ভাষণ মহাপুরুষগণের একটি বড় গুণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। মোহম্মদ সাহেবও অত্যন্ত সংযত-ভাষী ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বলিতেন, উহা এত প্রভাবশালী হইত যে, কোন মানুষ উহা ভুলিতে পারিত না। পারস্পরিক কথাবার্তায় তিনি অল্পভাষী ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বলিতেন, তখন উহা এত মধুরতায় পরিপূর্ণ হইতে যে, সকলেই আগ্রহ সহকারে শুনার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিত।

(ছ) দান—দুঃখীজনকে দান করা ধর্মের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রায় প্রত্যেক মহাপুরুষ উহার গুরুত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। পূরাণে কল্কি অবতারের অষ্টম গুণরূপে ইহাকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। মোহম্মদ সাহেব সর্ব্বদা দান করিতেন এবং তাঁহার গৃহ সর্ব্বদা দুঃখী-দরিদ্র, নিঃস্ব-অনাথগণের সমাবেশ থাকিত। তিনি কখনো কাহাকেও নিরাশ করিতেন না। ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়ামকে পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, মোহম্মদ সাহেব জ্যোতির্ময় মূর্ত্তিধারী, পরাক্রমশালী এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।

(জ) কৃতজ্ঞতা—কল্কি অবতারের অষ্টম গুণ হইতেছে—কৃতজ্ঞতা গুণে গুণান্বিত হওয়া, ইহা পুরাণে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বর্ণিত প্রবন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপাদিত করা

www.pathagar.com

হইয়াছে যে, মোহম্মদ সাহেবের মধ্যে কল্কি অবতারের অষ্ট গুনের মধ্যে সপ্তগুণ সমূহ পরিপূর্ণ এবং সার্থক ভাবে বিদ্যমান ছিল। অষ্টম গুণ 'কৃতজ্ঞতা' গুণে তিনি কতদুর বিভূষিত ছিলেন তার প্রমাণ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। আনসার তথা সাহায্য সহায়তা কারীদের প্রতি তিনি কত কৃতজ্ঞ ছিলেন, তার ভূরি ভূরি ঘটনা প্রতিটি ইতিহাসে আকীর্ণ আছে।

ঐশ্বরিক বাণী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া

(২৬) **ঐশ্বরীক বাণী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া**—কল্কি অবতার সম্পর্কে ভারতে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি বৈদিক ধর্ম অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন। অনন্তর তিনি ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা মানবজাতিকে শিক্ষা দিবেন। মোহম্মদ সাহেবের উপর ঈশ্বরের নিকট হইতে যে কোরান অবতীর্ণ (৩০ পারা, ৯৭ কদর, ১ আয়াত) হইয়াছিল, ইহা অমোঘ সত্য। নিছক হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কোরাণে মহান নীতি, সদাচার, বিশ্ব-প্রেম, একেশ্বর-বাদ এবং মহৎ আদর্শ সমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে; বেদ গ্রন্থেও উহার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বেদ ও কোরাণের শিক্ষা

১। কোরাণে আছে যে, ঈশ্বর ব্যতীত কেহ উপাসনার যোগ্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সয়ম্ভু ও সর্ব্ব ব্যবস্থাপক। পৃথিবী ও বিশ্ব ব্রহ্মণ্ডের যাবতীয় বস্তু তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আছে; তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহ তাঁহার কাছে কোন সুপারিশ করিতে পারে না। তিনি মানবের অতীত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় অবগত আছেন। এবং মানব জ্ঞানের কিছুই জানিতে পারে না, তবে যতটুকু তিনি দান করেন। তাঁহার আসন পৃথিবী ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহার পক্ষে বিন্দুমাত্র অনায়াস সাধ্য নয়। তিনি অতি মহৎ ও মহান।

উপনিষদ সমূহের ঘোষিত "একং ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, নেহনা নাস্তি কিংচনঃ অর্থ এই যে, ঈশ্বর একক, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ (উপাস্য) নাই। জগৎ তিনি ব্যতীত কিছু নয় অর্থাৎ তিনি যতক্ষণ জগতকে রক্ষা করেন, ততক্ষণ জগৎ স্থিতিশীল থাকে। তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া

www.pathagar.com

জগৎ ক্ষণকালও স্থায়ী হইতে পারে না।

২। যাঁহাকে কোন চক্ষু দর্শন করিতে পারে না, অধিকন্ত সকল চক্ষুকে যিনি অবলোকন করেন, একমাত্র তাঁহাকেই ব্রহ্ম জানিবে।

কোরাণে উল্লেখ আছে যে, চক্ষু তাঁহাকে গোচরীভূত করিতে পারে না, তিনি সকল চক্ষুকে গোচরীভূত করেন।

৩। কোরাণে প্রার্থনাকারে আছে যে, আপনি আমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করুন।

ঋগ্বেদে আছে যে, হে প্রকাশক পরমেশ্বর, আমাদিগকে সুন্দর পথে চালিত করুন।

৪। কোরাণে আছে যে, হে মোহম্মদ আপনি বলুন যে, আল্লাহ একক; সমগ্র সৃষ্ট জগৎ তাঁহার প্রতিমুখাপেক্ষী। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই। তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। (৩০ পারা ১১২ ইখলাছ, ১-৪ আয়াত দ্রঃ)

উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, পরমেশ্বর একক; সকল প্রাণীর মধ্যে তিনি ব্যাপ্ত; সকল কর্মের অধ্যক্ষ, সর্বোপরি, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞাত এবং নির্গুন।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিকবাসঃ, সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুনশ্য॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৬, মন্ত্র ১১

৫। কোরাণের ভাষায় "আল্লাহ্ হক, সত্য"। বৈদান্তে উহাকে "সত্যং ব্রহ্ম" রূপে উল্লেখিত হইয়াছে। (১৭ পারা, ২২ হজ, ৬২ আয়াত দ্রঃ)

৬। কোরাণে আছে যে, যেদিকে তোমরা মুখ ঘুরাও, সেখানে পরমেশ্বর আল্লাহ'র মুখ আছে। ১ পারা ২ বাকরা ১১৫ আয়াত দ্রঃ)

গীতায় বলা হইয়াছে—"বিশ্বতোমুখম" অর্থাৎ তাঁহার মুখ সর্বদিকে আছে।

৭। বেদ, গীতা এবং স্মৃতি গ্রন্থ সমূহে এক ঈশ্বরকে ভক্তি করা এবং তাঁহার সমীপে স্বীয় পাপ-মার্জনার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার নির্দ্দেশ আছে।

www.pathagar.com

কোরাণে উল্লেখ আছে যে, হে (মোহম্মদ) নবি, আপনি বলুন যে, আমি তোমাদের ন্যায় মানুষ। আমার প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা অবতীর্ণ হইয়াছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র একক উপাস্য। সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁহার প্রতি অভিনিবিষ্ট হও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। (২৬ পারা, ১৮ কাহাফ, ১১০ আয়াত দ্রঃ)

৮। **বেদকে শ্রদ্ধা না করা** এবং বেদের উপদেশকে অস্বীকার করাকে নাস্তিকতা বলা হয়। নাস্তিকতার অর্থ হইতেছে-অস্বীকার করা। অনুরূপভাবে কোরাণে ঈশ্বর তথা তাঁর দূতগণের আদেশ অস্বীকারকারীকে "কাফের" বলা হইয়াছে।

৯। **"মুসলমান" শব্দের অর্থ হইতেছে**—ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ মান্যকারী। যে ব্যক্তি ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় বাণী এবং প্রেরিত মহাপুরুষগণের উপর বিশ্বাস আনে, সে ব্যক্তি মুসলমান। সংস্কৃত উক্ত ব্যক্তিকে "আস্তিক" বলা হয়। যদ্রূপ নাস্তিকের বিপরীত আস্তিক; তদ্রূপ কাফেলের বিপরীত শব্দ মুসলমান। যেমন কোন আস্তিক ব্যক্তি নাস্তিকের সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করে না; তদ্রূপ কোন মুসলমান ব্যক্তি কাফেরের সহিত তর্ক করিতে চায় না। অতএব নাস্তিক এবং কাফের সমার্থবোধক; অনুরূপে আস্তিক এবং মুসলমান সমার্থবোধক; তফাৎ কেবলমাত্র ভাষার।

উপসংহার

কেবল আমি নহি, বরং প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি পক্ষপাতহীন হইয়া রাষ্ট্রীয় একতার উদ্দেশ্যে আলোচ্য গ্রন্থের প্রামাণ্য বিষয়-বস্তু স্বীকার করিবেন, যার ফলে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ জীবন শান্তিময় হইবে। ভারতীয়গণ যে কল্কিকে ভগবান রূপে জ্ঞান করেন, মুসলমানগণ সেই কল্কি অবতারেরই শিষ্য। কল্কি ভারতীয়গণের বহু কল্যাণ সাধন করিবেন বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রত্যেক ভারতীয় ব্যক্তির উচিৎ কল্কি অবতারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কারণ অন্তিমঋষি অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী এবং তরবারী ধারণকারী হইবেন। অথচ বর্তমান কাল অশ্ব ও তরবারি যুগ অতিক্রম করিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ কালে উহা ফিরিয়া আসার কোন সম্ভাবনা নাই। ভারতীয় মুসলমানগণকে ভিন্ন মনে করা ঠিক নহে। ইসলাম ও মুসলমান আরবী

www.pathagar.com

শব্দ; উহার অর্থ হইতেছে ঈশ্বরাজ্ঞা পালন ধর্ম, সনাতন ধর্ম তথা আস্তিক ব্যক্তি।

যে ব্যক্তি অন্ধের ন্যায় স্বীয় সনাতন ধর্মকে সংকীর্ণ করে এবং অন্য ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি না করিয়া পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, তাহাকে ঈশ্বরের রাজত্বে অগ্নিদগ্ধ করা হইবে। আমি আলোচ্য গবেষণা মূলক গ্রন্থকে পক্ষপাত দুষ্ট হইয়া লিপিবদ্ধ করি নাই। বরং অন্তর্যামি ঈশ্বরের নিকট হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কারণ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ও বৈরিতা এবং পারস্পরিক প্রাণ-হত্যা ইশ্বরকে ব্যথিত করিয়া তোলে। শিক্ষা দেওয়া উপদেশকের কাজ; কিন্তু পালন করানো উপদেশকের দায়িত্ব নহে। যিশুখৃষ্ট যে 'আহমদ' (ঈশ্বরের প্রশংসাকারী) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, বেদব্যাস যে কল্কি অবতারের আবির্ভাব বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহার সাক্ষ্য দেওয়াই আমার কর্ম। খৃষ্টানগণ কল্কিকে না মানিতে পারে, কিন্তু ভারতীয়গণ অবশ্যই তাঁহাকে স্বীকার করিবেন।

কল্কি অবতার ও মোহম্মদ সাহেবের মধ্যে যে অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য আমি দেখিতে পাইয়াছি। তারপর আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাই যে, ভারতীয়গণ কেন কল্কি অবতারের আগমণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন? প্রকৃতপক্ষে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি মোহম্মদ সাহেব। মৌলিক ধর্ম্ম নীতির দৃষ্টিতে উভয়েই এক। কিন্তু সংকীর্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ইহা অবগত নহে।

এক সময় বৈদিক ধর্মে কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য বুদ্ধদেব যে ধর্ম মত প্রচার করেন, সেই ধর্মকে এবং সেই ধর্মানুরাগীদিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হইত। লোকে বৌদ্ধ ধর্মকে বৈদিক ধর্ম ছাড়া এক নূতন ধর্ম বলিয়া ধারণা করিত। কিন্তু যখন প্রমাণিত হইল যে; পুরাণে বর্ণিত চব্বিশজন অবতারের মধ্যে বুদ্ধদেব ত্রয়বিংশতম (২৩শ) অবতার; তখন সকলে এক বাক্যে বুদ্ধজিকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং বৌদ্ধ-ধর্ম ও হিন্দু-ধর্মের মধ্যে বৈরিতা, অসামঞ্জস্যতা বিদূরিত হইল। তদনুরূপ মোহম্মদ সাহেব প্রদর্শিত ধর্ম এবং সেই ধর্মানুগামীদিগকে দেখিয়া হয়তঃ মনে হইতেছে যে, ইহা বৈদিক ধর্মের বিপরীত ধর্ম। কিন্তু পুরাণে বর্ণিত চতুর্বিংশতম (২৪শ) অবতারের

www.pathagar.com

বর্ণনা এবং ভগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্দে অধ্যায় যাবতীয় বৃত্তান্ত দেখিয়া সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইল যে, একমাত্র মোহম্মদ সাহেবের সঙ্গে উহার পরিপূর্ণ মিল আছে। তখন আমার বিশ্বাস হইল যে, তিনিই কল্কি অবতার এবং তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্ম দ্বারা বৈদিক ধর্ম্ম নূতন রূপে পরিপুষ্টতা লাভ করিয়াছে। এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে, যখন সকলে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং ভারতের ব্রাহ্মণ, শৈব, শাক্ত, জৈন হোক বা বৌদ্ধ হোক সকল শ্রেণীর মানুষ দ্বারা ইসলাম ধর্ম স্বীকৃতি লাভ করিবে। ফলে ভারতের সকলে মিলিত হইয়া বিরাট এক ঐক্যবদ্ধ সমাজ সৃষ্টি হইবে। লাঠি ও অস্ত্রের বলে ধর্মের ও প্রসার করা যায় না। বরং ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের অন্তরে যখন প্রকৃত ধর্মের সত্যরূপ প্রবেশ করে, তখন স্বেচ্ছায় শ্রেষ্ঠ ধর্মকে গ্রহণ করিয়া নেয়। ধর্ম্ম পণ্ডিতগণের কর্তব্য হইতেছে- ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে মানুষের কাছে তুলিয়া ধরা। ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারিলেই মানুষ স্বেচ্ছায় উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার দ্বারা ধর্মকে গ্রহণ করানো যায় না। ধর্ম প্রচারকগণের শান্তির পথ অবলম্বন করা উচিৎ। দাড়ী-টিকি বা বেশভূষার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই, উহা কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র। ধর্মের যোগ মানুষের অন্তর এবং বিচার বোধের সহিত সন্নিহিত; যার ফলে মানব জীবন সুচারুরূপে ও সার্থক ভাবে পরিচালিত হয়।

প্রত্যেক হিন্দু এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবলমাত্র তাহারাই হিন্দু নন। বরং ভারতে বসবাসকারী মুসলমান খৃষ্টান সকলেই হিন্দু। কারণ হিন্দু শব্দের অর্থ হইতেছে- হিন্দুস্থানে বসবাসকারী।

মুসলমানগণের প্রতিও আমার অনুরোধ যে, হিন্দু এবং হিন্দুস্তান শব্দ তাঁহাদেরই প্রদত্ত; যাহা উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যেন নিজেদিগকে হিন্দু বলিতে কংকোচ না করেন। ভারতে যে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল, তাহা জাতি ভিত্তিক নহে, বরং কর্ম ভিত্তিক ছিল। কারণ "বরনাত্ বর্ণ" জাত্যা জাতিং।" ঈশ্বরের আরাধনাকারী এবং সংযমী মুসলমানও ব্রাহ্মণ; তথা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব মুসলমান অর্থাৎ আস্তিক। মুসলমানের অর্থ লিঙ্গচ্ছেদন নহে এবং আস্তিকের অর্থ চৈতন রাখা নহে। দাড়ী প্রাচীনকালে মুণি-ঋষিগণও রাখিতেন।

www.pathagar.com

ভারতে যতদিন পর্যন্ত উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ দূর না হইবে, সকলের প্রতি সমান ব্যবহার না হইবে, ততদিন সুখ-শান্তি সম্ভব নহে।

ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ

সদাচার আদর্শ জ্ঞান, ব্রাহ্মণত্ব, দেবপূজন (দিব্য পরমাত্মার আরাধনা), হনুক নামক ঈশ্বর দূত দ্বারা জ্ঞানে ভূষিত বিদ্বানকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। বিষ্ণুভক্তি, প্রকাশক পরমাত্মার আরাধনা, অহিংসা, তপস্যা, ইন্দ্রিয় দমনকে ম্লেচ্ছ ধর্ম বলা হইয়াছে।

একেশ্বর বাদ

ঋগ্বদে বিশ্ব-চরাচরে পরিব্যাপ্ত ঈশ্বরের বর্ণনা বহুরূপে প্রদান করা হইয়াছে। ইহার ফলে অনেকে বহু দেববাদের প্রতিপাদন করতঃ ঋগ্বেদকে বহু দেববাদী গ্রন্থ করিয়া দিয়াছেন। অনেকে ঋগ্বেদে উল্লেখিত বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন গুণাবলী দেখিয়া একাধিক দেবতার কল্পনা করিয়াছেন। ইহা ঋগ্বেদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। প্রকৃতপক্ষে সত্বা এক; তাঁহার বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, গরুত্মান, যম এবং মাতারিখা ইত্যাদি নাম দ্বারা একই সত্বাকে বিভিন্ন রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বেদান্তে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" অর্থাৎ পরমেশ্বর এক, তিনি ব্যতীত কেহ নাই।

সার্বভৌম ধর্ম এবং উপসংহার

(১) সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক পরমেশ্বরকে প্রত্যেক ধর্ম স্বীকার করে। পৃথিবীতে কোন ধর্ম পরমেশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না।

(২) পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। তাঁহার সৃষ্ট কোন জীব ও প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া, সত্য বলা, দান করা, অন্যের উপকার স্বীকার করা, দরিদ্রকে সাহায্য করা, এবং ধর্ম পালন করা প্রত্যেক ধর্মের মৌলিক সিদ্ধান্ত।

(৩) ধর্মের নামে অধর্ম ও অসত্যের বাহ্যাড়ম্বর উন্মোচণ করিয়া সত্যের স্বরূপ প্রকাশিত করা আবশ্যক।

www.pathagar.com

(৪) যে যাহাকে ভজন করে, সে তাহাকে লাভ করে। সুতরাং এক পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন দেবদেবীর ভজন করিলে কখনো এক পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় না।

(৫) পরমাত্মা একক; তিনি ভিন্ন অন্য কেহ স্তব-স্তুতির যোগ্য নহে।

(৬) অতএব প্রতিদিন একাগ্রমনে পরমেশ্বরের ধ্যান ও গুণগান করা উচিৎ।

(৭) প্রত্যেকের প্রতি নম্র ব্যবহার, কাহারো অন্তরে কষ্ট না দেওয়া, সদ-আচরণ, অন্তরের নির্মলতা ধারণ করা বিধেয়।

(৮) ন্যায় ও সত্য পথ হইতে আসুরিক শক্তি পথভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং ন্যায় পথে চলার সময় কোন বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইলে ন্যায় কার্য পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়।

(৯) পরমেশ্বরকে পরম ভক্তি করা উচিৎ। তাঁহার পূজায় অন্য কোন জিনিসকে যুক্ত করা উচিৎ নহে।

সকল ধর্মের শাশ্বত ও মৌলিক বিষয় সমূহ অবলোকন করিলে উহা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক, খৃষ্ট এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে মূলতঃ কোন বৈষম্য নাই। প্রকৃতপক্ষে পরবর্ত্তী যুগে কতিপয় স্বার্থান্বেসী ধর্মযাজকগণ ধর্মের মধ্যে সংযোজন করিয়াছেন। ফলে ধর্মের প্রকৃত রূপ অদৃশ্য ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ধর্মের মধ্যে অধর্ম এবং ধর্মের নামে অত্যাচার তখনই বন্ধ করা যাইবে, যখন প্রত্যেক মানুষ এই জ্ঞান অর্জন করিবে যে, পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ একই পিতামাতার (আদম ও হব্যবতী) সন্তান। যখন সকল ধর্ম অনুযায়ী পরমেশ্বর এক, মানব সৃষ্টির আদিপুরুষ এক, আকৃতি এক, ক্রিয়াকলাপ এক ও নরনারী সমান, তখন একই পিতা-মাতার সন্তানবর্গ মিথ্যা ধর্মের নামে পারস্পরিক কলহ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে কি কখনো পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হইতে পারেন? সুতরাং সকলকে পারস্পরিক প্রেম ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করা উচিৎ।

অথর্ববেদে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)

১ম মন্ত্রে যে ঋষির প্রসংসা গীত হইয়াছে, তাঁর নাম নরাশংস। নরাশংস অর্থ প্রশংসিত, প্রশংসার্হ।

www.pathagar.com

২য় মন্ত্র ঃ—এই মন্ত্রে উক্ত ঋষির তিনটি পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে।

(ক) উষ্ট্রে আরোহনকারী হবেন—

(খ) তাঁর একাধিক স্ত্রী থাকবেন—

(গ) তিনি রথে চড়ে উর্দ্ধাকাশে ভ্রমণ করবেন—

৩য় মন্ত্র ঃ—এখানে উক্ত ঋষির আর একটি নাম দেওয়া হয়েছে, তা হ'লো—মামহ। 'মামহ' সংস্কৃত নয়, উহা বিদেশী শব্দ। মামহ আসলে আরবী 'মহম্মদ' এর সংস্কৃত রূপ।

ঋগ্বেদে ৫ম মণ্ডল ২৭ সুক্ত ১ম মন্ত্রে-ও মামহ ঋষির উল্লেখ আছে।

৪র্থ মন্ত্র ঃ—এখানে বলা হয়েছে, হে রেভ, সত্য প্রচার কর।

বেদের হিন্দু ভাষ্যকার (Hindu commentators) 'রেভ' এর অর্থ করেছে Who glorifies অর্থাৎ যিনি প্রশংসা করেন তথা প্রশংসাকারী। অর্থাৎ রেভ দ্বারা এমন ঋষিকে সম্বোধন করে সত্য প্রচার করার ঐশী আদেশ দেওয়া হয়েছে, যাঁর নামের অর্থ প্রশংসাকারী।

৫ম মন্ত্র ঃ—এখানে মক্কা বিজয় যাত্রার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রশংসাকারীর দল প্রভুর প্রশংসা করতে করতে চলেছেন আর তাঁদের সন্তানগণ গৃহে তাঁদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

৬ষ্ঠ মন্ত্র ঃ—এখানেও রেভ ঋষিকে জ্ঞানময় স্তোত্র (প্রশংসাগীতি) ধারণ করে মানুষের মধ্যে তীরন্দাজের ন্যায় সুনিপুণ ভাবে প্রচার করতে আদেশ করা হয়েছে।

হযরত মোহাম্মদের উপর অবতীর্ণ কোরানকে 'হাকিম' জ্ঞানময় গ্রন্থ বলা হয়েছে।

৭ম মন্ত্র ঃ—এখানে উক্ত ঋষিকে রাজ ক্ষমতার অধিকারী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে যে, তিনি রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশে শান্তি স্থাপন করবেন।

৮ম-৯ম মন্ত্র ঃ—এখানেও ঋষিকে রাজারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর রাজ্যে এরূপ শান্তি বিরাজ করবে যে, একজন কুলবধু-

www.pathagar.com

ও রাজার থেকে নির্ভয়ে দিবা রাত্র যে কোন সময় দধি ক্রয় করে আনতে সক্ষম।

১০ম মন্ত্র ঃ—৭ম, ৯ম ও ১০ম মন্ত্রে উক্ত ঋষিকে 'পরিক্ষিত' নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

পণ্ডিত খেমচরণ দাস ত্রিবেদী মহাশয় 'পরিক্ষিত' এর অর্থ সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যবান রাজা করেছেন।

১১শ মন্ত্র ঃ—এখানে ঋষিকে ৪র্থ মন্ত্রের ন্যায় 'প্রশংসা কারী' বলা হয়েছে এবং তাঁকে সর্বত্র ঈশ্বরের প্রশংসা প্রচার করতে আদেশ দান করা হয়েছে।

১২শ-১৩শ মন্ত্র ঃ—এখানে উক্ত ঋষির রাজত্বে জনমানব ও পশু সকলের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটবে বলা হয়েছে। হযরত মোহাম্মদের নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত মুসলিম জাতি পৃথিবীতে কত সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করেছিল তা নিঃসন্দেহে বিশ্ব ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়, একথা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

১৪শ মন্ত্র ঃ—এখানে ঋষিকে বীর যোদ্ধা নামে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাঁকে আমাদের প্রশংসা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে আমরা পাপ হতে রক্ষা লাভ করি।

সামবেদে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)

'নরাশংস' — প্রশংসিত

'মোহাম্মদ' — প্রশংসিত

—মধু-জিহ্ব মিষ্ট ভাষী যজ্ঞকারী প্রিয় নরাশংসকে এইখানে এই যজ্ঞে আহ্বান করি।

—হে অতিবল ইন্দ্র, তুমি দীপ্যমান, স্তুতিরত দেবকে অবিলম্বেই প্রশংসিত কর; হে মঘবা, তুমি ভিন্ন আর কেউ সুখ দাতা নেই; আমি তোমারই স্তুতি করে থাকি॥

এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, (১) স্তুতিরত দেব বা ঋষি একজন আছেন (২) এবং তিনি ইন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত।

খৃষ্টান ঐতিহাসিক Prof Hitti বলেন যে, The form which his name takes in the koran is Muhammad and

www.pathagar.com

once Ahmad.... Muhammad (highly praised). [History of the Arabs ch VIII Pg III]

হযরত মোহাম্মদের দু'টি নাম ছিল একটি মোহাম্মদ—অর্থ প্রশংসিত; দ্বিতীয়টি আহমদ—অর্থ স্তুতিকারী, স্তুতিরত। আলোচ্য মন্ত্রে দু'টি নামই উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) অহমিদ্ধি — আহমদ

অহমিদ্ধি পিতস্পরি মেধামৃতস্য জগ্রভ।

অহং সূর্য্য ইবাজনি॥

উপরুক্ত সুক্তটি বেদের ৪টি স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। এর দ্বারা উহার গভীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, 'অহমিদ্ধি' শব্দটি বেদের অনুবাদকগণ সম্যক উপলব্ধি করতে না পারার কারণে বিভিন্ন জনে নিজেদের ধারণামত বিভিন্ন অর্থ করেছেন।

শ্রীরমেশ দত্ত মহাশয় উহার অর্থ করেছেন—আমি পিতা ও সত্য ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেছি, আমি সূর্য্যের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হয়েছি।

উক্ত মন্ত্রটি সামবেদের দুইস্থানে আছে—ঐন্দ্রকাণ্ড ১৫২ মন্ত্রে এবং উত্তরার্চিক ১৫০০ মন্ত্রে।

শ্রীপরিতোষ ঠাকুর মহাশয় উহার অর্থ এভাবে করেছেন—আমিই যজ্ঞের দ্বারা সত্য ও অন্নের অনুগ্রহ লাভ করেছি। আমি সূর্য্যের মত প্রকাশিত।

ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডল ৬ ঃ ১০ মন্ত্রে উহা উল্লেখিত আছে।

অথর্ববেদের ২০ কাণ্ড ১ অনুবাক ১৯ সুক্তের ১ম মন্ত্রে উহার উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্তবেদের অনুবাদক শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী মহাশয় উক্ত মন্ত্রের অনুবাদ করেন নাই।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শ্রীপরিতোষ ঠাকুর এবং শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয়ের বর্ণিত অর্থের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান এবং অন্যজন উহার অনুবাদ এড়িয়ে গেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত মন্ত্রের অর্থ সঠিক ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত মন্ত্রটি বৎস কন্ব কর্তৃক উচ্চারিত। বৎস কন্ব ছাড়া আরো একশত এক জন ঋষি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কন্ব ছাড়া অন্য

www.pathagar.com

সকলেই ইন্দ্রের অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত ছিলেন, এ কথার কোন প্রমাণ নেই।

তৃতীয়তঃ এই মন্ত্রের প্রভু দেবতা হলেন ইন্দ্র। কন্ব ছাড়া আর কেহ তার পুত্র ছিলেন না বা অন্য কোন পুত্র পিতা ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেন নাই, এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

চতুর্থঃ ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৮শ সুক্তের ৯ম মন্ত্রে কন্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি বলেন যে, "বিক্রমশালী সুবিখ্যাত ও আকাশের ন্যায় প্রাপ্ততেজা নরাসংশকে আমি দেখেছি।" শুক্ল যজুর্বেদে ২৮শ অধ্যায় ৪২শ মন্ত্রে আছে, "নরাসংশ দেব বিরাট ছন্দে ইন্দ্রের রূপ, ইন্দ্রিয় ও আয়ু ধারণ করেছিল।" সাম বেদে পূর্ব বর্ণিত ইন্দ্র কাণ্ডের ২৪৭ মন্ত্রে নরাশংসকে ইন্দ্র দ্বারা প্রশংসিত ঋষি বলা হয়েছে। অতএব একমাত্র বৎস ঋষিই ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন এ দাবী যুক্তিহীন।

পঞ্চমতঃ বলা হয়ে থাকে যে, অহমিদ্ধি=অহং+ইত+হি, অর্থ আমিই। কিন্তু উক্ত আমিই বোঝাতে 'ইত+হি' উভয় যোগ করার কোন যুক্তি নেই।

এত জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো "অহমিদ্ধি" শব্দ। আসলে উহা অসংস্কৃত ও নামবাচক শব্দ।.তদানুযায়ী উক্ত মন্ত্রটির অর্থ করলে আর কোন জটিলতা থাকে না।

—"অহমদ পিতা তথা প্রভুর নিকট হতে মেধামৃতলাভ করেছেন। আমি তাঁর নিকট হতে যথা সূর্য্যের নিকট হতে জ্যোতি লাভ করেছি।"

অহমদ মেধামৃত অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ লাভ করেন। সামবেদে এই মন্ত্রের পূর্বে উক্ত আছে যে-ইমম্‌ষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসম।

অপ্নে দেবেষু প্র বোচ।। ১৪৯৭

—হে অগ্নি, গায়ত্রীছন্দে রচিত আমাদের এই নবতর স্তুতিরূপ উপহার দেবগণের মধ্যে প্রচার কর।। ১৪৯৭

এখানে "গায়ত্রীছন্দে রচিত নবতর স্তুতিরূপ' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ সত্য যুগের সত্য ধর্মের একত্ববাদের ছন্দে হবে, কিন্তু পুরাতন ঐশী-গ্রন্থের রূপে হবে না; উহাই নবতর স্তুতিরূপ এবং পরবর্তী ১৫০০ মন্ত্রে উহাকে 'মেধামৃত' বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত মোহাম্মদ তথা আহমদ গায়ত্রী ছন্দে নিরাকার প্রভুর নিরাকার উপাসনা ও একত্ববাদের ছন্দে প্রভুর নিকট হতে জ্ঞানপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ কোরান প্রচার করেছেন। বিশ্বজগৎ যদ্রূপ সূর্য্যের নিকট হতে আলোক লাভ করে, তদ্রূপ বিশ্বমানব তার নিকট জ্যোতি লাভ করছে।

যজুর্বেদে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)

(১) নরাশংস — প্রশংসিত মানুষ

মহম্মদ — প্রশংসিত মানুষ

নরাশংসস্য মহিমানমেষামুপ স্তোষাম যজতস্য যজ্ঞৈঃ।
যে সুক্রতবঃ শুচয়ো ধিয়ন্ধাঃ স্বদন্তি দেবা উভয়ানি হব্যা॥
শুক্ল যজুর্বেদ ২১ অধ্যায় ২৭ সুক্ত।

-যে দেবগণ হবি ও উভয় সোম উভয় ভক্ষণ করেন, যাঁদের শোভন কর্ম, যাঁরা নিষ্পাপ ও বুদ্ধির ধারক; যজ্ঞে সেই দেবগণের যাগকারী নরাশংসের আমরা স্তুতি করছি॥

এর পরবর্তী সুক্তে 'নরাশংস' শব্দ ব্যবহৃত না হলেও উহার সমার্থগত শব্দ 'স্তুতিযোগ্য, বন্দণীয়' ব্যবহৃত হয়েছে-

আজুহ্বান ঈড্যো বন্দ্যশ্চা যাহ্যগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ।
ত্বং দেবানামসি যহ্ব হোতা স এনান্যক্ষীষিতো যজীয়ান॥
শুক্ল, ২৯ অধ্যায় ২৮ সুক্ত

হে অগ্নি, দেবতাদের আহ্বানকারী, স্তুতিযোগ্য, বন্দণীয়। দেবগণের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত তুমি এস। হে পূজ্য, শ্রেষ্ঠ যাগকর্তা তুমি প্রেরিত হয়ে দেবতাদের আহ্বান কর ও তাদের যাগ কর॥

বেদে উল্লেখিত 'অগ্নি' বলতে কোন বস্তুগত অগ্নি নয়, বরং উহা গুণগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী মহাশয় শুক্ল, (হরফ প্রকাশিত যজুর্বেদ) ৩য় অধ্যায় ১৩ সুক্তের টিকায় লিখেছেন, "যিনি অগ্রে নিয়ে যায়, তাকে অগ্নি বলে, অগ্রে নীয়াতে ইত্যাগ্নিঃ— যাস্ক।"

শ্রীপরিতোষ ঠাকুর মহাশয় সামবেদের ভূমিকায় বলেছেন— "তিনি অগ্নিযুক্ত বা গতিযুক্ত (অগি ধাতু গতি অর্থে) হয়ে তাঁর বৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন। তাই তিনি হলেন 'অগ্নি'। পুনরায়

www.pathagar.com

তিনি সামবেদের ১২৭১ সুক্তের অর্থে অগ্নিগণ বলতে 'রশ্মিগণ' লিখেছেন।

দুঃখের বিষয় হলো, পরবর্তী যুগে মানুষ বেদের নিরাকার ব্রহ্মাকে বিকৃত করে দিয়ে বস্তু পূজা আরম্ভ করে, তখনই বেদের ভাবগত ও আধ্যাত্মগত বর্ণনাগুলিকেও বস্তুবাদিতার রূপ দিয়ে দেবভাষা হতে সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়।

উপরুক্ত নরাশংস, স্তুতিযোগ্য, বন্দণীয় ঋষি মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে অগ্রবর্তী করে দিবেন এবং তিনি রশ্মি ও জ্যোর্তিময় হবেন, সেহেতু তাঁকে 'অগ্নি' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(খ) নরাশংসস্যাহম্ দেবষজ্যয়া পশুমান্ ভূয়াসমগ্নে"....

কৃষ্ণ যজুর্বেদ ১ম কাণ্ড ৬ষ্ঠ প্রপাঠক ৪ মন্ত্র

-নরাশংস দেবতার দেবযাগের দ্বারা বহু পশু লাভ করব....

(গ) নরাশংসস্যাহঃ দেবজ্যয়া পশুমান ভূয়া সমিত্যাহ নরাশংসেনবৈ প্রজাপতিঃ পশুন্পূজর্হ.....দেবাশ্বৈরের যজমানং সুবগংলোকং গময়তি....

-নরাশংস দেবতার দেবযাগের দ্বারা বহু পশু লাভ করব, প্রজাপতি নরাশংস দ্বারা পশু সৃজন করেছিলেন.....দেবতাদের অশ্বগণের দ্বারা যজমানকে স্বর্গলোকে পাঠান হচ্ছে। কৃষ্ণযজুর্বেদ ১ম কাণ্ড ৭ম প্রপাঠক ৪ মন্ত্র।

এখানে নরাশংস সম্পর্কে নূতন একটি কথা যোগ করা হয়েছে। তাহলো তাঁকে দেবতাগণের অশ্বের দ্বারা স্বর্গলোক প্রেরণ করা।

ভাগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনিশমত শ্লোকে উল্লেখিত আছে যে,— অশ্বমাশুগারুহা দেবদত্তং জগৎপতি"।

জগৎপতি দেবদত্ত অশ্বে আরোহণ করবেন।

কল্কিপুরাণে উক্ত আছে যে, কল্কি অবতারের বাহন হবে বায়ুর ন্যায় গতিশীল সাদা অশ্ব। (কল্কিপুরাণ শেষ অধ্যায় ১ম সুক্ত)

ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, হযরত মোহাম্মদ ঐশীপ্রদত্ত অশ্ব বোরাকে আরোহন করে সপ্তস্বর্গ ভ্রমন করেন। বোরাক অর্থ বিদ্যুৎ অর্থাৎ সেই অশ্ব বিদুত্যের ন্যায় গতিশীল ছিল।

www.pathagar.com

(ঘ) মনোন্নাহবাম্‌হে নরাশংসেন স্তোমেন। পিতৃণাং চ মন্মভিঃ॥

শুক্ল, ৩য় অধ্যায় ৫৩ মন্ত্র

-পিতৃলোকের অভিমত ও মনোদেবতা নরাশংসকে স্তুতি দ্বারা আহ্বান করছি।

এছাড়া শুক্ল যজুর্বেদে ২০ ঃ ৩৭, ২০ ঃ ৫৭, ২১ ঃ ৩১, ২১ ঃ ৫৫, ২৭ ঃ ১৩, ২৮ ঃ ২, ২৮ ঃ ১৯, ২৮ ঃ ৪২ ইত্যাদি স্থানে নরাশংসের উল্লেখ আছে।

সাম্রাজ্যধারী ও বিশ্বমানবকে দীপ্তিদানকারী

পয়ং পৃথিব্যাং পয় ভষধীষু পয়ো দিব্যন্তরীক্ষে পয়ো ধাঃ।

পয়স্বতীঃ প্রদীশঃ সন্তু মহ্যম। ৩৬

দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে হশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাম।

স্বরস্বত্যৈ বাচো যন্তুর্যন্ত্রেণাগ্নেঃ সাম্রাজ্যেনাভিষিঞ্চামি। ৩৭

—হে অগ্নি, তুমি পৃথিবীতে রস স্থাপন কর; সেরূপ ওষধীতে, স্বর্গে অন্তরীক্ষে রস স্থাপন কর। আমার জন্য দিক বিদিক রসযুক্ত হোক। ৩৬ সবিতা দেবতার অনুজ্ঞায়, অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলে, পুষাদেবতার হাত দ্বারা, সরস্বতীর বাণীতে, প্রজাপতির নিয়ন্ত্রণে, অগ্নির সাম্রাজে হে যজমান তোমাকে স্থাপন করছি। ৩৭ [শুক্ল, ১৮শ অধ্যায় ৩৬-৩৭শ মন্ত্র]

এখানে 'অগ্নি' বলতে বস্তুবাচক অগ্নি নয়, বরং ভাব ও গুণবাচক অগ্নি। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, অগ্নি মনুষ্য হতেই উৎপন্ন হয় (১ম মণ্ডল ১২৮ শুক্ত ১ম মন্ত্র)। শ্রীপরিতোষ ঠাকুর মহাশয় সামবেদের ১২৭৯ নং মন্ত্রে অগ্নির অর্থ রশ্মি করেছেন এবং তিনি উক্ত বেদের ভূমিকায় অগ্নির অর্থ গতিযুক্ত করেছেন। বেদে যে সকল পার্থিব বস্তুসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সমস্তই গুণবাচক। কিন্তু মানবজাতির দূর্ভাগ্য যে, ঐগুলিকে বিকৃত করে বস্তু পূজায় মানুষের মাথা নত করে দিয়েছে, যেখানে একমাত্র বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তার নিকট ছাড়া মানুষের চেয়ে অধম নিকৃষ্ট কোন বস্তুর নিকট মাথা নত করা উচিৎ ছিল না।

www.pathagar.com

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রকে এরূপ কুক্ষিগত করে যে, অন্য কোন মানুষের বেদ পাঠ করা, শ্রবণ করার কোন অধিকার ছিল না। সেজন্য তাঁরা সমগ্র বেদকে অগ্নি বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, অশ্ব, গাভী ইত্যাদি রূপক শব্দ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন, যাতে কোন অ-ব্রাহ্মণ ব্যক্তি গোপনে বেদ পাঠ বা শ্রবণ করলেও যেন প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম না হয়। যদি বেদসমূহে উল্লেখিত প্রাকৃতিক শব্দ সমূহের বস্তুগত অর্থ হয়, তাহলে উহাকে ঐশীগ্রন্থ বলা খুবই দুরুহ হবে।

ঋগ্বেদে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)

নরাশংস — প্রশংসিত

মোহাম্মদ — প্রশংসিত

ঋগ্বেদের বহুস্থানে নরাশংসের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'নরাশংস ও অন্তিমঋষি' গ্রন্থে বারোটি স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। বাহুল্যবোধে উহা পুনঃরাবৃত্তি করা হলো না। তাছাড়া আরো বহুস্থানে উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখানে কেবলমাত্র মন্ত্রগুলির স্থান ইঙ্গিত দেওয়া হলো।

(১) ১ মণ্ডল—১৩ সুক্ত ৩য় মন্ত্র
(২) ১ মণ্ডল ১৮ সুক্ত ৯ম মন্ত্র.
(৩) ১ মণ্ডল ১০৬ সুক্ত ৪র্থ মন্ত্র
(৪) ১ মণ্ডল ১১৬ সুক্ত ১১শ মন্ত্র
(৫) ১ মণ্ডল ১৪২ সুক্ত ৩য় মন্ত্র
(৬) ২য় মণ্ডল ৩ সুক্ত ২য় মন্ত্র
(৭) ২য় মণ্ডল৩৪ সুক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্র
(৮) ২য় মণ্ডল ৩৮ সুক্ত ১০ম মন্ত্র
(৯) ৩য় মণ্ডল ২৯ সুক্ত ১১শ মন্ত্র
(১০) ৫ম মণ্ডল ৫ সুক্ত ২য় মন্ত্র
(১১) ৭ম মণ্ডল ২ সুক্ত ২য় মন্ত্র
(১২) ৯ম মণ্ডল ৮৬ সুক্ত ৪২ মন্ত্র
(১৩) ১০ম মণ্ডল ৬৪ সুক্ত ৩য় মন্ত্র
(১৪) ১০ম মণ্ডল ৭০ সুক্ত ২য় মন্ত্র
(১৫) ১০ম মণ্ডল ৯২ সুক্ত ১১শ মন্ত্র
(১৬) ১০ম মণ্ডল ১৮২ সুক্ত ২য় মন্ত্র

www.pathagar.com

ঈলিত-স্তুত, প্রশংসিত

বেদের বিভিন্ন স্থানে 'ঈলিত' নামক এক ঋষির উল্লেখ দেখা যায়। হরফ প্রকাশিত ঋগ্বেদে প্রথম খন্ড ১৪ পৃষ্ঠার টিকায় 'ঈলিত' এর অর্থ স্তুত বলা হয়েছে।

অতএব নরাশংস ও ঈলিত সমার্থ বোধক হয়। প্রায়শঃ যে স্থানে নরাশংসের উল্লেখ আছে, তার পরেই ঈলিতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নরাশংস ও ঈলিত একই ব্যক্তি। দেব ভাষা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় পন্ডিতগণ অনেক ক্ষেত্রে নামবাচক বিশেষ্য সমূহের-ও অর্থদৃষ্টে অনুবাদ করেন। সেহেতু যে ঋষির নামের অর্থ প্রশংসিত ছিল, অনুবাদ ক্ষেত্রে কখনো নরাশংস করা হয়েছে, কখনো ঈলিত বা ঈড়িত করা হয়েছে। আবার কোন ক্ষেত্রে 'স্তুত' করা হয়েছে। যেহেতু শব্দগুলির অর্থ হলো প্রশংসিত।

অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ ঈলিত আ বহ।

"অসি হোতা সনুর্হিত"॥ (ঋগ্বেদ ১ম মন্ডল ১৩ সুক্ত ৪র্থ মন্ত্র)

এই মন্ত্রটি সামবেদে ১৩৫০শ মন্ত্রেও উল্লেখ আছে, সেখানে 'ঈলিত' স্থানে 'ঈড়িত' আছে যার অর্থও স্তুত ও প্রশংসিত।

-হে ঈলিত (প্রশংসিত) অগ্নে, সুখতম রথে দেবগণকে নিয়ে এস; মানুষ দ্বারা তুমি দেবগণের আহ্বানকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঈলিতো অগ্ন আ বহেন্দ্রং চিত্রমিহ প্রিয়ং।

ইয়ং হি ত্বা মতির্মমাচ্ছা সুজিহ্ব বচ্যতে॥

(ঋগ্বেদ ১ম মন্ডল ১৪২ সুক্ত ৪র্থ মন্ত্র)

-হে ঈলিত (প্রশংসিত) অগ্নি, তুমি বিচিত্র ও প্রিয় ইন্দ্রকে এখানে নিয়ে এস। হে সুজিহ্ব, তোমার উদ্দেশ্যে আমি স্তোত্র পাঠ করছি।

ঋগ্বেদ ৫ মন্ডল ৫ সুক্ত ৩য় মন্ত্রে উপরুক্ত একই মন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্রীপরিতোষ ঠাকুর মহাশয় সামবেদের ভূমিকায় লিখেছেন যে, "অগ্নি'

অর্থ গতিযুক্ত এবং ১২৭৯ মন্ত্রের অনুবাদে 'অগ্নি' অর্থ রশ্মি করেছেন। শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী মহাশয় অথর্ববেদে ১ম কান্ড ২য়

www.pathagar.com

অনুবাদক ৩য় সুক্তের ১ম মন্ত্রে অগ্নির অর্থ জ্ঞানস্বরূপ দেব লিখেছেন। তাহলে মন্ত্রের পূর্ণ অর্থ হলো, হে প্রশংসিত গতিময় বা জ্যোতির্ময় ও জ্ঞানবান ঋষি।

নরাশংস সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা ঃ

সমগ্র বেদের ছত্রে ছত্রে পবনদেব ইন্দ্র, বরুণ (সূর্য্য), অগ্নি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মাহাত্ম্য ও স্তব স্তুতি পরিলক্ষিত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, ঐ শব্দগুলির বস্তুগত অর্থ প্রযোজ্য হবে, না, উহার গুণগত অর্থ. ইহার সঠিক মীমাংসা করতে হলে দেখতে হবে যে, বেদ কোন্ গ্রন্থ? ইহা মূলতঃ প্রাকৃতিক বর্ণনার গ্রন্থ, না, ধর্মগ্রন্থ?

এ কথা সকল হিন্দু শাস্ত্রবিশারদ পন্ডিত মন্ডলী স্বীকার করেছেন যে, প্রকৃত বৈদিক ধর্ম হলো একেশ্বরবাদের ধর্ম। সেখানে মুর্ত্তি পূজা, প্রকৃতি পূজা, বস্তু পূজার কোন স্থান নেই। সুতরাং ইন্দ্র, বরুণ অগ্নি প্রভৃতির বস্তুগত অর্থ গ্রহণ করলে বেদ এবং বৈদিক ধর্মের সত্য-স্বরূপকে বিকৃত ও বিনষ্ট করা হবে। অথচ বেদের দ্বারাই বেদ ও বৈদিক ধর্মের অবলুপ্তি, বিকৃত ও অপকৃষ্টি সাধন অসম্ভব ব্যাপার। অতএব স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে ঐগুলি গুণগত, আধ্যাত্মগত ও রূপক অর্থে প্রযোজ্য হয়েছে। তবেই বেদ সমূহ ধর্মগ্রন্থের মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে।

বিভিন্ন যুদ্ধ (জেহাদ) অভিযান

যুধাযুধমুপ ঘেদেষি ধষ্ণুয়া পুরা পুরং সমিদং হংস্যোজসা।
নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি নিবর্হয়ো নমুচিং নাম মায়িনম্॥
তং করঞ্জমুত পর্ণয়ং ববীস্তেজিষ্ঠবাতিথিগ্বস্য বর্তনী।
ত্বং শত্য বঙ্গ দূস্যাভিনত্ পুরোহনানুবঃ পরিষুতা ঋঝিপুনা॥
[ঋগ্বেদে ১ম মণ্ডল ৫৩ সুক্ত ৭৮ মন্ত্র]

উক্ত মন্ত্র দুটি অথর্ববেদে ২০শ মণ্ডল ৩য় অনুবাদ ৪র্থ সুক্তে ৭-৮ মন্ত্রে ও উল্লেখিত হয়েছে।

বেদের ভারত বিখ্যাত ভাষ্যকার পন্ডিত খেমকরণ দাস ত্রিবেদী মহাশয় উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ এইভাবে করেছেন—

www.pathagar.com

হে ঐশ্বর্য্যবান সেনাপতি, তুমি যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে গমণ কর এবং বল প্রয়োগে দূর্গের পর দূর্গ ধ্বংস কর। তুমি নমনীয় মিত্রের সঙ্গে দূর দেশস্থ (নমুচিন) ক্ষমার অযোগ্য প্রসিদ্ধ কপটব্যক্তিকে হত্যা করেছ॥

হে রাজন, তুমি অতিথিগণকে আশ্রয়দানকারী পুরুষগণের অত্যন্ত তেজস্বীতার দ্বারা হিংসুক ও আত্মসাৎকারীকে বধ করেছ। তুমি মার্গভঙ্গকারী প্রতিকুল দুষ্টগণ কর্ত্তৃক সরল স্বভাব পুরুষগণকে পরিবেষ্টিত শত দূর্গকে চুর্ণ করেছে॥

এখানে মন্ত্রে আলোচ্য ঋষির দুটি পরিচয় দান করা হয়েছে। (১) তিনি যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে গমণ করবেন অর্থাৎ তিনি বহু যুদ্ধ করবেন। (২) দুর্গের অধিকারী চুক্তিভঙ্গকারী কপটব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হবে এবং তাদিগকে পরাজিত করবেন। (৩) তাঁর সেনাবাহিনীতে 'অতিথিগণকে আশ্রয়দানকারীগণ' থাকবেন।

(১) এক্ষনে ইতিহাসের পৃষ্ঠার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, হযরত মহম্মদকে জীবনে যতবার ধর্মশত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়, অন্য কোন ঋষির জীবনে তা ঘটে নাই। তিনি জীবনে যত যুদ্ধ করেছেন, তন্মধ্যে প্রধান হলো—বদরের যুদ্ধ, ওহোদের যুদ্ধ, পরীখার যুদ্ধ, খায়বারের যুদ্ধ, বনু কোরায়জার যুদ্ধ, বনু নজীরের যুদ্ধ, বনু মুসতালিকের যুদ্ধ, হোদায়বিয়ার চুক্তি, মক্কা বিজয়, হোনায়েনের যুদ্ধ, তায়েফের যুদ্ধ, তবুকের যুদ্ধ ইত্যাদি এছাড়া আরো কতকগুলি যুদ্ধ অভিযান আছে, যেগুলিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করেন নাই। কিন্তু তাঁর নির্দ্দেশমত পরিচালিত হয়েছে। সে জন্য উপরুক্ত ৭ম মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "হে ঐশ্বর্য্যবান সেনাপতি, তুমি যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে গমণ কর।"

(২) হযরত মোহাম্মদ যখন মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় আগমণ করেন, তখন তিনি মদীনাবাসী পৌত্তলিক, ইহুদী খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতির সহিত একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই ইহুদীগণ বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা করতে আরম্ভ করে এবং শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে। মদীনা ও খায়বারের ইহুদীগণ ছিল বহু দূর্গের অধিকারী। তারা হযরত মোহম্মদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও সমরায়োজন করতে থাকে। যার পরিণামে বনু কোরায়জার যুদ্ধ, বনু নজীরের যুদ্ধ বনু কায়নুকার যুদ্ধ এবং খায়বারের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়।

www.pathagar.com

হযরত মোহাম্মদ কপট ও চুক্তিভঙ্গকারী ইহুদীদের সকল দূর্গ চূর্ণ করে দেন এবং তাদের পরাজিত করেন। দেখুন কত সার্থক সামঞ্জস্য।

(৩) মক্কা হতে আগত হযরত মোহাম্মদ ও তাঁর শিষ্যগণকে অতিথি রূপে মদিনার মুসলিমগণ আশ্রয় দেন ও সর্বতো প্রকারে সাহায্য করেন। এজন্য ইতিহাসে তাঁরা 'আনসার' তথা আশ্রয় দাতা ও সাহায্যকারী নামে খ্যাত আছেন। অতিথিগণকে আশ্রয়দানকারী ও সাহায্যকারী আনসার বাহিনী হযরত মোহাম্মদের সঙ্গে ঐ সকল যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত মোহাম্মদ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ঋষির জীবনের সঙ্গে উপরক্ত মন্ত্রসমূহের মিল দেখতে পাওয়া যায় নাই।

মক্কা বিজয়

ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞো দ্বির্দশাবন্ধুনা সুশ্রবসোপঞ্জগ্মু যঃ।

ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নবশ্রুতা নি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক॥

[ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৫৩ সুক্ত ৯ম মন্ত্র]

-সহায় রহিত সুশ্রবা নামক রাজার সাথে যুদ্ধ করার জন্য যে বিংশ নরপতি ও ষাট হাজার নিরানব্বুই অনুচর এসেছিল। হে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র, তুমি শত্রুদের অলক্ষ্য রথচক্র দ্বারা তাদের পরাজিত করেছিল।

[রমেশ চন্দ্র দত্ত অনুদিত]

উক্ত মন্ত্রটি অথর্ববেদে ২০শ কাণ্ড ৩য় অনুবাক ৪র্থ সুক্তের ১ম মন্ত্রে-ও উল্লেখিত আছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষনীয়—ইন্দ্র যাঁর সাহায্যার্থে শত্রুদের পরাজিত করেন, তাঁর পরিচয় সায়ন দিতে সক্ষম হন নাই (ঋগ্বেদ, হরফ, ৭১ পৃঃ)। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যেই চারটি লক্ষণ উক্ত হয়েছে, যদ্বারা তাঁকে চিহ্নিত করা সহজ। (১) তিনি 'সহায় রহিত' হবেন, হিন্দু ভাষ্যকার মতে তিনি অনাথ হবেন। (২) তাঁর নাম সুশ্রবা অর্থাৎ প্রসংশিত অর্থবোধক হবে। (৩) তিনি রাজা-ও হবেন। (৪) তাঁর শত্রুর সংখ্যা বিংশ নরপতি ও ষাট হাজার হবে।

এবার আমরা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করি। (১) হযরত মোহাম্মদ ছিলেন অনাথ এবং তিনি মক্কায় ছিলেন সম্পূর্ণ সহায় হীন; যার ফলে তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। একজন খৃষ্টান

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক প্রফেসর হিট্টির ভাষায় শুনন—The baby's father Abdullah died before his birth.....Leaving the city of his birth as a despised Prophet. (History of the Arabs ch VIII Page 111 & 116) (২) মোহাম্মদ শব্দের অর্থ হলো প্রশংসিত [He is Muhammad (highly praised), Prof Hitti] (৩) হযরত মোহাম্মদ একাধারে ঋষি ও পয়গম্বর এবং রাজা ছিলেন। (৪) হযরত মোহাম্মদ যখন প্রকৃত বৈদিক ধর্ম একেশ্বরবাদের ধর্ম ইসলাম প্রচার করেন, তখন সমগ্র আরব বাসীর সংখ্যা ষাট হাজার ছিল এবং বিশগোত্রের বিশ সর্দার বা গোত্রপতি ছিল। তারা সকলেই ছিল হযরত মোহাম্মদের শত্রু।

অথর্ব বেদের ২০শ কাণ্ড ৯ম অনুবাক ৩২শ সুক্তের ১ম মন্ত্রে যে নরাশংসের প্রশংসা গীত হয়েছে। সেখানে-ও বর্ণনা করা হয়েছে যে নরাশংসকে ষাট হাজার নব্বুই জন শত্রুর মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে। সুতরাং চার বেদে উল্লেখিত নরাশংস ও সুশ্রবা যে একমাত্র হযরত মোহাম্মদকে নির্দেশ করছে, এ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ নাই।

দশ সহস্র অনুচরসহ মামহ

অথর্ববেদে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ মামহকে দশ সহস্র গাভী অর্থাৎ সাধু অনুচরবর্গ প্রদান করা হবে বলে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে।

এষ ঋষয়ে মা মহে শতং নিস্কান দশ স্রজঃ।

ত্রীনি শতান্যর্বতাং সহস্রা দশ গোনাম॥

[অথর্ববেদ ২০শ কান্ড ৯ম অনুবাক ৩১শ সুক্ত ৩য় শ্লোক]

অর্থ—'ঈশ্বর মামহ ঋষিকে একশত স্বর্ণমুদ্রা, দশটি হার, তিনশত অশ্ব ও দশ সহস্র গাভী দিবেন। কোন ঋষি পৃথিবীতে স্বর্ণ মুদ্রা ও হার লাভ করে অশ্ব ও গাভী প্রতিপালন করার জন্য আগমন করেন না। ঐগুলি দ্বারা বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত শিষ্যবর্গকে নির্দ্দেশ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে ৫ম মন্ডল সুক্ত ১ম শ্লোকে মঘোনঃ।

ত্রৈবৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈর্বৈশ্বানর ত্র্যরুণ শ্চিকেত॥

অর্থাৎ চক্রবিশিষ্ট যানের অধিকারী (উচ্চমর্য্যাদা সম্পন্ন) সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয় চরমজ্ঞানী, ও মুক্তহস্ত 'মামহ' আমাকে তাঁর বাণী দ্বারা

www.pathagar.com

অনুগ্রহ করেছেন। সর্বশক্তিমানের পুত্র সকল সদগুণের অধিকারী, নিখিল বিশ্বের হিতকারী দশ সহস্র অনুচরসহ বিখ্যাত হবেন।

ঋগ্বেদে ১ম মন্ডলে ৯৪ সুক্ত ১৬শ শ্লোকে; ৯৫ সুক্ত ১১শ শ্লোকে; ৯৬ সুক্ত ৯ম শ্লোকে; ৯৮ সুক্ত ৩য় শ্লোকে; ১০০ সুক্ত ১৯শ শ্লোকে; ১০১ সুক্ত ১১শ শ্লোকে; ১০২ সুক্ত ১১শ শ্লোকে; ১০৩ সুক্ত ৮ম শ্লোকে; ১০৫ সুক্ত ১৯শ শ্লোকে, ১০৬ সুক্ত ৭ম শ্লোকে; ১০৭ সুক্ত ৩য় শ্লোকে; ১০৮ সুক্ত ১৩শ শ্লোকে; ১০৯ সুক্ত ৮ম শ্লোকে; ১১০সুক্ত ৯ম শ্লোকে; ১১১ সুক্ত ৫ম শ্লোকে ১১২ সুক্ত ২৫শ শ্লোকে; ১১৩ সুক্ত ২০শ শ্লোকে; ১১৪ সুক্ত ১১শ শ্লোকে, ১১৫ সুক্ত ৬ষ্ঠ শ্লোকে; মোট উনিশ স্থানে 'মামহ' ঋষির উল্লেখে নিম্নোক্ত একই শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে।

তন্নো মিত্র বরুণ্যে মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দৌঃ।।

অর্থাৎ "মিত্র, বরুণ, মামহ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দুৎ আমাদের রক্ষা করুন।" ইহা শ্লোকের শেষাংশ, উহার প্রথশাংশে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ আছে। কোথাও আয়ু, ধন, সৌভাগ্য, বৃদ্ধি করার প্রার্থনা আছে, কোথাও শত্রুদের পরাজিত করার প্রার্থনা আছে। ১০৯ সুক্ত ২য় শ্লোকে একটি নূতন স্তোত্র রচনা করার উল্লেখ আছে এবং 'জামাত' ও 'স্যালাৎ' দু'টি অজ্ঞাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ নির্ণয়ে সায়ণ ও যাস্কের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্লোকটি হলো-

অশ্রবং হি ভুরিদাবত্তরাং বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ।

অথা সোমস্য প্রযতী যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নব্যং॥

—হে ইন্দ্র ও অগ্নি! জামাত বা স্যালাৎ অপেক্ষাও অধিক বহুবিধ ধন দান কর, এরূপ শুনেছি। অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি তোমাদের সোম প্রদানকালে পঠনীয় একটি নূতন স্তোপ্র রচনা করছি।

সায়ণ 'জামাত' এর অর্থ করেছেন গুণবিহীন জামাতা কন্যা লাভের জন্য কন্যাকর্তাকে অনেক ধন দান করে। কিন্তু যাস্ক বলেন, জামাতা=জা অর্থে অপত্য, তার নির্মাতা। অনুরূপভাবে সায়ণ স্যালাৎ অর্থ শ্যালক করেছেন। কিন্তু যাস্কের মতে স্যালাৎ অর্থ কুলোর খৈ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শব্দ দু'টিকে সংস্কৃত শব্দ হিসাবে বিবেচনা করলে সঠিক অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, ফলতঃ উহারা বিদেশী

www.pathagar.com

শব্দ। আমরা দেখতে পাই যে, আরবী ভাষায় স্যালাৎ অর্থ নামাজ এবং জামাত অর্থ সমবেতভাবে নামাজ পাঠ করা। আরো প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে যজ্ঞে নূতন স্তোত্র রচনা পাঠ করার উল্লেখ আছে। অথচ যে কেহ ইচ্ছামত যজ্ঞের মন্ত্র রচনা করে পড়তে পারে না। শাস্ত্রই মন্ত্র রচনা করে নির্দ্দিষ্ট করে দেয় কোথায় কোন মন্ত্র পাঠ করতে হবে। শ্লোকে উল্লেখিত ঋষিগণের মধ্যে একমাত্র 'মামহ' নূতন ঋষি অন্যরা প্রাচীন। অতএব স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, নূতন ঋষি, মামহ আভির্ভূত হয়ে নূতন স্তোত্র রচনা করবেন। 'মামহ' শব্দটি-ও অসংস্কৃত। এক্ষণে বেদের বিভিন্ন স্থানে 'মামহ' ঋষির যে সকল লক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তা একত্র করলে দেখা যায় যে-

(ক) মামহ মরুস্থলবাসী উষ্ট্রারোহী হবেন। [অথর্ব বেদে ২০ম মণ্ডল ৯ম অনুবাদ ৩১ সুক্ত]

(খ) মামহ দশসহস্র অনুচরসহ বিখ্যাত হবে। [ঋগ্বেদে ৫ম মণ্ডল ২৭ সুক্ত]

(গ) মামহ'র যুগে বেদ ছাড়া অন্য স্তোত্র রচিত হবে ও যজ্ঞে পঠিত হবে। [ঋগ্বেগ ১ম মণ্ডল ১০৯ সুক্ত ২য় শ্লোক]

মামহ মহাপুরুষ আর্য জাতি বহির্ভূত মরুনিবাসী উষ্ট্রারোহী হবেন। কারণ মনু সংহিতা মতে আর্যজাতির জন্য উটের দুধ পান নিষিদ্ধ (মনু ৫ঃ৮) উহার মাংস ভক্ষণ করলে অপকৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্য করতে হবে (মনু ১১ঃ১৫৭) এবং উটে চড়লে প্রাণায়াম শাস্তিযোগ্য পাপ হবে (মনু ১১ঃ২০২)।

আর্য ঋষিগণের মধ্যে কেহ দশ সহস্র অনুচরসহ বিখ্যাত হন নাই এবং বেদ ব্যতীত নূতন স্তোত্র রচনা করে যজ্ঞে পাঠ করার নির্দেশও দেন নাই।

পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ আরব দেশের মরুস্থলবাসী ও উষ্ট্রারোহী ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক মক্কা অভিযানে দশ সহস্র অনুচর সহ বিজয় লাভ করে পৃথিবী বিখ্যাত হন এবং তাঁর উপর কোরাণ নামক নূতন স্তোত্র অবতীর্ণ হয়, যা প্রতিটি নামাজ ও বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে পাঠ করা আবশ্যিক করা হয়েছে। কোরান পাঠ না করলে নামাজই হবে না।

www.pathagar.com

স্বনামধন্য ঐতিহাসিক Washington Irving তাঁর রচিত Life of Muhammad নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-The prophet Muhammad departed with ten thousand men on this momentous enter prise অর্থাৎ মহানবী মোহাম্মদ দশ হাজার শিষ্যসহ এই দুঃসাহসিক অভিযানে (মক্কা বিজয়ে) বহির্গত হন। (Page 17)

সুতরাং আরব মরুদেশ নিবাসী উষ্ট্রারোহী, নূতন স্তোত্র পাঠকারী ও দশ সহস্র অনুচরের নেতা হযরত মোহাম্মদই যে সেই ঋষি, ইহা প্রত্যয় হয়।

আরো আশ্চর্য্য বিষয় যে, বাইবেলের তিনটি স্থানে দশ সহস্রের নেতা এক মহাপুরুষ আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

(ক) মহাপুরুষ মুসা (Moses) মৃত্যুকালে ভবিষ্যদ্বাণী করেন-The LORD came from sinai and rose up from seir unto them; he shined forth mount paran and he came with ten thousands of saints; from his right hand went a fiery law for them (Deuteronomy 33 : 2)—সদা প্রভু সীনয় হতে এলেন, সেয়ীর হতে তাদের প্রতি উদিত হলেন, পারান পর্বত হতে আপন তেজ প্রকাশ করলেন; তিনি দশ সহস্র সাধুগণের সঙ্গে এলেন, তাদের জন্য তাঁর দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ ঃ ২)। বাইবেলের বর্ণনামতে পারাণ হলো আরব দেশ। (আদি পুস্তক ঃ ১ঃ ২১)।

(খ) My beloved is white and ruddy, the chiefest among ten thousand (Soloman's Song 5 : 10)—আমার প্রিয় শুভ্র লোহিত বর্ণ, তিনি দশ সহস্রের মধ্যে প্রধান নেতা। (সলমনের গীত ৫ ঃ ১০)

(গ) Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints (New Testament Jude 1 : 14)—দেখ, সদাপ্রভু দশ সহস্র সাধুগণের সহকারে আগমন করছেন। (যীহুদা ১ ঃ ১৪)

www.pathagar.com

বেদ ও বাইবেল উভয় ধর্মগ্রন্থ কত নিযুক্ত ভাবে একই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে এবং কত সার্থকভাবে উহা হযরত মোহম্মদকে নির্দেশ করছে।

মহাভারতের ভবিষ্যদ্বাণী

মহর্ষি কল্কি সম্পর্কে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে, মন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ উল্লেখযোগ্য—

মৎস্য পূরাণ, কর্ম পূরাণ, বরাহ পূরাণ, নরসিংহ পূরাণ, রামন পূরাণ, বিষ্ণু পূরাণ, দেবী ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভবিষ্য পূরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পূরাণ, গরুদ পূরাণ কল্কি পূরাণ, জৈন মহাভস্ম, বৃহদধর্ম পূরাণ, হরিভস্ম, অগ্নি পূরাণ, বিষ্ণু ধর্মত্র, বায়ু পূরাণ, ও মহাভারত। কল্কি সম্পর্কে যত ধর্ম গ্রন্থে এবং যত বিস্তৃতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, অন্য কোন ঋষি সম্পর্কে এরূপভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় নাই। এর দ্বারা ঋষি কল্কির মাহাত্ম প্রকাশ পাচ্ছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, হিন্দুধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত কল্কির যে সকল লক্ষণ ও গুণাবলী প্রকাশ করা হয়েছে, Old Testament এবং New Testament উভয় বাইবেলের অসংখ্য ক্ষেত্রে অনুরূপ লক্ষণধারী মহাপুরুষের আগমণ বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে। সমগ্র বিশ্বমানবকে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যাতে প্রতিটি মানুষ তাঁকে মান্য করে এবং তাঁর অনুসরণ করে।

পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতা যুগের পূর্বে এমন এক যুগ ছিল, যখন পৃথিবী শিক্ষা, দীক্ষা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা সর্বদিক দিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ উহাকে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। ঐযুগকে জানা আমাদের জন্য অপরিহার্য্য। কারণ ঋষি কল্কী আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে ঐরূপ যুগ হবে, তৎপর কল্কী আবির্ভূত হয়ে উহার বিনাশ করবেন। তিনি সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে আসবেন না, বরং তিনি অজ্ঞতাও অন্ধকার যুগে পৃথিবীতে যুগপরিবর্তক মহাপুরুষরূপে এসে সভ্যতা ও সত্য জ্ঞানের বিকাশ ঘটাবেন। অতএব বর্তমান সভ্যতার যুগে কল্কীর জন্য অপেক্ষা করা ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ। দেখতে হবে, পৃথিবীতে এমন কোন যুগ ছিল, যা অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ এবং সেইযুগে এমন কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন কিনা, যিনি এসে সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন,

www.pathagar.com

পৃথিবীতে ন্যায়ের বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন, সৎবাণী ও জপ দ্বারা নয়, শক্তি ও যুদ্ধ দ্বারা অন্যায়ের বিনাশ করেছেন, পৃথিবীব্যাপী তাঁর ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব শক্তি ও মহা বিস্ময়রূপে তাঁর রাজত্ব কায়েম হয়েছে, তিনি একাধারে ঋষি এবং সম্রাট। মহাভারতে কতসুন্দর রূপে কল্কীর পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে—

ধর্মের বিজয়ী আর হইয়া সম্রাট
দলিবেন ম্লেচ্ছকুল রাখিতে ব্রাহ্মণ
প্রসন্ন হইয়া লোকে সহ নিজ ঠাই
যুগ পরিবর্তক সে পুরুষ রতন॥

—জাহেলিয়ার অর্থ হলো অজ্ঞতা বা বর্বরতার যুগ।

অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগ বলতে ইসলাম আবির্ভাব হওয়ার পূর্ববর্তী যুগ বোঝায়।

ঐরূপ অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগে হযরত মোহম্মদ (দঃ) মক্কার প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন-বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশ তারিখে, যে তারিখ সম্পর্কে সকল ধর্মগ্রন্থ একমত।"

পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, তাদের যত মহাপুরুষ ঋষি, দেবতা আছেন তাঁদের মধ্যে কারো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ সম্পর্কে মুসলিম বিদ্বেষী খৃষ্টান ঐতিহাসিক Prof Hitti মহাশয় পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, মহাপুরুষগণের জগতে একমাত্র হযরত মোহাম্মদের (দঃ) জন্ম হলো ইতিহাসের আলোকে উজ্জ্বল।

—মোহম্মদের (দঃ) ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বর্ণনা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আমি তার একটা আভাস দিচ্ছি মাত্র। কত বৈচিত্রময় চরিত্র?

একাধারে মোহম্মদ—মহাপুরুষ, নবী, পয়গম্বর; মোহম্মদ-রাজনীতিজ্ঞ

মোহম্মদ—সৈন্যাধক্ষ্য	মোহম্মদ—বাগ্মী
মোহম্মদ—সম্রাট	মোহম্মদ—যুগপ্রবর্তক, সংস্কারক
মোহম্মদ—যোদ্ধা	মোহম্মদ—অনাথদের আশ্রয়দাতা
মোহম্মদ—ব্যবসায়ী	মোহম্মদ—ক্রীতদাসদের ত্রাণকর্তা

www.pathagar.com

মোহম্মদ—ধর্মপ্রচারক মোহম্মদ—নারীদের উদ্ধারকর্তা
মোহম্মদ—দার্শনিক মোহম্মদ—বিচারক
মোহম্মদ—ঋষি, সিদ্ধপুরুষ।

আবার এই সকল মহৎ কার্য্য এবং মানবিক ভূমিকার প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি হলেন অনন্যসাধারণ, অতুলনীয়।

মহাভারতে কল্কীর পরিচয়

মহাভারতে কল্কীর পরিচয় দান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে—

(ক) তিনি যুদ্ধ করবেন—হযরত মোহম্মদ (দঃ) একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি ধর্মপ্রচারের সহিত যুদ্ধ করেছেন।

(খ) তিনি ধর্মবিজয়ী, সম্রাট-হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান ধর্মসমূহ অসংখ্য দেবতা, মহাপুরুষগণের দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত ধর্মগুলির সঙ্গে রাজত্বের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু হযরত মোহম্মদ (দঃ) একাই একটি ধর্ম এবং একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, যা একমাত্র কল্কী অবতার করবেন বলে শাস্ত্রসমূহে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে।

(গ) চৌর তথা বিধর্মীদের বিনাশ শেষে অশ্বমেধ যোগ করবেন—

হযরত মোহম্মদ (দঃ) সমগ্র বিধর্মীদের বিনাশ ও সমগ্র আরব জয় করার পর শেষ হজ্বব্রত ও কোরবানী পালন করেন। এইজন্য একে The farewell pilgrimage বা বিদায় হজ্ব বলা হয়। (Hitti ch VIII page 119)। এর তিন মাস পরেই তিনি পরলোকগমন করেন।

(ঘ) তিনি বিধাতৃ-বিহিত অর্থাৎ ঐশীবিধান লাভ করবেন-হযরত মোহম্মদ (দঃ) ঐশীবিধান কোরান প্রাপ্ত হন এবং উহাকে পৃথিবীতে স্থাপন করেন।

(ঙ) তিনি স্বদেশে থাকবেন না, বরং পরে রমনীয় কাননযুক্ত স্থানে অবস্থান করবেন- হযরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বদেশ ত্যাগ করে মদীনায় অবস্থান করেন, যা ছিল অত্যন্ত রমনীয় স্থান । Madina was much more favoured by nature (Hitti part I ch vii page 104)

www.pathagar.com

ভূলোকে অধিবাসীগণ সেই নিয়মে ধার্য্য করবে- ইসলামে আজ পর্য্যন্ত প্রতিটি মানুষ অনুরূপভাবে মক্কা হজ্ব ও কোরবানী করার পর মদীনায় যাওয়ার নিয়ম পালন করছে।

(চ) সে যুগে সত্যযুগ আসবে এবং অধর্ম ঘুচবে- হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি কোরানের এই শ্লোক পাঠ করেন- সত্য এসেছে, মিথ্যা অধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়েছে। Towards the end of January 630 the conquest of Makkah was complete. Entering its great sanctuary Smashed the many idols, said to numbered three hundred and sixty, exclaming, Truth hath come and falshood hath vanished! (Hitti part I ch. 8 Page 118)

(ছ) পূর্বে সেই আশ্রমে পাষন্ডের দল পাপ কোলাহল করত, কল্কী উহা ইদ্ধার করেন- উপরে উল্লেখিত হয়েছে যে, মক্কার সবচেয়ে বড় ধর্মস্থান প্রতিমাপূজকগণের হস্তগত ছিল হযরত মোহাম্মদ (দঃ) উহা উদ্ধার করেন।

(জ) তিনি চিরবদ্ধমূল কুসংস্কারসমূহ নির্মূল করবেন- হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে সকল কুসংস্কার নির্মূল করেন এবং বর্ণভেদ জাতিভেদ উচ্ছেদ করে ধর্ম পালনে সকলকে অধিকার দান করেন।

(ঝ) তিনি দান ব্রতের নিয়ম সাধন করবেন- ইসলামে প্রতিটি ধনবান ব্যক্তির আয়ের উপর 'জাকাত' রূপে শতকরা আড়াই টাকা দান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা পৃথিবীর কোন ধর্মে নাই।

(ঞ) তখন সকলে ষটকর্মে রত থাকবেন-হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মহাপুরুষরূপে পাঁচটি এবং সম্রাটরূপে একটি, মোট ছয়টি বিষয়ের নির্দ্দেশ দেন। এক আল্লাহতে বিশ্বাস, নামাজ, জিহাদ, রোজা, হজ্ব, জাকাত এবং তাঁর উম্মাত প্রতিটি মুসলিমকে উক্ত ছয়টি কার্য্যে রত তাকতে হবে।

সুতরাং সুস্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে যে, এই সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে নয়, বরং ঐতিহাসিকগণ যে যুগকে 'অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন, উহাই কলি যুগ। সেই কলিযুগে

www.pathagar.com

আবির্ভূত হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যে ধর্ম,গুণাবলী, আদর্শ, ঐশীবিধান, যে প্রতাপ ও পরাক্রম নিয়ে এসেছিলেন এবং কল্কীর গুণাবলী ও লক্ষণসমূহের সঙ্গে তাঁর যে সামঞ্জস্য পরিরক্ষিত হয় তা একাধারে অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর। বিশ্বের মানুষ আজ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ধর্মজগতে তাঁর মত সিদ্ধ মহাপুরুষ ধর্মের বিজয়ী কখনো আবির্ভূত হন নি এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মত রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট-ও কেউ জন্মগ্রহন করেন নি।

অনেকে মনে করেন যে, কল্কী অবতার আর্য্য জাতির ব্রাহ্মণ গোত্রের মধ্যে হতে হবেন। সে ক্ষেত্রে-ও আমরা পাই যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আর্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেদাচার্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঋগ্বেদ সংহিতার ভূমিকায় বলেন যে, আর্যগণ ভারতবর্ষ হইতে আরবে গিয়া বসতি করিয়াছিল। শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষে বলেন, মহম্মদের পূর্বে মক্কায় অগ্নিপুজকগণের প্রাদুর্ভাব ছিল। তখন ভারতবাসী হিন্দুগণ বাণিজ্য যাত্রা উদ্দেশ্যে মক্কায় আসতেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র মহাশয় ইসলাম প্রসঙ্গে গ্রন্থে হযরত মোহাম্মদকে (দঃ) আর্য্য বলেছেন (৮৮পৃঃ) উক্ত গ্রন্থের পাদটীকায় The New Popular Encyclopedia (VOL)। P 272] এবং 'ইসলাম ও বিশ্বনবী' [২য় খন্ড ২৬৯ পৃঃ] উল্লেখ আছে—

হযরত মোহাম্মদের দেহের গঠন, অঙ্গসৌষ্ঠব; ধর্মনীতি এবং বংশ ও গোত্র বৈশিষ্ট্য, সবই তারস্বরে তাঁহার আর্যত্ব ঘোষণা করিতেছি। আর শুধু হযরত রসুলই এই আর্য্য কোরেশ বংশীয় ছিলেন না, প্রথম খলিফা চতুষ্টয়-আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী-এই আর্য্য কোরেশ রক্তই বহন করতেন। [ইসলাম ও বিশ্বনবী ২য় খন্ড পৃঃ ২৬৯]

অতএব হযরত মোহাম্মদ [দঃ] হলেন আর্য্য বংশীয় ব্রাহ্মণ গোত্রের মহাপুরুষ, এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণ বংশ পরম্পরায় 'কাবা' ধর্মগৃহের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। কল্কির জন্ম-ও পুরোহিতের গৃহে হবে বলে উল্লেখ আছে।

ভারতের মন্দিরে কল্কী অবতারের ছবি

স্বামী জগদিশ্চরানন্দ মহাশয় তাঁর কল্কী নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে দশ অবতারের মূর্তি চিত্রিত বা ক্ষুদিত আছে। মন্মধ্যে অন্ধপ্রদেশের কাকিনাড়ার নিকটবর্তী আন্নাভরম

www.pathagar.com

পাহাড় চূড়ায় বহু প্রাচীন এক বিষ্ণু মন্দির অবস্থিত আছে। উহার দেওয়ালে দশ অবতারের মূর্তিসমূহ স্পষ্টভাবে ক্ষুদিত আছে। সেখানে কল্কীকে বীর বেশে একটি সাদা ঘোড়ার উপর আরোহিত অবস্থায় দেখান হয়েছে (Kalki, Page 5).

এখানে একটি বিষয় সবিশেষ প্রনিধান যোগ্য যে, সাদা ঘোড়া পৃথিবীতে খুব দুষ্পাপ্য। ভারতের কোথাও উহা পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট নির্দ্দেশিত হয় যে, কল্কী অবতার ভারতবাসী হবেন না। একমাত্র আরব দেশের শ্বেত অশ্বই পৃথিবী বিখ্যাত।

ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয়ের 'কল্কি অবতার এবং মাহম্মদ সাহেব' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, "মোহাম্মদ সাহেব ঈশ্বরের নিকট হতে 'বোরাক' নামক একটি ঐশ্বরীক অশ্ব লাভ করেন, যাহার উপর আরোহন করে তিনি 'মেরাজ' তীর্থযাত্রা করেন, এতদ্ব্যতীত মোহাম্মদ সাহেব ঘোড়া ভালবাসতেন, তাঁর আরো সাতটি ঘোড়া বিদ্যমান ছিল।"

বোরাক সম্পর্কে খৃষ্টান লেখক পাদ্রীফাদার লুইস মালুফ তাঁর আল মুনজিদ গ্রন্থে বলেন যে, ইহা ডানাযুক্ত জন্তু যা মোহাম্মদকে মক্কা হতে জেরু-শালেমের মসজিদ আকসা পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়; উহা খচ্চর হতে খর্ব এবং গর্দভ হতে উচ্চ সাদা জন্তু; দৃষ্টিপথের শেষ প্রান্তে তার পদক্ষেপ (এই তার গতি)।

ইনতিকালের সময় হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর সম্বলের মধ্যে ছিল একটি শ্বেত অশ্বতর, কিছু যুদ্ধাস্ত্র এবং একখণ্ড জমি। এই জমিটুকুও ইনতিকালের পূর্বে দান করিয়া দেওয়া হয়েছিল। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্ব-কোষ, ২য় খণ্ড ৩৩০ পৃঃ মুহাম্মদ (সঃ) অধ্যায়।

মূর্ত্তিপূজা লোপকারী কল্কী

বেদা ধর্মঃ কৃতযুগং দেবা লোকাশ্চরাচরাঃ।
হাষ্টাঃপুষ্টাঃ সুসংতুষ্টা কল্কৌ রাজনী চাভবন্॥
নানা দেবাদি লিঙ্গেষু ভূষণৈর্ভূষিতেষুচ।
ইন্দ্রাজালিকবদ্ বৃত্তিকল্পকাঃ পূজকা জনাঃ॥
ন সন্তি মায়া মোহাঢ্যাঃ পাষণ্ডাঃ সাধুবঞ্চকাঃ।
তিল্কাচিত সর্বাঙ্গাঃ কল্কৌ রাজনি কুত্রাচিৎ॥

www.pathagar.com

—তিনি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে বেদ, ধর্ম, কৃতযুগ, দেবগণ, স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জীব সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ও সুপ্রীত হবেন।

পূর্বযুগে পূজক দ্বিজাতিরা নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত দেবমূর্তি-সমূহে ইন্দ্রজালিকবৎ ব্যবহার করে সকলকে মোহিত করতো, তা দূর হবে।

কল্কি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হলে কুত্রাপি তিলকাঙ্কিত-সর্বাঙ্গ মায়া-মোহবিষ্ট সাধু বঞ্চক পাষণ্ড দৃষ্ট হবে না। (কল্কি পুরাণ, ৩য় অংশ ষোড়শ অধ্যায়)

কল্কী আগমন করে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মূর্তিপূজাকে রহিত করবেন এবং তাঁর যুগে সর্বাঙ্গ তিলকাঙ্কিত সাধু সন্নাসী কুত্রাপি দৃষ্ট হবে না। কারণ তিনি সন্ন্যাস ধর্মকেও রহিত করবেন। সুতরাং মূর্তিপূজকরূপী কল্কীর অন্বেষণ করা বাতুলতা মাত্র।

পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (সঃ) সেই ব্যক্তি যিনি মুর্তিপূজা নিষিদ্ধ করেন এবং মক্কা বিজয় দ্বারা আরব দেশের একচ্ছত্র সম্রাট হওয়ার পর কাবাগৃহ এবং সকল মন্দির হতে মূর্তিসমূহ অপসারিত করেন এবং তাঁর রাজ্যে তিলকাধারী সাধু সন্ন্যাসী দৃষ্ট হয় নাই, এমনকি তাঁর ধর্মে সন্ন্যাস গ্রহণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৬৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষভাগে মক্কা বিজয় সমাপ্ত হয়। উহার বৃহৎ ধর্মস্থানের মধ্যে প্রবেশ করে মোহাম্মদ অসংখ্য মুর্তি ধ্বংস করেন, যার সংখ্যা ৩৬০টি বলে কথিত আছে এবং তিনি ঘোষণা করেনঃ সত্য আগমন করেছে এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়েছে।" এতএব প্রতিটি লক্ষণই হযরত মোহাম্মদের মধ্যে বিদ্যমান।

মাংস ভোজী কল্কী

(৬ পারা, ৫ মায়দা, ৩ আয়াত দ্রঃ)

চর্ব্যৈশ্চোষ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ পূপ শষ্কুলি যাবকৈঃ।
সদ্যো মাংসৈর্মূলফলৈ রম্যৈশ বিবিধৈর্দ্ধিজান॥

—অনন্তর তিনি নানাবিধ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, শষ্কুলি, যাবক

www.pathagar.com

সদ্যোমংস, ফলমূল ও অপরাপর নানাপ্রকার দ্রব্য দ্বারা দ্বিজাতিবর্গকে যথাবিধি ভোজন করান।—(কল্কি পুরাণ, ৩য় অংশ, ষোড়শ অধ্যায় ১০ মন্ত্র)

এরূপ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, মাংসভোজী ঋষি এবং মূর্তিসংহারক ধর্ম বিজয়ী সম্রাট পৃথিবীতে একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ভিন্ন দেখা যায় নাই।

সার রাধা কৃষ্ণ

আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ জাতি ও জাতীয়তার সমস্ত গন্ডীকে অতিক্রম করে যায়, যে বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো ধর্ম্মের নাই।

ড্রেপার

ইউরোপে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ইতিহাস

সমস্ত মহাপুরুষদের মধ্যে একমাত্র মহম্মদই সমগ্র মানবজাতির উপর সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন।

অধ্যাপক টি, ডবলিও আরলেন্ড

ইসলামের দিন প্রচার

জাতি, বর্ণ বা পূর্ব পরিচয় যাই হোক না কেন, একজন মুসলমান ইসলামে বিশ্বাসী ভ্রাতাগণের মধ্যে অবশ্যই অভিনন্দিত হবে, সে সমান অধিকার পাবে। ইস্‌লাম একটি রাজনৈতিক শক্তি এবং শক্তির ফলশ্রুতি সারা জগত অনুভব করবে, আরো দৃঢ়ভাবে অনুভব করবে যত পৃথিবীর সীমানা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হবে। যে ইসলাম ধর্ম সাতশত মিলিয়ন আত্মার আনুগত্য দাবী করে, সেই ইসলাম-ই পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় অসাম্যের একমাত্র সমাধান।

বেট্রেণ্ড রাসেল

মুসলমান জগতে নিয়মিত কর প্রদান করলে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী এবং ইহুদীদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করা হয়নি। কিন্তু খৃষ্টানজগতে গোঁড়া ধর্মাচরণ থেকে সামান্যতম বিচ্যুতির জন্যও মৃত্যুদণ্ড ছিল অত্যন্ত সাধারণ।

www.pathagar.com

এম.এন, রায়

ইসলামের ঐতিহাসিক শাসন

ইসলামের বিস্ময়কর সাফল্যের মূল কারণ হ'ল, তার বৈপ্লবিক যুক্তিবাদ কর্মক্ষমতা দ্বারা শুধুমাত্র গ্রীস বা রোমের নয়, পরন্তু পারশ্য, চীন ও ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ক্রমাবণতি জনিত হীন অবস্থা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করে আনার পথে নেতৃত্ব দান। ইসলামই সর্ব প্রথম প্রচলিত করল সামাজিক সম অধিকারের মতবাদ, যা প্রাচীন সভ্যতার সমৃদ্ধ দেশ সমূহের কাছে ছিল অজ্ঞাত।

মোহম্মদ প্রচারিত ধর্মের বিস্ময়কর উন্নতি ও নাটকীয় প্রসার মানব ইতিহাসের একটি মনোমুগ্ধকর অধ্যায়।

শ্রীমতী এনি বসন্ত

কমলা লেক্‌চার্স

এছাড়াও পশ্চিমী সমাজের চেয়ে মুসলমান সমাজের মহিলারা অনেক ভাল আইনানুগ ব্যবহার পেয়ে থাকেন। ইসলামের আইন অনুসারে মহিলার সম্পত্তি সুরক্ষিত। কিন্তু পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টীয় আইনে একজন খ্রীষ্টান রমনী এরূপ সুদৃঢ় অধিকার পান না।

আমার প্রায়ই মনে হয় যে, খ্রীষ্টীয় অনুশাসনের চেয়ে ইসলামী অনুশাসনে একটি মহিলা অনেক বেশী স্বাধীন। যে ধর্মীয় বিশ্বাসে এক বিবাহ প্রথা সমর্থিত তার চেয়ে ইসলাম ধর্মে মহিলারা অধিকতর ভাবে সুরক্ষিত।

উপসংহার

কেবল আমি নহি, বরং প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি পক্ষপাতহীন হইয়া রাষ্ট্রীয় একতার উদ্দেশ্যে আলোচ্য গ্রন্থের প্রামাণ্য বিষয়-বস্তু স্বীকার করিবেন, যার ফলে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ জীবন শান্তিময় হইবে। ভারতীয়গণ যে কল্কিকে ভগবান রূপে জ্ঞান করেন, মুসলমানগণ সেই কল্কি অবতারেরই শিষ্য। কল্কি ভারতীয়গণের বহু কল্যাণ সাধন করিবেন বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রত্যেক ভারতীয় ব্যক্তির উচিৎ কল্কি অবতারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কারণ অন্তিমঋষি অশ্বারোহী এবং তরবারী ধারণকারী হইবেন। অথচ বর্তমান কাল অশ্ব ও তরবারি যুগ অতিক্রম করিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ কালে উহা ফিরিয়া

www.pathagar.com

আসার কোন সম্ভাবনা নাই। ভারতীয় মুসলমানগণকে ভিন্ন মনে করা ঠিক নহে। ইসলাম ও মুসলমান আরবী শব্দ; উহার অর্থ হইতেছে ঈশ্বরাজ্ঞা পালন ধর্ম, সনাতন ধর্ম তথা আস্তিক ব্যক্তি।

যে ব্যক্তি অন্ধের ন্যায় স্বীয় সনাতন ধর্মকে সংকীর্ণ করে এবং অন্য ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি না করিয়া পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, তাহাকে ঈশ্বরের রাজত্বে অগ্নিদগ্ধ করা হইবে। আমি আলোচ্য গবেষণা মুলক গ্রন্থকে পক্ষপাত দুষ্ট হইয়া লিপিবদ্ধ করি নাই। বরং অন্তর্যামি ঈশ্বরের নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ও বৈরিতা এবং পারস্পরিক প্রাণ-হত্যা ইশ্বরকে ব্যথিত করিয়া তুলে। শিক্ষা দেওয়া উপদেশকের কাজ; কিন্তু পালন করানো উপদেশকের দায়িত্ব নহে। যিশুখৃষ্ট যে 'আহমদ' (ঈশ্বরের প্রশংসাকারী) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, বেদব্যাস যে কল্কি অবতারের আবির্ভাব বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহার সাক্ষ্য দেওয়াই আমার কর্ম। খৃষ্টানগণ কল্কিকে না মানিতে পারে, কিন্তু ভারতীয়গণ অবশ্যই তাঁহাকে স্বীকার করিবেন।

কল্কি অবতার ও মোহম্মদ সাহেবের মধ্যে যে অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য আমি দেখিতে পাইয়াছি। তারপর আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাই যে, ভারতীয়গণ কেন কল্কি অবতারের আগমণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন? প্রকৃতপক্ষে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি মোহম্মদ সাহেব। মৌলিক ধর্ম্ম নীতির দৃষ্টিতে উভয়েই এক। কিন্তু সংকীর্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ইহা অবগত নহে।

এক সময় বৈদিক ধর্মে কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য বুদ্ধদেব যে ধর্ম মত প্রচার করেন, সেই ধর্মকে এবং সেই ধর্মানুরাগীদিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হইত। লোকে বৌদ্ধ ধর্মকে বৈদিক ধর্ম ছাড়া এক নূতন ধর্ম বলিয়া ধারণা করিত। কিন্তু যখন প্রমাণিত হইল যে; পূরাণে বর্ণিত চব্বিশজন অবতারের মধ্যে বুদ্ধদেব ত্রয়বিংশতম (২৩শ) অবতার; তখন সকলে এক বাক্যে বুদ্ধজিকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং বৌদ্ধ-ধর্ম ও হিন্দু-ধর্মের মধ্যে বৈরিতা, অসামঞ্জস্যতা বিদূরিত হইল। তদনুরূপ মোহম্মদ সাহেব প্রদর্শিত ধর্ম এবং সেই ধর্মানুগামীদিগকে দেখিয়া হয়তঃ মনে হইতেছে যে, ইহা বৈদিক ধর্মের

www.pathagar.com

বিপরীত ধর্ম। কিন্তু পুরাণে বর্ণিত চর্তুবিংশতম (২৪শ) অবতারের বর্ণনা এবং ভগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্দে (অধ্যায় যাবতীয় বৃত্তান্ত দেখিয়া সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইল যে, একমাত্র মোহম্মদ সাহেবের সঙ্গে উহার পরিপূর্ণ মিল আছে। তখন আমার বিশ্বাস হইল যে, তিনিই কল্কি অবতার এবং তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্ম দ্বারা বৈদিক ধর্ম্ম নূতন রূপে পরিপুষ্টতা লাভ করিয়াছে। এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে, যখন সকলে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং ভারতের ব্রাহ্মণ, শৈব, শাক্ত, জৈন হোক বা বৌদ্ধ হোক সকল শ্রেণীর মানুষ দ্বারা ইসলাম ধর্ম স্বীকৃতি লাভ করিবে। ফলে ভারতের সকলে মিলিত হইয়া বিরাট এক ঐক্যবদ্ধ সমাজ সৃষ্টি হইবে। লাঠি ও অস্ত্রের বলে ধর্মের প্রচার ও প্রসার করা যায় না। বরং ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের অন্তরে যখন প্রকৃত ধর্মের সত্যরূপ প্রবেশ করে, তখন স্বেচ্ছায় শ্রেষ্ঠ ধর্মকে গ্রহণ করিয়া নেয়। ধর্ম্ম পণ্ডিতগণের কর্ত্তব্য হইতেছে—ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে মানুষের কাছে তুলিয়া ধরা। ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারিলেই মানুষ স্বেচ্ছায় উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার দ্বারা ধর্মকে গ্রহণ করানো যায় না। ধর্ম প্রচারকগণের শান্তির পথ অবলম্বন করা উচিৎ। দাড়ী-টিকি বা বেশভূষার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই, উহা কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র। ধর্মের যোগ মানুষের অন্তর এবং বিচার বোধের সহিত সন্নিহিত; যার ফলে মানব জীবন সুচারুরূপে ও সার্থক ভাবে পরিচালিত হয়।

প্রত্যেক **হিন্দু এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর স্মরণ রাখা উচিৎ যে, কেবলমাত্র তাহারাই হিন্দু নন। বরং ভারতে বসবাসকারী মুসলমান খৃষ্টান সকলেই হিন্দু। কারণ হিন্দু শব্দের অর্থ হইতেছে—হিন্দুস্থানে বসবাসকারী।**

মুসলমানগণের প্রতিও আমার অনুরোধ যে, হিন্দু এবং হিন্দুস্তান শব্দ তাঁহাদেরই প্রদত্ত; যাহা উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যেন নিজেদিগকে হিন্দু বলিতে সংকোচ না করেন। ভারতে যে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল, তাহা জাতি ভিত্তিক নহে, বরং কর্ম ভিত্তিক ছিল। কারণ "বরণাত্ বর্ণঃ জাত্যা জাতিং।" ঈশ্বরের আরাধনাকারী এবং সংযমী মুসলমানও ব্রাহ্মণ; তথা ঈশ্বরের বিশ্বাসী ব্যক্তিও মুসলমান অর্থাৎ আস্তিক। মুসলমানের অর্থ লিঙ্গচ্ছেদ নহে এবং আস্তিকের অর্থ

www.pathagar.com

চৈতন্য রাখা নহে। দাড়ী প্রাচীনকালে মুণি-ঋষিগণও রাখিতেন। ভারতে যতদিন পর্য্যন্ত উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ দূর না হইবে, সকলের প্রতি সমান ব্যবহার না হইবে, ততদিন সুখ শান্তি সম্ভব নহে।

(মূল ঃ ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, এম.এ প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মশাস্ত্রাচার্য সংস্কৃত বিভাগ, ভারত)

দরুদ

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন লোকের বাপ নয়, বরং তিনি আল্লাহর রাছুল এবং নাবীদের শেষ; এবং আল্লহই সর্ব বিষয় মহাজ্ঞানী।

২২ পারা, ৩৩ ছুরা আজহাব, ৪০ আয়াত।

এবং

নিশ্চয় আল্লাহ স্বয়ং এবং তাঁর ফেরেস্তা সমূহ নাবীর উপর দরুদ পড়ে থাকেন, হে ইমানদারগণ তোমরাও তাঁর উপর কল্যাণকর শান্তিদায়ক শান্তি বাণী পাঠ কর।

২২ পারা ৩৩ ছুরা আহজাব ৫৬ আয়াত

ওয়া সল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রে খালকিহি মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি, ওয়া আজ অয়াজিহি, ওয়া আহলেবাইতেহি ওয়া জুররিয়াতিহি আজমাইন বেরহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

আমিন-আমিন-আমিন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'আসুন, দ্বীনকে মানি' গ্রন্থে লেখক ছাইদুল হক মজুমদার মোট নয়টি অধ্যায়ের একশত বিশটি শিরোনামে বক্তব্য বিষয় বিশদ করার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে সাতটি উপশিরোনামে 'তাআউয ও তাছমিয়া', দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি উপশিরোনামে 'আল্লাহর ব্যাপকতা', তৃতীয় অধ্যায়ে নয়টি উপশিরোনামে 'রছুলুল্লাহর (সঃ) ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য', চতুর্থ অধ্যায়ে দশটি উপশিরোনামে 'রছুলুল্লাহর (সঃ) সংসার ও কর্মজীবন', পঞ্চম অধ্যায়ে পাঁচটি উপশিরোনামে 'আল কোরআনের শাশ্বত বৈশিষ্ট্য', ষষ্ঠ অধ্যায়ে ছয়টি উপশিরোনামে 'রছুলুল্লাহর (সঃ) মেরাজ ও সময়ের মূল্যায়ন', সপ্তম অধ্যায়ে ছয়টি উপশিরোনামে বিশ্বনবীর প্রয়োজন', অষ্টম অধ্যায়ে পনেরটি উপশিরোনামে 'পবিত্র কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোযেযা' এবং সর্বশেষ নবম অধ্যায়ে দীর্ঘ উনষাটটি উপশিরোনামে 'বিশ্বনবী ও খাতমে নবুয়ত' বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম সহকারে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ... এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গ্রন্থখানি পাঠে সকল শ্রেণীর পাঠক, বিশেষতঃ আমাদের তরুণ সমাজ উপকৃত হইবেন।

অধ্যাপক ড. কাজী দীন মুহম্মদ

প্রো-ভিসি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ